ঋদ্ধি

বা

(শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি)

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী,
শিক্ষা ও সুনীতি, চরিত্রগঠন ইত্যাদি প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত



ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
কলকাতা ৭০০০১৩

RIDDHI ba (Shree briddhi O Samunnati)

by : Jnanendramohan Das

ISBN 81-86207-04-x

গ্রন্থস্বত্ব
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
(সি এম ঘোষ প্রা. লি. এর একটি সংস্থা)

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
৯৩এ লেনিন সরণি,
কলকাতা ৭০০০১৩

প্রাপ্তিস্থান
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
৯৩এ লেনিন সরণি,
কলকাতা ৭০০০১৩

অক্ষর বিন্যাস
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

মুদ্রক
নির্মল কুমার মিত্র
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩এ লেনিন সরণি,
কলকাতা ৭০০০১৩

মুখবন্ধ

কতদিন ভেবেছি, এমন একটা বই কি পাওয়া যাবে না, যে বই আমার গুরু হবে, আমাকে বাঁচতে শেখাবে। প্রকৃত বন্ধুর মতো আমার পাশে পাশে, কানে কানে কথা বলতে বলতে, জীবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে দেবে, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি বলে যেতে পারবো, বাঁচার মতো বেঁচে গেলুম। আমি ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ, পূর্ণ, পরিতৃপ্ত। শুদ্ধ প্রাণের অহঙ্কার নিয়ে মাথা উঁচু করে ফিরে চলেছি সেই দাতার কাছে, যাঁর আশীর্বাদে আমার এই জীবন। তোমার দেওয়া জীবনের সৌরভটুকু রেখে এসেছি প্রভু! আমি তোমার অহঙ্কার।

বাঁচতে আমরা সবাই চাই; কিন্তু কে আমাদের শেখাবেন বাঁচতে। জন্ম থেকে মৃত্যু জীবন একটা বাঁধা ধরা পথ ধরে চলতে চায়। সফল জীবনের কিছু সাবেকী ধারণাকে সামনে রেখে আমরা এগোতে চাই। অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এই হল লক্ষ্য। আমরা বাইরেটাকে জয় করতে চাই। ভেতরটা অবহেলিতই থেকে যায়। জীবন ধর্ম বলতে আমরা জৈবতাকেই বুঝি। ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হতে চাই। ঐশ্বর্য কাকে বলে সেইটাই জানি না। আমাদের কেউ জানায় না। জানাবার প্রয়োজন অনুভব করে না। আমাদের বহুশ্রুত প্রবাদ, লেখা-পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। সাফল্য বলতে আমাদের বোঝানো হয়েছে, গাড়ি, বাড়ি, পদমর্যাদা, খাওয়া, দাওয়া, অমেয় বিলাসিতা, প্রচুর অবসর সময়, প্রাণঢালা আলস্য। ভোগের শিক্ষায় জর্জরিত করছে ভোগবাদী সভ্যতা। জীবন-যোগের কথা কেউ বলে না। জৈবতা বিসর্জন না দিলে যে জীবন প্রস্ফুটিত হতে পারে না, এ শিক্ষা পরিবারেও নেই, প্রতিষ্ঠানেও নেই। ইংরেজ বলবেন, ইট, ড্রিংক অ্যান্ড বি মেরি। হিন্দীভাষী বলবেন, জিও, পিও। আমাদের চার্বাক বলবেন,

ঋণংকৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ। একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ ভাবাদর্শের ছায়ায় বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত যুবসমাজের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, শোনো, কাম কাঞ্চনই মায়া। মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ছোটায়, আত্মবিস্মৃত করে। শিশ্নোদরপরায়ণতাই কলির ধর্ম। বিচার করো, কামিনীতেই বা কি আছে, কাঞ্চনেই বা কি আছে! প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু তুমি পেতে চাইবে, সেইটাই তোমার লোভ। তোমাকে আত্মপর, স্বার্থপর, তমোগুণী করে তুলবে। তোমার জীবনের সমস্ত শান্তি কেড়ে নেবে। রসেরও যেমন প্রয়োজন আছে বশেরও সেই রকম প্রয়োজন আছে। রসে বশে থাকাটাই তোমার শিক্ষা। লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্দির, আবার লাগামছেঁড়া প্রাচুর্য, দুটোই খারাপ। এটা আলস্য, তমোগুণ, ওটা রাজসিক, রজোগুণ। সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠগুণ। শিবের সংসারই আনন্দের সংসার। ভোগ অথবা দুর্ভোগ কোনোটাই ঠিক নয়। সাম্যই প্রয়োজন।

তুলসীদাস বলেছিলেন, বড় সুন্দর কথা,

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনা মন্‌কো বশ করে সো, সবকো সেরা ওই।।

রাজ্য বশ করতে পারলে রাজা, যুদ্ধে জয়ী হলে যোদ্ধা বীর, কিন্তু দুর্দান্ত মনকে বশ করতে পারলে, কি রাজা, কি বীর, সে জীবন-সম্রাট।

ইঞ্জিন চালু করলেই গাড়ি চলে না। চালাবার শাস্ত্র জানতে হয়। অভ্যাস করতে হয়। ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাকসিলারেটার, গিয়ার, স্টিয়ারিং দখলে থাকা চাই। শ্বাস, প্রশ্বাসের জীবন দেহের খোলে, জীবনযন্ত্র চালু হয়েছে, তার মানেই কি বাঁচা! কুঁড়ি থেকে ফুল সুষম এক প্রক্রিয়া। পরিমিত জল, পরিমাণ মতো সার। রোদ, বাতাস, নিয়মিত পরিচর্যা। প্রস্ফুটিত জীবনেরও সেই এক পথধারা। দিল এক মন্দির। শরীরম আদ্যম খলু ধর্ম সাধনম। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর আদর্শে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন, সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন। ধর্মের আগে ফুটবল। খালি পেটে ধর্ম হয় না। আবার প্রভূত ভোজনেও হয় না। দরিদ্রের ঈশ্বর কাঞ্চন, ধনীর ঈশ্বর উদগ্র লোভ। মধ্যবিত্তের বাসনাই তার ঈশ্বর। দারিদ্র্য আর প্রাচুর্যের মাঝখানে আনন্দময় জীবনের যে চিরহরিৎ উপত্যকা, সেইটাই যে মানুষের স্বর্গ, সেদিকে অধিকাংশেরই নজর নেই। সেই ভূমিতে পা রাখার নামই যে ঋদ্ধি।

শরীর আর মন দুটোকেই সুরে বাঁধতে হবে। কঠোপনিষদ্ বলছেন :

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।

শরীর রথ, জীবাত্মা রথস্বামী, বুদ্ধি তার সারথি, মন হল লাগাম। এই সংসারে থেকেও এই বোধে যে গ্রন্থ মানুষকে উদ্বোধন করতে পারে, সেই গ্রন্থ উপনিষদ সম। সমোপনিষদ। শুধু জানালেই হবে না, শেখাতে হবে। সেই কারণে এই গ্রন্থ গুরু। তুমি কোথায় আছো, কী ভাবে আছো জেনে নিয়ে ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়াই হল গুরুর কাজ। বাস্তবকে স্বীকার করা হল, মানুষের স্বভাবকে মেনে নেওয়া হল, এইবার আদর্শজীবন তৈরির কাজ।

স্বাস্থ্য মানে রোগহীন, ক্লেশমুক্ত পরিশ্রমী দেহ। বিত্ত হল, যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু উপার্জন। সঞ্চয় মানে কার্পণ্য নয়। উদারতা মানে অমিত অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নয়। ভোগ মানে বিলাসিতা নয়। ঐশ্বর্য মানে যক্ষের ধনাগার তৈরি নয়। একটি মন্ত্র :

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম।।

প্রায় আশি বছর আগে লেখা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় নিমজ্জিত, প্রাক স্বদেশীচেতনায় উদ্বুদ্ধ, মানুষ গড়ার ব্রতে সমুজ্জ্বল এই গ্রন্থখানির পুনরাবিষ্কার যেন হারান মাণিক খুঁজে পাওয়া। পেয়ে গেছি, বলে উল্লাস প্রকাশ করতে ইচ্ছে করছে। ঘরে ঘরে মানুষের জীবনবেদ হয়ে থাক।

আমরা ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ, শ্রীমন্ত, সুমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠি।

কলকাতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

ঋদ্ধি প্রকাশিত হইল। যাঁহারা এই জীবন-সংগ্রামক্ষেত্রে সংসারভারক্লিষ্ট ও ঋণদায়গ্রস্থ হইয়া যুবা বয়সেই উদ্যমহীন হইয়া পড়েন এবং একটি আশার কথা, একটু সহানুভূতি এবং সৎপরামর্শের অভাবে চারিদিক অন্ধকার দেখেন; যাঁহারা ধন উপার্জন করেন কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্থান করেন না, যাঁহাদের সঞ্চিত ধন আছে, কিন্তু যাঁহারা তাহা বৃদ্ধি করিবার উপায় অবগত নহেন; এই গ্রন্থ তাঁহাদের জন্য লিখিত হইয়াছে। সামান্য আয়ে কিরূপ গুছাইয়া সংসার করা যাইতে পারে, সংসারে প্রবেশোন্মুখ যুবকগণ, ঋদ্ধিতে তাহার আভাস পাইবেন। বালকও ঋদ্ধিশালী হয়; এজন্য এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বালক ও যুবকগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

ঋদ্ধি কাহাকেও "রাতারাতি বড় মানুষ" করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি কেহ ঋদ্ধি-নির্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে জীবন পরিচালিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি যে স্বোপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন, সামান্য আয় সত্ত্বেও আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে পারিবেন, এবং ভবিষ্যৎ দুর্ভাবনার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে।

স্বার্থপরের দল সৃষ্টি করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি, জাতীয় সম্পদ ও দেশীয় ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় ঋদ্ধিতে তাহারই উপায় ও সঙ্কেত দৃষ্ট হইবে।

স্বাবলম্বন বলে যাঁহারা স্বীয় দারিদ্র্য ঘুচাইয়া ঋদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অন্যের জীবন হইতে সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া আত্মজীবনে তাহা কার্যে পরিণত করত শ্রীমন্ত হইয়াছেন, এরূপ কর্মবীরগণের জীবনের প্রকৃত ঘটনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনীর সমাবেশে গ্রন্থগত উপদেশ ও সঙ্কেতাদি সরস ও সুখপাঠ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি হইতে বিষয় সংগ্রহ ও বিশেষ বিশেষ স্থল উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ঋদ্ধি সমাজের সামান্য উপকারে আসিলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এলাহাবাদ   শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বার বৎসরে যদি এক যুগ হয়, তাহা হইলে যুগান্তরের পর ঋদ্ধি দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল। ইতিমধ্যে চরিত্রগঠনের কয়েকটি সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ হইয়া গিয়াছে। চরিত্রগঠনে ভাবরাজ্যের অনেক কথা এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন সার্থক করিবার সঙ্কেত আছে। প্রথম গ্রন্থে আদর্শের মত হইতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তকে আদর্শানুযায়ী কাজ করিতে বলা হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি দুইখানি পুস্তকই উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। দুইখানি গ্রন্থই হিন্দীভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাধারণের নিকট চরিত্রগঠনের এবং হিন্দীভাষীর নিকট ঋদ্ধির আদর অধিক হইয়াছে।

ঋদ্ধির দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয়সমাবেশের পরিবর্তন পুস্তকের পরিবর্ধন এবং নানা স্থানে সংশোধনও করিয়াছি। হুগলী কলেজের সুযোগ্য ও সুবিজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, এম, এ, মহাশয় এই গ্রন্থের উৎকর্ষ

বিধানার্থ বিবিধ উপদেশ দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে "জাতীয় ধনবৃদ্ধি" শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। বর্তমান অন্নসমস্যার দিনে বঙ্গীয় সমাজে ঋদ্ধি অধিক আদর পাইবে এবং বিস্তৃততর পাঠকমণ্ডলীর ব্যবহারে আসিবে, আশা করি।

কলকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩২৯

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ঋদ্ধি কাহাকে বলে

ঋদ্ধি কাহাকে বলে, এক কথায় বুঝান যায় না। কেবল অর্থসঞ্চয় করিয়া কেহ ঋদ্ধিশালী হয় না; অপরপক্ষে, নির্ধনকেও ঋদ্ধিশালী বলে না। যে কৃপণ প্রত্যেক কপর্দক বাঁচাইবার চেষ্টায়, পুষ্টিকর অশন, স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক বসন, এবং স্বচ্ছন্দতা-সম্পাদক বাসভবনের সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, সে ঋদ্ধিশীল নহে। যে অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি গভীর রজনী পর্যন্ত কেবল অর্থের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায় — যে শীতবস্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকিতে কেবল অর্থের মায়ায় শীতভোগ করে, যে ছত্র ক্রয় করিবার সঙ্গতি থাকিতে, শূন্য মস্তকে ঝড়বৃষ্টি ও রৌদ্রতাপ সহ্য করে — যে দীন দরিদ্রের ন্যায় অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করিয়া, সারাজীবনের সঞ্চিত ও সুরক্ষিত "যক্ষের ধন" রাখিয়া, ভবলীলা সাঙ্গ করে — নিশ্চয়ই তাহাতে ঋদ্ধির লক্ষণ নাই ; সেই ত প্রকৃত নির্ধন। কৃপণ এবং অপব্যয়ী এতদুভয়ের কেই ঋদ্ধিশীল নহে। ঋদ্ধি ইহাদের মধ্য-পথে অবস্থান করে।

ঋদ্ধি তাহা হইলে কি ? ঋদ্ধি, বৃদ্ধি শ্রী এবং লক্ষ্মী একই। কথায় বলে, "অমুকের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে," "অমুক খুব লক্ষ্মীবন্ত বা শ্রীমন্ত পুরুষ" --ইহার অর্থ কি ? ইহাতে কি বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘে ও প্রস্থে বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে ? অথবা সে অতি সুপুরুষ ? — না, তাহা নহে । ইংরেজী ভাষায় যাহাকে 'থ্রিফ্‌ট্' (thrift) বলে, আমরা তাহাকে বলি ঋদ্ধি । কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, "থ্রিফ্‌ট্" ঋদ্ধির একটি প্রধান অঙ্গ । চলিত কথায় ইহাকে শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি বা সমুন্নতি বলে । মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের দ্বারা যে আর্থিক উন্নতি হয়, মিতাহারে, মিতাচারে, অনালস্যে, ব্যায়ামে, জ্ঞানে, শিক্ষায়, সভ্যতায়, শিষ্টাচারে এবং চরিত্রে ও ধর্মবলে যে দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার

উন্নতি হয়, এক কথায় তাহার নাম ঋদ্ধি। যদি বলা যায়, অমুক গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই গ্রামের অধিবাসিগণ অমিতব্যয়ী, অধ্যবসায়শূন্য, শ্রমবিমুখ এবং অসঞ্চয়ী, সুতরাং দরিদ্র এবং অনুন্নত। হয়ত, আলস্য এবং অজ্ঞানতাবশতঃ গ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য নাই। ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে গ্রামবাসিগণ জর্জরিত সুতরাং ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তাহারা সুপিতা, সুমাতা, সুসন্তান ও সুপ্রতিবেশীর কর্তব্যসাধনে অক্ষম এবং অল্পায়ু। তাহারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তিতে হীন, তথাপি, তাহাদের দুঃখ দুর্দশার মূল কোথায়, তাহা তাহারা ভাবে না এবং কোন প্রতিকারের চেষ্টাও করে না। তাহারা যেমন পুরুষকার দ্বারা বর্তমান অবস্থার উন্নতি করে না, তদ্রূপ ভবিষ্যতের জন্য, অসময়ের জন্যও সঞ্চয় করে না। তাহারা হয় অজ্ঞান এবং দরিদ্র, না হয় উপার্জনশীল কিন্তু অপব্যয়ী। তাহারা হয়ত বিলাসী এবং ঔদরিক সুতরাং হয় তাহারা 'যত্র আয় তত্র ব্যয়' করিয়া ফেলে, না হয় বিলাসের বস্তু ক্রয় করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে ভোজ দিয়া ও উৎসব করিয়া আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া বসে। এমন অনেককে দেখা যায়, যাহারা একদিন খুব উৎকৃষ্ট এবং ব্যয়সাধ্য ভোজনে উদর ও রসনার তৃপ্তিসাধন করে কিন্তু, পরদিন অতিকষ্টে শাকান্নের সংস্থানে সমর্থ হয় এবং একদিনের অমিতব্যয়ের ফলে সমস্ত মাসটাই ভাল খাইতে পারে না। এই সকল লোক কখন লক্ষ্মীলাভ করিতে পারে না এবং ঋণের দায়ে ইহাদিগকে চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কেবল সঞ্চয় অর্থে ঋদ্ধি বুঝায় না বটে, কিন্তু সঞ্চয়ের অভ্যাস হইতেই ঋদ্ধি সহজসাধ্য হয়। অপরপক্ষে, ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ও চরিত্রহীন হইয়া কেহ ঋদ্ধি লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান, শিক্ষা এবং ধর্ম, ঋদ্ধির চিরসহচর। অসভ্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধি নাই। অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইবার পথ পাওয়া যায় না, কিন্তু, জ্ঞানের আলোকে— ধর্মের আলোকে— সভ্যতার আলোকে—উন্নতির পথে, ঋদ্ধির পথে— লোকে সহজেই অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্বতোমুখী উন্নতির নামই ঋদ্ধি। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকর্ষ, ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বিকাশ—এ

সমস্তই ঋদ্ধির অন্তর্গত। চরিত্র ইহার মূল ; স্বাবলম্বন ইহার কাণ্ড; শ্রম, ধৈর্য, সঞ্চয়শীলতা প্রভৃতি ইহার শাখা-প্রশাখা ; ধন, প্রাচুর্য, ক্ষমতা, উদারতা প্রভৃতি পত্রপল্লবাদি; এবং সুখ, শান্তি, যশ ও মান ইহার ফল-পুষ্পাদি। যে অমৃতরস পানে এই পাদপ সঞ্জীবিত থাকে, তাহা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়-- ঐ তিন ধারার নাম — আশা — বিশ্বাস ও উচ্চাভিলাষ।

স্বাস্থ্য ও ঋদ্ধি

"স্বাস্থ্যই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল।"

"সকল ধনের মূলে শ্রম এবং শ্রমের মূলে স্বাস্থ্য। দেহ, মন ও আত্মার উন্নতিমূলে স্বাস্থ্যের অবস্থিতি। অস্বাস্থ্যই সকল উন্নতির অন্তরায়। ঋদ্ধিলাভ করিবার পূর্বে স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইবে।"

প্রবাদ আছে যে, স্বাস্থ্যই প্রকৃত ধন। প্রবচন মিথ্যা নহে। ইহা বহুদর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে সমর্থ হয় না। উদ্যম, অধ্যবসায়, উৎসাহ, আশা, স্বাস্থ্যহীনের থাকে না। সুতরাং পুরুষকার অভাবে তাঁহার লক্ষ্মীলাভও হয় না। যাঁহারা শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যের কুশিক্ষা এবং যৌবনের অত্যাচার দ্বারা স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন তাঁহারা সঞ্চিত ধন ত নষ্ট করেনই, অধিকন্তু, উপার্জনেও অক্ষম হইয়া শীঘ্রই

ধনহীন হইয়া পড়েন। সুখ-সৌভাগ্যে পালিত ধনীর সন্তান দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যে কত দিন জীবিত থাকিতে পারেন ? দুর্ভাবনা তাঁহার স্বাস্থ্য অধিকতর ভগ্ন করিয়া শীঘ্রই আয়ুঃক্ষয় করে। ধন অপেক্ষা স্বাস্থ্য মূল্যবান এবং স্বাস্থ্য অপেক্ষা চরিত্র মূল্যবান।

"যদি ধন নাশ হয়, তায় কিবা আসে যায় ;
যদি স্বাস্থ্য নাশ হয়, তবে কিছু হয় ক্ষয় ;
হইলে চরিত্র নাশ সর্বনাশ হয়।"

এমন যে অমূল্য ধন চরিত্র, স্বাস্থ্যহীন জন তাহাও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, শারীরিক দুর্বলতা লোকের হৃদয় ও মনের দুর্বলতা সাধন করে। হৃদয়মন দুর্বল হইলে, লোক কোন কুকর্ম না করিতে পারে ? হৃদয়-মনের দুর্বলতায় সামাজিক এবং ধর্ম-নিয়ম বিকৃত হয়। দুর্বল ব্যক্তি ভীরুস্বভাব, স্বার্থপর, পরমুখাপেক্ষী, শ্রমবিমুখ, অসাধু এবং কৌশলে কার্যোদ্ধার-প্রয়াসী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যহীন স্বভাবতঃই অলস এবং দীর্ঘসূত্রী হয়। অলস এবং দীর্ঘসূত্রী, রাজচক্রবর্তী হইলেও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন, দরিদ্রের ত কথাই নাই। প্রজাকুল সবল সুস্থ না হইলে, সমগ্র দেশ হীনশক্তি ও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন। পরিণামে, ভিক্ষুক ও অকর্মণ্য এবং স্বল্পায়ু ও দুর্বলের বংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শ্রমবিমুখতা বা আলস্য ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বলতা ও দারিদ্র্যের জনক। শুনা যায়, মরক্কোর সুলতান বিলাসীর শ্রেষ্ঠ। সুলতান হইয়া যে তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তরে পদব্রজে গমন করিবেন তাহা তিনি স্বীয় পদমর্যাদার হানিকর মনে করেন। সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে তাঁহার প্রাসাদস্থ সকল গৃহই বৈদ্যুতিক রেল দ্বারা যুক্ত হইয়াছে এবং তিনি বৈদ্যুতিক গাড়ি করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনাগমন করিয়া থাকেন। তাঁহার এই শ্রমবিমুখতা কি তাঁহাকে ভগ্নস্বাস্থ্য করিবে না ? এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রজাগণ অলস, শ্রমবিমুখ হইতে শিখিবে না ? শ্রমবিমুখ বলিয়া স্পেনবাসীদের দুর্নাম আছে এবং স্পেনের দারিদ্র্যও সর্বজনবিদিত।

দরিদ্র ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক সুখী। সিডেন্‌হাম সাহেব বলিয়াছেন—"ধনী, অতিভোজী এবং অমিতপায়ী প্রায়ই বাতরোগগ্রস্ত।

অন্যান্য ব্যাধি হইতে বাতব্যাধির প্রকৃতি বিভিন্ন ; ইহা যত ধনী লোককে বিনাশ করে তত দরিদ্রকে নহে। * * * * রাজামহারাজাগণ, বড় বড় সেনাপতিগণ, দার্শনিকগণ এই ব্যাধি কর্তৃক কবলিত হন। এতদ্বারা প্রকৃতি তাঁহার পক্ষপাতশূন্যতাই প্রদর্শন করেন ; কারণ যাঁহাদিগকে তিনি এক প্রকারে অনুগ্রহ করেন অন্য প্রকারে তাঁহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন। ধনী ব্যক্তি গুরুভোজনেই পরিতৃপ্ত এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি রসাস্বাদ ভোগ করেন এবং যাহা কিছু উদরস্থ করেন, তৎসমস্তই পরিপাক করেন। একদা এক ভিক্ষুক অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া এক ধনবানের নিকট ভিক্ষা চাহে। ধনপতি বিস্ময়ের স্বরে বলেন,--"ক্ষুধার্ত ? হায় তোমার ক্ষুধার কথা শুনিয়া আমার হিংসা হয় !" জনৈক ধনীকে ডাক্তার এ্যাবার্নেথী ব্যবস্থা দেন যে, প্রত্যহ এক শিলিং ব্যয়ে জীবন ধারণ কর এবং ঐ শিলিং মেহনত করিয়া উপার্জন করিও।" ইহা প্রকৃতির সামঞ্জস্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দরিদ্রগণ অভাবের জন্য যে ক্লেশ পায়, ধনের প্রাচুর্য বশতঃ ধনীগণ তদপেক্ষা অধিক ক্লেশ পায়। ধনীরা গুরুপাক আহারের পর অল্প শ্রম, অধিক বিলাস ও আলস্যের জন্য সহজেই অসুস্থ এবং অনেকে চিররুগ্ন হইয়া পড়ে। ধন রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ধনী মানসিক চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়। অনিদ্রা ধনীদিগেরই রোগ বলিয়া উক্ত হয়। ধনীর বাসনা অনায়াসে পূর্ণ হওয়ায় কিছুতেই আর সে নূতনত্ব পায় না, সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে অস্বাভাবিক আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকের উদ্ভাবনা করিতে হয় ; কিন্তু তাহাও সহজলভ্য হওয়ায় তাহাতে আর তৃপ্তি হয় না । এই কারণেই ক্ষণিক উত্তেজনা এবং স্ফূর্তি উদ্রিক্ত করিবার জন্য ধনীর গৃহে সুরার ব্যবহার অধিক হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এ সকল উক্তি চরিত্রবান সুশিক্ষিত ধনীদিগের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কর্মক্ষেত্রে ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতি নাই। ছাপাখানায় অনেক কর্মচারীকে দেখা যায়, তাহারা সমস্ত দিন কর্ম করিয়া "উপরি" আয়ের লোভে অধিক রাত্রি এমন কি সমস্ত রাত্রি কর্ম করিয়া পরদিন প্রত্যূষে গৃহে আগমন করে এবং স্নানাহার করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব পুনরায় কর্মস্থলে গমন করে। এতদ্বারা এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে শীঘ্রই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে ; তখন আর তাহাদের পূর্বের উৎসাহ,

অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকে না। তখন শরীরের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দুর্বলতাও আসিয়া পড়ে, কিন্তু তথাপি উপার্জনের লালসা ত যায় না! সুতরাং সুরাপান দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করত পূর্ব্ববৎ কর্ম করিতে থাকে এবং এই অভ্যাসই তাহার সর্বনাশ সাধন করে, কারণ, সুরা দেহ মন উভয়কেই অবসন্ন করিয়া ফেলে এবং শরীরের গ্রন্থি সমূহ শিথিল করিয়া দেয়। সুরাপায়ী মদিরার মত্ততায় তখন মুক্তহস্ত হয় এবং পরিশেষে ঋণজালে জড়িত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। সহায়-সম্পত্তি-শূন্য পরিবারবর্গ তখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকে; সুতরাং ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং জাতীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন। জগতে প্রায় উৎকৃষ্ট কার্য সুস্থ ও সবল ব্যক্তিদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

এমন যে অমূল্যধন স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষা হয়, তাহা সকলেরই চিন্তা করা কর্তব্য। অনেকের ধারণা ব্যায়াম স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়। ব্যায়াম দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় বটে কিন্তু ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। কোন কোন যুবককে দেখা যায় যে তারা নিতান্ত অপুষ্টিকর আহার ও অর্ধাহার করিয়া অতি ক্লেশ ও চেষ্টা-সাধ্য উৎকট ব্যায়াম করে এবং ক্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। যাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয় এমনভাবে শরীর চালনা করা উচিত। প্রাতর্ভ্রমণ, নৌকাচালন, সন্তরণ, কাষ্ঠচ্ছেদন, মৃত্তিকা খনন, পুরুষোচিত ক্রীড়া প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আহার এবং পানীয় সম্বন্ধেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শরীর চালনা করিলে কি হয় ? অপুষ্টিকর বা অহিতকর আহার, দূষিত জলপান, অপরিমিত পানাহার, অধিকরাত্রি পর্যন্ত জাগরণ এবং বিলম্বে শয্যাত্যাগ, মাদকদ্রব্য সেবন, বদ্ধবায়ু, দূষিতবায়ু অতিরিক্ত উষ্ণ বা শীতল বায়ু সেবন কি অপরিষ্কৃত স্থানে বাস প্রভৃতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যতঃ পালন করিতে হয়। অনেকে অপরিচ্ছন্ন মলিন শয্যায় শয়ন এবং মলিন বাস পরিধান করিয়া নানাপ্রকার চর্মরোগে ও চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পরিচ্ছন্ন বসন মনের প্রফুল্লতা এবং পবিত্রতা সম্পাদন করে। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে যে মানসিক পরিবর্তন হইতে থাকে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনেকের

ধারণা বেশভূষা এবং শারীরিক সৌষ্ঠব সাধন কেবল বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই লোকে করিয়া থাকে। বেশ-বিন্যাসের পশ্চাতে যদি একটু বিলাসিতার ভাব প্রচ্ছন্নও থাকে তথাপি তাহা কর্তব্য, কারণ তদ্বারা মস্তকে ময়লা জমিতে পারে না ; লোমকূপ পরিষ্কৃত হওয়ায় মস্তিষ্ক শীতল থাকে এবং শারীরিক শ্রীও বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অঙ্গে তৈলমর্দন, গাত্রমার্জন, পরিষ্কৃত ও অদূষিতজলে স্নান এবং পরিচ্ছন্ন পরিধান করা কর্তব্য। সভ্যসমাজের অনুমোদিত, পদোচিত পরিচ্ছদ পরিধান এবং লজ্জানিবারণই পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য নহে। পরিচ্ছদের মূল উদ্দেশ্য দেহরক্ষা। সকল অবস্থায় শারীরিক উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করা তদ্বারা ভাবী রোগের আক্রমণ হইতে এবং শীতাতপের ক্লেশ হইতে আত্মরক্ষা করা পরিচ্ছদের স্বাভাবিক এবং মৌলিক উদ্দেশ্য। এই কারণে বহুমূল্যবান অথচ মলিন এবং দুর্গন্ধময় পরিচ্ছদ অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন চীরবস্ত্র অধিক বাঞ্ছনীয় এবং হিতকর। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নির্ণীত হইয়াছে যে, আমাদের দেহে ৭০ লক্ষ লোমকূপ আছে ; এই সকল ছিদ্রপথ দিয়া অক্সিজেন নামক প্রাণবায়ু শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখে, কিন্তু ছিদ্রপথ সমূহ নানাকারণে ক্লিন্ন পদার্থে বন্ধ হইয়া গেলে, প্রাণবায়ুর গতিরোধ হয় এবং আমরা বিবিধ রোগে আক্রান্ত হই। পরিচ্ছন্নতা দেহে স্ফূর্তি, মনে প্রফুল্লতা, হৃদয়ে শক্তি, কার্যে প্রবৃত্তি এবং উৎসাহ দান করে। ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার অমোঘ উপায়।

অনেকের ধারণা, এমনকি কোন কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন যে নিয়মিত ও পরিমিত মদ্যপানে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আবার অনেকে গৌরব সহকারে বলিয়া থাকেন, "অমুক লেখক মদ না খাইলে লিখিতেই পারিতেন না, অমুক বিজ্ঞান বা অঙ্ক শাস্ত্রবিৎ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া তবে কঠিন প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতেন"; কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যদি মাদকদ্রব্য দ্বারা মস্তিষ্ক উষ্ণ না করিয়া অপ্রমত্তভাবে সেই সকল কর্ম সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেন। বঙ্গের অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কবি মধুসূদন, যিনি সুরারাক্ষসীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বহুক্লেশ পাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, তিনি স্বীয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"I

never drink when engaged in writing poetry, or if I do, I can never manage to put two ideas together!" অর্থাৎ "আমি কবিতা লিখিবার কালে কখনও সুরাপান করি না, আর যদিই দৈবাৎ করি, তাহা হইলে একসঙ্গে দুটি বিষয়ের মধ্যেও ভাবসঙ্গতি বজায় রাখিয়া উঠিতে পারি না !" মাদকসেবনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এবং শারীরবিজ্ঞানবিদের মত এস্থলে উদ্ধৃত হইল। সংসার ও সমাজের সর্বনাশ সাধন করিবার বিবিধ উপায়ের মধ্যে মদ্য এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য সর্বপ্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কত উৎকৃষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, কত কোটিপতি যে সুরাপান দ্বারা উৎসন্ন গিয়াছে এবং অবশেষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে কত তর্ক কত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সমুদয়ের বিস্তারিত উল্লেখ এস্থলে অসম্ভব সুতরাং যাহা চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত এবং বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহারই সার সিদ্ধান্ত এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,–

ডাক্তার কার্পেন্টার* বলেন যে, গবর্ণমেন্ট ১৮৪৯ অব্দে মাদ্রাজ সৈন্যদলের যে মৃত্যু-তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে প্রকাশ, অপরিমিতপায়ী ও মাদকাসক্ত, যথা শতকরা ৪.৪৫৬ জন মরিয়াছে এবং মিতপায়ী ও পরিমিত মাদকসেবী শতকরা ২.৩১৫ জন মৃত হইয়াছে, তথায় অপায়ী ও সর্বপ্রকার মাদকসেবা-বিরত ব্যক্তি শতকরা ১.১১১ জনমাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

লণ্ডনের "United Kingdom and General Provident Institution" এর ১৫ বৎসরের (১৮৬৪-৭৯) পরীক্ষায় জানা গিয়াছে সাধারণ মিতপায়ী বিভাগে, যথায় অনুমান করা গিয়াছিল যে ৩,৪৫০টি স্বত্বের দাবী হইবে, তথায় ৩,৪৪৪টি দাবী হইয়াছিল কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে পানবিরত

---

* *"The Physiology of Temperance and Total abstinence" by W. B. Carpenter M.D., F.R.S., F.G.S., London : Bell & Daldy. "The Relation of Alcohol to Bad sanitation". by J. J. Ridge, M. D., B. S., B. A., B. Sc. Lond., L. R. C. P. Lond., M. R. C. S. Eng., &c. &c.*

সংযনী বিভাগে ২,০০২ প্রত্যাশিত দাবীর মধ্যে ১,৪৩৩টি দাবী মাত্র হইয়াছিল।

নানা প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বহুদিনব্যাপী মিতপান ও মাদক সেবা, জীবন সংক্ষেপ করিয়া ফেলে এবং দেহ অধিক রোগপ্রবণ করে। মনুষ্যব্যতীত সকল জীবজন্তুর জলই একমাত্র পানীয়, —স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনধারণের জন্য অন্য পানীয়ের প্রয়োজন হয় না। শত শত নরনারী ও এমন কি কোন কোন জাতি সর্বপ্রকার জলবায়ুর মধ্যে সর্বদেশে, পান ও মাদক দ্রব্য বর্জন করিয়া দীর্ঘজীবী, উন্নত ও ঋদ্ধিশীল হইতেছে। এমন কি পান ও মাদক রহিত করায় জেলখানায় কয়েদীরা অধিক স্বাস্থ্যভোগ করে। নানাস্থানের জেলখানার স্বাস্থ্য-তালিকা হইতে ইহা জানা গিয়াছে।

নিষ্ঠাত্রয়

(সময়নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা এবং বাঙ্‌নিষ্ঠা)

একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা ব্যতীত কেহ কোন মহৎকার্য সমাধা করিতে পারে না। নিষ্ঠা ব্যতীত ব্রত উদ্‌যাপিত হয় না। জগতে যাঁহারা স্বাবলম্বনবলে বড় হইয়াছিলেন, সকলেই সময়নিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ এবং বাঙ্‌নিষ্ঠ ছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে বড় হইবেন,তাঁহারাও এই গুণত্রয়ের বলেই হইবেন। অনেক কবি, অনেক গ্রন্থকার, অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াও, হৃদয়ের কোমল মধুর গুণাবলীতে ভূষিত হইয়াও শুদ্ধ এই তিনটি গুণ হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, জীবনে কত কষ্টই না পাইয়াছেন। তাঁহারা লোকের হৃদয় জয়

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জীবনসংগ্রামক্ষেত্রে সর্বতোভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে সকল দুর্লভ শক্তি জনসাধারণের সাধনার বস্তু সে সমুদয় লাভ করিয়াও তাঁহারা পরমুখাপেক্ষী ও সহায়সম্পত্তিহীন হইয়া সারাটি জীবন কষ্টে কাটাইয়াছেন। দুর্ভাবনা ও দুঃসময় আসিয়া অনেকের অমূল্যজীবন অকালে হরণ করিয়াছে। বঙ্গের হরিশ্চন্দ্র, মধুসূদন, কাশীর ভারতেন্দু, ইংরাজ কবি গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কার্যের শৃঙ্খলা ছিল না ; কেহ কাব্য, কেহ বা সাহিত্য লইয়াই মত্ত ছিলেন ; বাহিরের সহিত তাঁহাদের কোনই সংস্রব ছিল না। জীবনসংগ্রামক্ষেত্রে তাঁহারা চতুর্দিকের বিষয়ব্যাপারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আপনার স্থান দৃঢ় করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সুরাপান এবং অমিতব্যয় তাহার প্রধান কারণ। সুরা বলবান্ ব্যক্তিরও স্নায়ু পেশী প্রভৃতি শিথিল করিয়া, শোণিত দূষিত করিয়া ও ক্ষুধা হরণ করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, মানসিক শক্তিসমূহ ক্ষয় করে এবং অবশেষে সুরাপায়ীকে তাহার সকল প্রতিভা ও সমস্ত শক্তির সহিত সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলে ; সুরার প্রমত্ততায় তাহার সকল শক্তি ভাসিয়া যায়।

সকল অবস্থার লোকের পক্ষেই এই নিষ্ঠাত্রয়ের বিশেষ প্রয়োজন। একজন সামান্য গৃহস্থ, যিনি আপনার ক্ষুদ্র সংসারের চতুঃসীমার বাহিরে কোন সংস্রব রাখেন না, তিনিই যদি নিয়মনিষ্ঠ, সময়নিষ্ঠ এবং বাঙ্‌নিষ্ঠ না হন, তাহা হইলে সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মস্রোতের মধ্যে তাঁহাকে পদে পদে বাধা পাইতে হয়। জনৈক ভদ্রলোকের সময়ের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না সুতরাং তাঁহার কোন কাজই সময়মত হইত না এবং তাঁহার সকল কাজই প্রায় অসম্পূর্ণভাবে হইত। তাঁহার গৃহে জিনিসপত্র বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান থাকিত, কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের নির্ধারিত স্থান ছিল না এবং যে স্থান হইতে যে দ্রব্য লওয়া হইত সে স্থানে আর সেই বস্তু পুনরায় রাখা হইত না। সুতরাং একটি বস্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার অনেক সময় নষ্ট হইত এবং বিরক্তি জন্মিত। কারণ শৃঙ্খলাই সময়ের উৎকৃষ্ট নিয়ামক। এদিকে প্রত্যেক দ্রব্য যথাস্থানে বিন্যস্ত থাকিলে গৃহ যেমন সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি দেখায়, তাঁহার নিষ্ঠার অভাবে তাহা হইতে পাইত না। একদিন

তাঁহার শয্যা হইতে উঠিব-উঠিব করিয়া প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেও কিছু বিলম্ব হইল ; এদিকে সেদিন হাটবাজার না করিলে তাঁহার আহার করিয়া কর্মস্থানে যাওয়া হইবে না, কারণ "আজকাল" করিয়া, "সকালে নহে বৈকালে নহে" এই করিয়া তাঁহার এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি কিছু অর্থ লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সেইদিন নয় ঘটিকার সময় তাঁহার এক বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার চাকরির জন্য সুপারিশ করিতে জনৈক ভদ্রলোকের নিকট যাইবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং সাড়ে আটটার সময় একজন পাওনাদারকে ঋণ পরিশোধ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন। এদিকে বাজার করিতে করিতেই ৯টা বাজিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়িতে পাঁচ দোকান দেখিয়া শুনিয়া ভাল অথচ সস্তা দরে জিনিস লইবার আর অবকাশ পাইলেন না। যাহা সম্মুখে পাইলেন তাহাই একটু দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিলেন। আসিয়াই শুনিলেন বন্ধুটি অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু মহাজন টাকা আদায় করিতে আসিয়া এবং টাকা না পাইয়া বিশেষ বিরক্তি সহকারে ফিরিয়া গিয়াছেন ; বলিয়া গিয়াছেন "টাকা যখন দিতেই পারবে না তখন এরূপ প্রবঞ্চনার প্রয়োজন কি ছিল ? কাজ ফেলিয়া আসিয়া আমারও কার্যের ক্ষতি হইল। আর আমার সঙ্গে যাহাদের এ সময় কাজ ছিল তাহাগেরও সময় নষ্ট হইল।" মহাজন টাকা কুঠিতে পৌছিয়া দিতে বলিয়া গিয়াছেন। বন্ধুটি কিন্তু নিজ গরজে বসিয়া আছেন। গৃহস্থ শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়া এবং "আধসিদ্ধ আধপেটা" খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়িতে তাঁহার হাতের ছাতা পড়িয়া গেল, কুড়াইতে গিয়া বুকের পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির হইয়া লোহার ছাতার বাঁটে ঠেকিয়া ঘড়ির কাঁচ ভাঙ্গিয়া গেল ও ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গেল ! যাহা হউক দপ্তরের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অন্যদিকে মন দিবার সময় নাই, বন্ধুকে সেদিন বিদায় করিয়া দিয়া দ্রুতপদে কর্মস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এত ত্বরা করিলেন তথাপি অফিসের প্রভু যিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বেশ গুরুগম্ভীরভাবে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিলেন। তাঁহার রোষগম্ভীরমূর্তি দেখিয়া দূর হইতেই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল ; এক্ষণে তিরস্কার লাভ

করিয়া, তিনি বিমর্ষ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। মনে মনে কেরানী-জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে কার্যে হাত দিলেন এবং সম্মুখে অনেক "জরুরী" কাজ স্তূপাকার পাইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যে ভদ্রলোকটির সহিত সেদিন তাঁহার বন্ধুর পরিচয় করিয়া দিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি নির্ধারিত সময়ে অন্য কর্মত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং অবশেষে বিরক্ত হইয়া কর্মান্তরে গমন করিলেন। গৃহস্থ তাঁহার নিকট, মহাজনের নিকট এবং স্বীয় বন্ধুর নিকট সত্যভ্রষ্ট হইলেন এবং গৃহে ও বাহিরে সকলেরই বিরক্তি ও অবিশ্বাসভাজন হইলেন। বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় কাজ শেষ করিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল, অপরাহ্নে গৃহে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার জন্য একখানি পত্র আসিয়া পড়িয়া আছে। পত্রখানা বড়ই জরুরী ছিল সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর না দিলে তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। তিনি হাত মুখ না ধুইয়াই উত্তর লিখিতে বসিলেন। কারণ অবিলম্বে ডাকখানায় না পাঠাইলে সেদিন আর ডাক যাইবে না। কিন্তু তাঁহার যেমন সময়নিষ্ঠা ছিল না, তাঁহার শৃঙ্খলাও ছিল না। চিঠির কাগজ ও খামের জন্য বাক্স খুলিলেন। বাক্সের মধ্যে কাগজপত্র এমনই বিশৃঙ্খলার সহিত ছিল যে, দুই তিনবার "উলট পালট" করিয়াও কাগজ পাইলেন না। পরিশেষে বিরক্তিসহকারে সমস্ত কাগজপত্র বাক্স হইতে বাহির করিয়া এক এক করিয়া দেখিতে লাগিলেন। চিঠির কাগজ অবশ্য বাহির হইল কিন্তু কালি কলম যথাস্থানে ছিল না। দ্রুতপদে মস্যাধার খুঁজিয়া লইতে গিয়া উহা হাত হইতে পড়িয়া গিয়া সমস্ত কালি গৃহতলে ছড়াইয়া পড়িল. তাঁহার পোশাকও কিছু নষ্ট হইয়া গেল। সময় ত নষ্ট হইলই, অধিকন্তু মেজাজ খারাপ হইয়া গেল এবং জিনিসপত্র অধিকতর বিশৃঙ্খল হইল। তিনি বিরক্তি ও ত্বরার জন্য পত্রে কয়েকটি অত্যাবশ্যক বিষয় লিখিতে ভুলিয়া গেলেন এবং অতিদ্রুত ডাকঘরে গিয়া শুনিলেন ডাক চলিয়া গিয়াছে। অথচ সে পত্র সেই ডাকে না গেলে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন, সুতরাং গাড়িভাড়া করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ষ্টেশনে গিয়া পৌছিলেন। তথায় বিলম্বের মাশুল দিয়া পত্র রওনা করিয়া গৃহে ফিরিলেন। সেদিন তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, লাঞ্ছনা, এবং গাড়িভাড়ারূপ অর্থদণ্ডে দুর্দশার

একশেষ হইল। তাঁহার আলস্য, দীর্ঘসূত্রিতা, সময়ের অপব্যবহার এবং শৃঙ্খলা ও বাঙ্‌নিষ্ঠার অভাব তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ সঙ্কটে পাতিত করিত, লোকের নিকট অপদস্থ করিত এবং গৃহে অশান্তি আনয়ন করিয়া হৃদয় মনের শান্তিও হরণ করিত ; তথাপি, কেমন যে তাঁহার প্রকৃতি এই শত্রুগুলাকে বিনাশ করিয়া তিনি সময়নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা এবং বাঙনিষ্ঠা এই তিনটি মিত্রলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন না। পরিণামে এই ব্যক্তি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া সংসারকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া যান। সামান্য গৃহস্থের যখন এই দশা, তখন যাঁহারা বিস্তৃত সংসারের এবং বড় বড় সাম্রাজ্যের ভার মাথায় লইয়া আছেন, যাঁহারা কোটী কোটী প্রজার সুখদুঃখের জন্য দায়ী, মন্ত্রী ও শাসক সম্প্রদায়, দেশের প্রয়োজনসাধক মহাজন, ব্যবসাদার, জাতীয় ভবিষ্যৎ নির্মাতা এবং ভবিষ্য বংশের মঙ্গলা-মঙ্গলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ, প্রচারক, সম্পাদক, লেখক প্রভৃতি দেশনায়কগণ এবং যাঁহারা জীবনের বিস্তারিত কর্ম্মক্ষেত্রে গুরুতর দায়িত্ব লইয়া বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের কি ভয়ানক অবস্থাই কল্পনা করা যাইতে পারে, যদি তাঁহারা এই নিষ্ঠাত্রয় হইতে বঞ্চিত হন! যে ব্যক্তি সময়ের ঠিক রাখিতে পারে না, সে কর্ম্মেরও ঠিক রাখিতে পারে না, সুতরাং, কেহ তাঁহাকে সহজে বিশ্বাস করে না এবং কোন কর্ম্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেও পারে না। সে, সময়ের মূল্য না বুঝিয়া, আপনার এবং পরের সময় নষ্ট করে। সে যদি দোকানদার হয় তাহা হইলে, প্রত্যহ ঠিক সময়ে দোকান না খুলায় তাহার গ্রাহক সংখ্যা হ্রাস হয়। সে যদি ক্রেতা হয় এবং ধারে ক্রয় করিয়া ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ না করে তাহা হইলে, দোকানদারের বিশ্বাস হারায় এবং শীঘ্রই তাহাকে সে দোকান ছাড়িতে হয়। ব্যবসাদারের পক্ষে সময়নিষ্ঠার ন্যায় গুণ আর নাই। ইহাই তাঁহার সাধারণের উপর বিশ্বাস উৎপাদনে এবং পসার জমাইবার সুনিশ্চিত উপায়। সময়নিষ্ঠার অভাবে তাঁহাকে লোকের শ্রদ্ধা হারাইতে হয়। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন —"সময়নিষ্ঠা বাণিজ্যচক্র মসৃণ করিবার একমাত্র তৈল। যে ব্যক্তি কথা দিয়া কথার ঠিক রাখিতে অবহেলা করে, সে কেবল নিজেরই সময় ক্ষয় করে তাহা নহে, অন্যান্য লোকেরও সময় নষ্ট করে এবং তাহাদের

এমন কোন বস্তু হইতে বঞ্চিত করে যাহা তাহারা আর কখন পূরণ করিতে সমর্থ হয় না।" সময়নিষ্ঠা প্রত্যেক ব্যক্তিরই শিষ্টতার লক্ষণ। সিদ্ধকাম এবং ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ সময়ের মর্যাদা অনুভব করিতে ভুলেন না। সময়ের মিতব্যয় অর্থের মিতব্যয় অপেক্ষা কোনক্রমেই ভিন্ন নহে। মিতব্যয়ী ফ্রাঙ্কলিন্ বলিতেন, "সময়ই সুবর্ণ।" অর্থ উপার্জন সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই সম্ভব হয়। শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা করিয়া কার্য করিলে সময়ের পরিমিত ব্যয় হয়। কোন উদ্দেশ্যসাধন জন্য সময়ের তিলমাত্র অপব্যয় না করার নামই ব্যবস্থা, পদ্ধতি বা নিয়ম। প্রত্যেক কাজেরই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা এবং প্রত্যেক কাজই ঠিক সময়ে নির্বাহ করা কর্তব্য। ইহা ব্যবসায়ীর পক্ষে যেরূপ, সংসারী ব্যক্তির আর সকল কর্মক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপ অপরিহার্য। সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া কত লোক কত উন্নতি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ডাক্তার মেসন্ গুড প্রত্যহ যে সময় রোগী দেখিতে গমনাগমন করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে, গাড়িতে বসিয়া তিনি "লুক্রিশিয়ার" উৎকৃষ্ট অনুবাদ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ডাক্তার ডারউইনের গাড়ি যে সময় এক বাড়ি হইতে অন্য বাড়ি লইয়া যাইত সেই সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে তিনি তাঁহার বিচিত্র বৈজ্ঞানিক কবিতাবলী লিখিতেন। দি ক্যামেলো ডি এগুএলার স্ত্রী তাঁহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের অন্ন দিবার পূর্বে যে ১৫ মিনিট বসাইয়া রাখিতেন সেই সময়টুকু নষ্ট করিতে না দিয়া প্রত্যহ সেই সময়ের মধ্যে তিনি গ্রীক ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। "কামারপণ্ডিত" এলিহু বরিট দোকানের কাজ করিতে করিতে যেটুকু সময় পাইতেন নিত্য তাহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং তদ্দারা তিনি ১৮ টি লিখিত এবং ২২ টি প্রাদেশিক ভাষার অধিকার লাভ করেন। চার্লস কিংসলী, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ প্রভৃতি সকলেই সময়ের মূল্য বুঝিতেন এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কখন খামখেয়ালী ভাবে কাজ করিতেন না। যাহা অদ্য করিবার তাহা অদ্যই করিতেন, কল্যকার জন্য রাখিয়া দিতেন না। জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন, আগামী কল্য কখন আইসে না । যাহা বাস্তবিক আইসে তাহার নাম গতকল্য এবং অদ্য। "সময় ফুরাইল" "সময় নষ্ট হইল" বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে কালহরণ

করিলে সময় পাওয়া যায় না। — ইচ্ছা থাকিলে সময় ও উপায় আপনিই আইসে। ফরাসী পণ্ডিত কুবের যখন গাড়িতে যাতায়াত করিতেন সেই সময়টুকুর মধ্যেই অধ্যয়ন ও চিন্তা করিতেন। তাহারই ফলে তাঁহার "আপেক্ষিক ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান" আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। হেনরী কাক হোয়াইট যখন উকিলের কেরানী ছিলেন তখন আদালত হইতে এখানে ওখানে যাতায়াত করিবার কালে তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। সময়নিষ্ঠাই ইহার মূল।

এই সময়নিষ্ঠা, নিয়ম ও বাঙ্‌নিষ্ঠার সহিত এমনি সম্বন্ধ যে একটির অভাবে অন্য দুইটির অভাব হয় এবং একের অনুশীলনে অন্য দুইটিরও অভ্যাস হয়। যিনি ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কর্ম করিতে বিস্মৃত হন না, তিনি যে সময়ে যাহা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তাহা করিতে সমর্থ হন, এবং যিনি শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নির্দিষ্ট স্থানে রাখেন ও প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি স্থান নির্ধারিত করেন, তিনি নির্দিষ্ট কার্য করিবার সময় বা অবসর প্রাপ্ত হন ; সুতরাং, তিনি যাহা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তাহা পালন করিতে সক্ষম হন এবং সকলের বিশ্বাসভাজন হন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ ছাপাখানার কার্যে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অমানুষিক শ্রম ও অধ্যবসায় বলে অনন্যসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি সময়ের সদ্ব্যবহারে এবং মিতব্যয়িতায় সকলের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা এবং নিয়মনিষ্ঠা তাঁহাকে চরিত্ররূপ অমূল্যনিধি দান করিয়াছিল। তিনি দেশমান্য এবং সকলেরই বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সাধারণের এই বিশ্বাসই তাঁহার উন্নতির মূলস্বরূপ হইয়াছিল। যিনি এই গুণত্রয় লাভ করেন, তিনি সংসারে সুখী, সমাজে আদৃত এবং দেশমান্য হইয়া থাকেন। ঋদ্ধি তাঁহারই অধিকৃত হয়।

বাঙ্‌নিষ্ঠায় এক সময়ে ভারতবাসী হিন্দুগণ অদ্বিতীয় ছিলেন। জগতে তাঁহাদের ন্যায় সত্যপরায়ণ অন্য জাতি ছিল না। এই সত্যনিষ্ঠা হিন্দুজাতিকে সভ্যতম, সমুন্নত, স্বাধীন এবং ব্রহ্মবিদ্ করিয়াছিল। তখন বাঙ্‌নিষ্ঠার এতই মর্যাদা ছিল যে, পিতৃসত্য পালন হেতু রামচন্দ্র সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, অতুল ঐশ্বর্য, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এবং সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায়

বনবাসের দুঃখ ও ক্লেশ মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্‌নিষ্ঠার জন্যই মহামতি ভীষ্ম আমাদিগের চির-আদর্শ হইয়াছেন। তিনি সত্যপালন করিবার জন্য চিরকৌমার্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতসাম্রাজ্য এবং সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন এবং ভীষণ প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া ভীষ্ম নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রেগুলাস নামে একজন রোমক অন্যান্য রোমবাসীর সহিত কার্থেজে বন্দী হইয়াছিলেন। রোমের সহিত তখন ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল। কার্থেজবাসিগণ বহুদিনব্যাপী সমরের পর রোমের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। এই সূত্রে কয়েকজন রাজদূত রোমে প্রেরিত হইলেন এবং সেইসঙ্গে রেগুলাসও কারামুক্ত হইয়া সন্ধিস্থাপনে সহায়তা করিবার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতে হইল যে, যদি তিনি সন্ধিস্থাপনে অসমর্থ হন তাহা হইলে রোম হইতে ফিরিয়া তিনি কারাগৃহে পুনঃশৃঙ্খলাবদ্ধ হইবেন। রেগুলাস জানিতেন, যদি তিনি অকৃতকার্য হন তাহা হইলে শত্রুপক্ষ তাঁহাকে অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিবে। কিন্তু তিনি রোমে উপস্থিত হইয়া স্বদেশবাসিদিগকে অধিকতর উৎসাহ এবং অধ্যাবসায়ের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য উত্তেজনা এবং পরামর্শ প্রদান করিলেন। পরে তিনি রোমবাসিদের সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন জন্য কার্থেজের কারাগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা—কি অমানুষিক অত্যাচারসহকারে তাঁহার প্রাণবধ করা হয়, ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। রেগুলাস এখন নাই, কিন্তু তাঁহার বাঙ্‌নিষ্ঠার কথা, তাঁহার স্বদেশভক্তি, স্বাধীনচিত্ততা, তাঁহার ভীষণ সত্যপালনের কথা আজিও জগদ্বাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এই সত্যনিষ্ঠা যেমন একদিন ভারতকে সমুন্নত ও ভারতবাসীর নাম গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিল, এই মহৎ গুণই বাঙ্‌নিষ্ঠ রেগুলাসের স্বজাতিবর্গকে লোকমান্য, গৌরবান্বিত এবং সমুন্নত করিয়াছিল।

পুরুষকার এবং অদৃষ্ট

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"
"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ।" --সদ্ভাবশতক।

পুরুষকার, উন্নতি ও ঋদ্ধির মূলে অবস্থান করে। চেষ্টা, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায় ব্যতীত লোকে লক্ষ্মীলাভ করিতে পারে না। জগতের শ্রীমন্ত জাতি সকলের মধ্যে যাঁহারা প্রধান এবং জ্ঞান, ধন ও ক্ষমতায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন অধিকারের দাবী রাখেন, তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরুষকারের দৃষ্টান্ত।

য়ুরোপ এক সময়ে অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। রীতিনীতি আচার পদ্ধতি এবং কুসংস্কার তথাকার অধিবাসিগণকে মনুষ্যোচিত গুণাবলী হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এক শুভক্ষণে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তথায় জ্ঞানের আলোক যখন প্রবেশ করিল, তখন সহসা তাহাদের হৃদয়ের আঁধার ঘুচিয়া গেল. তাহাদের মাথা খুলিয়া গেল ; তখন কেহ দর্শনে, কেহ বিজ্ঞানে, কেহ শিল্পে, কেহ সাহিত্যে, কেহ ধর্মে এবং কেহবা সমাজে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উন্নতিবিধানে ব্রতী হইল। কিছুকাল পরে দেখা গেল যথায় মূর্খতা রাজ্য করিতেছিল, তথায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল ; যথায় দুর্গম বনভূমি ছিল, তথায় রাজবর্ত্ম, অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান প্রভৃতি শোভা পাইতে লাগিল ; যথায় অরাজকতা বিরাজমান ছিল, তথায় সুবিচার ও সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হইল ; যাহার কূপমণ্ডূক প্রকৃতি ছিল, তাহারা বাণিজ্য-

ব্যপারে ব্যাপৃত হইল ; যাহারা সামান্য অশনবসনের জন্য লালায়িত ছিল, তাহাদের জন্মভূমি জগতের বিবিধ পণ্যে, ধনধান্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হইল। পশ্চিম ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ একদিন প্রাচ্যের ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"কেন এমন হইল ?" তখন এই প্রশ্নের উত্তর দৈববাণীস্বরূপ ভারতের ধনবিজ্ঞান মন্থন করিয়া উত্থিত হইয়াছিল "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ"।

পূণ্যভূমির অধিবাসিগণ যে মন্ত্র সাধনদ্বারা জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া মহালক্ষ্মী এবং অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রের সাধক আজি কোথায় ! হায় ! অমৃতের পুত্রগণ আজি তোমরা সেই সঞ্জীবন মন্ত্র হারাইয়া মহালক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছ ! এক্ষণে "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ" এই মহামন্ত্রের সাধন কর এবং পুনরায় কমলার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হও।

উদ্যোগ যেরূপ আলস্যের বিপরীত অদৃষ্ট তদ্রূপ পুরুষকারের বিপরীত। সাধারণতঃ লোক যে অর্থে "অদৃষ্ট," "দৈব," "ভাগ্য", "কপাল" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা উদ্যম, অধ্যবসায় এবং চেষ্টার বিপরীত। প্রায়ই শুনা যায়—"কপালে থাকে হবে", "কপালে ছিল না হ'ল না", "কপালে নাই হইতেছেনা"; "চেষ্টা ক'রে আর হবে কি ? কপালে যখন নাই, তখন হাজার চেষ্টা করিলেও কিছু হবে না।" "অমুকের কপাল মন্দ ওর দোষ কি?" "কপালে বা অদৃষ্টে থাকে তুমি নিশ্চয়ই পাইবে।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই "কপাল" বা "অদৃষ্ট" বা "ভাগ্য"—পুরুষকার, চেষ্টা, উদ্যম, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, উৎসাহ প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণরাশির মূলে অহরহঃ কুঠারাঘাত করিতেছে। দুই এক বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া অনেক উচ্চাভিলাষী যুবক, অবসাদের জনক কপাল বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিরস্ত হন। যাঁহারা 'কপাল', 'অদৃষ্ট' এবং "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র" বলিয়া অহরহঃ চীৎকার করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। কেন এমন হইল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাঁহাদের এই চীৎকারের মূলে আলস্য অযোগ্যতা এবং ভগ্নস্বাস্থ্য বা অন্য কোন ত্রুটি বিদ্যমান আছে। কিন্তু আত্মপ্রতারণাপটু

বৃথাগর্বী ব্যক্তিগণ আত্মত্রুটি ও অযোগ্যতা গোপন করিবার জন্য, আপনার এবং অন্যের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার সরল পন্থা অবলম্বন করেন; তাঁহারা বলেন, অদৃষ্টের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য ! "অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডিবে বল?" ইত্যাদি। এই যে অনেক যোগ্যব্যক্তি চাকরিস্থলে অল্প বেতনে বহুকাল পড়িয়া থাকেন এবং অনেক অযোগ্য ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চবেতন লাভ করিয়া থাকেন তাহার কারণ কি ? কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ গুণের পুরস্কার না পাইয়া এবং তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে দেখিতে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন—"তাঁহাদের—অদৃষ্টই মন্দ।" কিন্তু তাঁহারা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেন না যে, যে সকল অযোগ্য ব্যক্তি, স্বল্পশিক্ষা, হীনশক্তি এবং দুর্বল মস্তিষ্ক লইয়া উত্তরোত্ত র উন্নতি করিয়া চালিয়াছেন তাঁহারা— স্ব স্ব অদৃষ্ট বা "কপাল" ক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা শিক্ষা, কার্যকুশলতা এবং হৃদয়ের সদ্ভাব সমূহে হীন হইলেও, যে সকল কৌশলে তাঁহাদের ভাগ্যবিধাতৃগণ সন্তুষ্ট এবং বাধ্য হন, সেই সকল উপায় এবং কৌশল প্রয়োগে তাঁহারা নিপুণ। এই সকল ব্যক্তি কখন নিশ্চেষ্ট থাকেন না; ইঁহারা অদৃষ্টবাদী সহযোগিগণের ঔদাসীন্যের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এই চেষ্টা, এই উদ্যোগ, এই একাগ্রতার কি কোনই পুরস্কার নাই? এই সকল বলবত্তার গুণ তাঁহাদের অন্য সমুদয় অযোগ্যতাকে আবৃত করিয়া রাখে। পক্ষান্তরে ঔদাসীন্য এবং নিশ্চেষ্টতা যোগ্যতর ব্যক্তিদিগের গুণরাশিনাশী হইয়া আর্থিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে ; সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সদুপায়েই হউক আর অসদুপায়েই হউক চেষ্টা বা পুরুষকার ব্যতীত কার্যসিদ্ধি হয় না। যাঁহাদের "কপাল" বা অদৃষ্ট প্রসন্ন তাঁহারা স্ব স্ব অদৃষ্ট পুরুষকাব দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন। "সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ আসিয়া কখন প্রবেশ করে না।" আলোক যেমন ছায়ার নিত্যসঙ্গী, এ জগতে সেইরূপ, সকল বিষয় ও বস্তুর সহিত ভাল এবং মন্দ জড়িত আছে। অদৃষ্টবাদ যেমন জাতীয় অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা এবং অনুন্নতির সৃষ্টি করিয়াছে, অদৃষ্ট তেমনি অলসদিগের এবং যাহারা উদ্যম ও চেষ্টা করিয়াও কোন অলক্ষিত কারণে বা অজ্ঞানবশতঃ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহাদের

শান্তির কারণ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে অদৃষ্টবাদ শান্তি এবং সহিষ্ণুতার জনক। কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ের জল যেমন ক্রমেই দূষিত এবং অহিতকর হয়, স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় জাতির পক্ষে অদৃষ্টবাদ তেমনি পরম অহিতকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতের শ্রীমন্তজাতিসকল, অদৃষ্টকে বিনাশ করিয়া পুরুষকারের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন ! ঘোর অদৃষ্টবাদিগণ তাঁহাদের অনুগ্রহছায়াতলে আশ্রয় লইতেছেন। তাঁহাদের দুঃখ দ্রারিদ্র্য আর ঘুচিতেছে না। এদেশে অদৃষ্টবাদিগণ, অদৃষ্টগণকগণ ভবিষ্যৎ গণনা ও অদৃষ্টের ফলাফল গণনা করিতেছেন, আর উদ্যোগী পুরুষগণ লক্ষ্মীলাভ করিতেছেন। এডবার্ড ডেনিসন তাই বলিয়াছেন, "ভবিষ্যৎ জানায় গুণপনা নাই কিন্তু তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়াই মহাধর্ম।"

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অনেক উদ্যমশীল যুবকও দুই তিনবার অকৃতকার্য হইয়াই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিরস্ত হন। কিন্তু, যাঁহারা অদৃষ্টের উপর বড় আস্থা স্থাপন করেন না তাঁহারা সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। যাঁহাদের এরূপ একাগ্রতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, তাঁহারা একবার নহে, দুইবার নহে, শতবার চেষ্টা করিয়া তবে কৃতকার্য হন। পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য হইয়াও মৃৎবাসন-নির্মাতা প্যালিসি ১৬ বৎসর কাল সাহসে বুক বাঁধিয়া আপনার ব্যবসায়ে দৃঢ় থাকিয়া তবে সিদ্ধিলাভ করেন। যে সহজেই ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়ে, তাহার দ্বারা কখন কোন কাজ হয় না। পৌনঃপুনিক অসিদ্ধি জ্ঞানীজনের পক্ষে অকৃতকার্যতাকে অসম্ভব করিয়া তুলে, কারণ প্রত্যেক অসিদ্ধি এক একটি পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে, পুনঃপুনঃ পরীক্ষাজনিত ভূয়োদর্শন ভুলভ্রান্তি দূর করিয়া সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। খাঁটুরিয়া নিবাসী হরিশ্চন্দ্র দত্ত একজন শ্রীমন্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া ১০ বৎসর বয়সে গোবরডাঙ্গায় পিতার বাণিজ্যকুঠিতে কর্মশিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। তিনি পাঁচ বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং কর্মকুশলতা প্রদর্শন করিয়া পিতার বিশ্বাসভাজন ও তাঁহার সমুদয় কার্যভার প্রাপ্ত হন। তিনি ১২ বৎসরে দুই লক্ষ টাকা লাভ দেখান। একবার তিনি পশ্চিম হইতে ৬০ হাজার টাকার পণ্য নৌকা করিয়া আনিতেছিলেন এমন সময় নৌকা

জলমগ্ন হইয়া ৬০ হাজার টাকা নষ্ট হয়। এদিকে তিন চার বৎসরের মধ্যে মাতৃবিয়োগ, ভ্রাতৃবিয়োগ, জমিদারি বিক্রয় এবং জমিদারি লইয়া দীর্ঘকাল মকদ্দমা, পিতামাতার শ্রাদ্ধের ব্যয়, পুত্র কন্যার বিবাহ্ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিয়া তিনি কপর্দকশূন্য হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় অনেকেই, বিশেষতঃ অদৃষ্টবাদীরা, ভগ্নহৃদয় হইয়া জীবনে আর পুনরুত্থানে সমর্থ হন না ; কিন্তু, উদ্যমশীল এবং অধ্যবসায়ী হরিশ্চন্দ্র পুনরায় লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিয়া ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের কৃতকার্যতা, মধ্যজীবনের অমিতব্যয়িতা জনিত দারিদ্র্য এবং শেষ জীবনের উদ্যোগজনিত লক্ষ্মীলাভ-তাঁহার স্বকৃত কর্মের ফল, তাঁহার অদৃষ্টের পরিণাম নহে।

আত্মপ্রতারণা

কথাটা শুনিলেই তোমরা হয়ত হাসিবে এবং বলিবে, "আপনাকে আপনি কি কেহ্ প্রতারণা করিয়া থাকে ? ইহাও কি সম্ভব ?" "নিজের চক্ষে কে ধূলি নিক্ষেপ করিবে ?" কিন্তু একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবে, আমরা আপনার চক্ষে আপনি কতবার ধূলা দিয়াছি এবং তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া কতবারই অনুতপ্ত হইয়াছি। আত্মপ্রতারিত হইয়া অনুতপ্ত হয়, এমন অনেককে দেখা যায়। হে আত্মপ্রতারক ! কোন কার্য করিবার তোমার প্রবল বাসনা হইয়াছে, তুমি অদ্যাবধি যে মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, যাহা গ্রন্থে পাঠ করিয়াছ এমন কি তোমার বিবেকবুদ্ধিদ্বারা

বুঝিতেছ যে, সে কার্যে তোমার অহিত হইবে, কিন্তু তৎপ্রতি তোমার এতই লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, সেই কার্য করিতে তোমার এমনই প্রবল বাসনা হইয়াছে যে, তুমি নানা প্রকার যুক্তিতর্ক দ্বারা আপনারই মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছ যে, ঐ কার্যসাধনে পাপ বা অনিষ্ট নাই। তুমি মনকে বুঝাইতে চাও যে, এরূপ কার্য ত সমাজের অনেক বিখ্যাত, অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, অনেক গণ্যমান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—মহাজনদিগের পথ কেনই বা তুমি অবলম্বন না করিবে অর্থাৎ যেমন করিয়াই হউক মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা কর যে তুমি যাহা করিতে অভিলাষ করিয়াছ তাহা অকর্তব্য নহে। ইহাকেই আত্মপ্রতারণা বলে। এইরূপে কত শত নরনারী কুপথগামী হইয়াছে এবং যখন তাহার কুফল ভোগ করিয়াছে, তখনই অনেকের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে এবং আপনাকেই স্বীয় পতনের মূল বুঝিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। আবার এমনও অনেক আছে, যাহারা কোনক্রমেই আত্মদোষ স্বীকার করে না এবং আপনার মনকে বুঝাইয়া ও "অদৃষ্টের" দোহাই দিয়া লোকচক্ষুতে আপনাকে নিরপরাধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ইহারা আপনারও চক্ষে ধূলা দেয় এবং সমাজের চক্ষুতেও ধূলি নিক্ষেপ করে। ইহারাই প্রতারকের চূড়ান্ত!

কত ব্যবসাদার, কত দোষের জন্য উন্নতি করিতে পারে না, কেহ নিরেশ মাল অধিক দরে বিক্রয় করার জন্য, কেহ অসদুপায়ে ব্যবসায় চালাইবার জন্য, কেহ কর্কশবচনের জন্য, কেহ পরিণামদর্শিতা এবং অধ্যবসায়ের অভাবের জন্য, কেহ শুদ্ধ অসহিষ্ণুতার জন্য ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত, দীনদশাপন্ন হইয়া পড়ে, অথচ স্বীয় ত্রুটি দর্শন না করিয়া বা সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, গ্রাহকবর্গের দোষ, দেশের দোষ, আইনকানুনের দোষ এবং সর্বোপরি "অদৃষ্টের দোষ" দিয়া থাকে। পরের নিকট আত্মদোষ স্বীকার করিবার সাহস যেমন তাহাদের নাই, লোকচক্ষুর অগোচর স্বীয় বিবেকের সম্মুখে আত্মত্রুটি স্বীকার করিতেও তাহাদের লজ্জা এবং ভয় হয়। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অনেক ছাত্রের মুখে শুনা যায়, এবৎসর প্রশ্নগুলি অযথা কঠিন ছিল, "আমি ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম কিন্তু কেন যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম না ঈশ্বর জানেন।" "ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে

পারিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইতাম” এইরূপে কেহ প্রশ্নের, কেহ পরীক্ষকের, কেহ শিক্ষকের দোষ দিবে তথাপি সাহস করিয়া বলিবে না, “আমারই দোষে এরূপ হইয়াছে।” পরের ছিদ্র দেখিতে লোক যেরূপ তৎপর, অন্যের অপরাধ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লোক যেরূপ পটুত্ব প্রদর্শন করে, পরনিন্দা ও পরচর্চায় যেরূপ সময়ক্ষেপ এবং আনন্দলাভ করে, পরদোষোদঘাটনে যেরূপ সাহসের পরিচয় দেয়, আত্মদোষ অন্বেষণ করিতে, আত্ম-ত্রুটি স্বীকার করিতে এবং তাহা সংশোধন করিতে তাহারা যদি অর্ধেক তৎপরতা এবং আনন্দ ও সাহস প্রকাশ করিত, তাহা হইলে, সমাজ আজি এতদূর অধঃপতিত হইত না। যাহারা আত্মাপরাধ স্বীকার করে না, যাহারা আত্মদোষ সংশোধন করে না, যাহাদের সে সাহস নাই, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রতারণা করিয়া থাকে। জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে যেমন এই আত্মপ্রতারণা উন্নতিপথের কণ্ট কস্বরূপ দণ্ডায়মান হয় এই আত্মপ্রতারণাই তদ্রূপ ব্যবসায়ীর সর্বনাশ সাধন করে। কারণ ইহা তাহাকে কেবল নির্ধন করিয়াই নিরস্ত হয় না ; তাহার মন হইতে সকল শক্তি, হৃদয় হইতে সকল সাহস, সকল সদ্ভাব এবং শরীর হইতে বল ও বীর্য হরণ করিয়া লয়। আত্মপ্রতারক চরিত্রহীন দীনের মত পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবনের ভার বহন করিতে করিতে এ সংসার হইতে অপসৃত হয়। কেহ তাহার জন্য একবিন্দু সহানুভূতির অশ্রু ফেলিবার থাকে না। বরং লোকে ইহাই বলিয়া থাকে “অমুক শুদ্ধ স্বীয় নির্বুদ্ধিতা বা অবিবেচনা অথবা দুর্নীতির জন্যই নষ্ট হইল।” কেহ গম্ভীরভাবে বলে, “ লোকটা আপনার দোষে মজিল—সমস্ত পরিবারটিকেও ভাসাইয়া গেল !” আত্মপ্রতারকের পরিণাম কখন কখন ইহা অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মপ্রতারণার হস্ত হইতে সর্বদা আত্মরক্ষা করা কর্তব্য।

শ্রীমন্ত পুরুষের বীরত্ব

তোমায় কাপুরুষ বলিলে, ভীরু বলিলে, তুমি কি অপমান বোধ কর না? নিশ্চই তখন তোমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ভীরু কাপুরুষের মত কি করিয়াছ, তখন তুমি হয়ত খুঁজিয়াই পাও না। বরং কবে কোন্ সাহসের কাজ করিয়াছ, কোন্ দিন ভূতের ভয় না করিয়া অন্ধকারে একাকী কোন্ শ্মশানের নিকট দিয়া গমন করিয়াছিলে অথবা কোন্ দিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়াছিলে তাহাই তখন মনে পড়িয়া যায়। অনেক অবোধ গোঁয়ার ছাত্র শিক্ষকের অবাধ্য হইয়া, কিম্বা তাঁহার সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল, মনে করে। কিন্তু এ সকলের কোনটিতেই বীরত্বের লক্ষণ নাই। এমন কি, শুদ্ধ শারীরিক বলেই একজন বীর হইতে পারে না। যুদ্ধে তুমি অসংখ্য সৈন্যের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পার, শিকারে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঘ্র বধ করিতে পার, প্রভূত বলশালী মল্লকে পরাভূত করিতে পার, তথাপি তোমাকে বীর বলিব না। প্রকৃত বীরের লক্ষণ তোমাতে আছে কি না তাহাই দেখিব। তুমি যদি তোমার প্রবৃত্তিকে দমন করিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি নিজের কাছেই পরাস্ত হইয়া আছ; অতএব তুমি অপরকে পরাভূত করিবে কি প্রকারে ? যে শত্রুকে দেখিতে পাইতেছ, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে, বিবিধ কৌশলে তাহাকে আয়ত্ব করিতে পার; কিন্তু যাহাকে দেখিতে পাও না, স্পর্শ করিতে পার না, রামায়ণের মেঘান্তরালে অবস্থিত মেঘনাদের মত যে সকল অদৃশ্য শত্রু তোমার সর্বনাশ সাধন করিতেছে ; যাহারা তোমায় নানা কুপথে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, মুহূর্তের জন্যও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দিতেছে না ; তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মায়াবী মহীরাবণের ন্যায় তোমার পরমহিতৈষী

বন্ধুর আকারে উপস্থিত হইয়া অহরহঃ তোমায় মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা পাইতেছে, সেই অতিপ্রবল গৃহশত্রুদের দমনের জন্য তুমি কি করিতেছ ? তাহারা যে তোমায় সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া তাহাদের কৃতদাস করিয়া রাখিয়াছে। তুমি, বুঝিতেছ প্রত্যূষে উঠিলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল হইবে, অধ্যয়নের সুবিধা হইবে এবং কর্তব্যগুলি সময়মত নির্বাহিত হইবে; প্রত্যূষে উঠিতে তোমার প্রবল ইচ্ছাও হইতেছে, কিন্তু তোমার এক শত্রু আলস্য তোমায় শয্যাতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সাধ্য কি তুমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া গাত্রোত্থান কর ? ভারতবিখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যেরূপ অনলস, তুমি কি সুস্থ সবল দেহে তাহা হইতে পারিবে ? তিনি অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া তাহার উপর বহুদিন অনিদ্রা রোগে কষ্ট পাইয়া চিকিৎসকের পরামর্শে রাত্রে এমন কি সন্ধ্যাকালেও কঠোর জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সময়ের বাঁধাবাঁধির মধ্যেও তিনি কত কঠোর কর্তব্য সাধন করিতেছেন ! তিনি ভয় পাইবার পাত্র নহেন; কারণ তিনি অনলস এবং উদ্যোগী পুরুষ। তিনি স্বীয় কর্তব্যগুলি যথাসময়ে এবং যথানিয়মে পালন করেন। আলস্য কি তাঁহার শত্রুতা সাধন করিতে পারে ? তিনি প্রাতঃকালের দুইঘণ্টা (গ্রীষ্মকালে ৬-৩০ হইতে ৮-৩০ এবং শীতকালে ৭টা হইতে ৯টা) নিয়মিতরূপে বিদ্যাচর্চায় যাপন করেন। অধ্যাপনার জন্য ১ কি ২ ঘণ্টা বাদ দিয়া ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত তিনি কলেজে বৈজ্ঞানিক অভিনব গবেষণায় যাপন করেন এবং অপরাহ্নে মুক্ত বাতাসে অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর সন্ধ্যায় এক বা দেড় ঘণ্টা লঘু সাহিত্য পাঠ করেন। কলেজের ছুটির সময়ও তিনি ঠিক এই নিয়ম অনুসারে কাজ করেন। কর্মবীর স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু জীবনে কখন আলস্যের হস্তে পরাভূত হন নাই। তিনি জীবনটাকেই ঈশ্বরের গচ্ছিত ধনের মত মনে করিতেন এবং বলিতেন, "তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে পাপ হয়। ধনীর ঘরের দ্বারবানের ন্যায় এক ঘণ্টার আলস্য অসতর্কতায় মনটা উদ্বিগ্ন, ম্লান হওয়া চাই।" আনন্দমোহন বসু মহাশয় জীবনকে এইরূপেই দেখিতেন। তুমি কি তাহা পারিবে ?

প্রত্যূষে না উঠিলে ইঁহারা কর্মের শৃঙ্খলা পাইতেন না। জগতের সকল

কর্মবীর এবং যাঁহারা আপনার চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা বড় হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যুষে উঠিতেন। আলস্য তাঁহাদের দৃঢ় চরিত্র-বলের নিকট তিষ্ঠিতে পারিত না। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন, ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট, সার্ ওয়াল্টার স্কট্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শ্রীমন্তপুরুষগণ সকলেই প্রত্যুষে উঠিতেন এবং সকলেই প্রাতরুত্থানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা জগতে দুর্লভ। কেবল আলস্য নহে, কেবল প্রলোভন নহে, কেবল বিলাসিতা নহে, কেবল স্বার্থ, দ্বেষ অহঙ্কারাদি নহে—এরূপ সহস্র অদৃশ্য শত্রু তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেই সাহসী হয় নাই! শ্রীমন্তপুরুষের বীরত্বের এই প্রতাপ, অতুলনীয় ! তুমি এই মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন পরিচালিত করিতে পারিবে ? কিন্তু তোমার সে উদ্যোগ, সে কষ্টসহিষ্ণুতা, সে ত্যাগস্বীকার কই ? আলস্য দস্যু যখন তোমার প্রতিবন্ধক হয়, বিবেক বা কর্তব্যবুদ্ধি হয় ত তোমায় বলিতে থাকে—"তুমি না পুরুষ ? তুমি না বীর বলিয়া পরিচিত হইবার অভিলাষী? —আলস্য মহাশত্রুকে দমন করিয়া শয্যা হইতে এখনি উঠিয়া পড়।" তখন তুমি সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া পার্শ্বপরিবর্তন কর এবং এক মুহূর্তে উঠিয়া পড়িবে এই সংকল্প করিতে থাক। সেই এক মুহূর্তকাল সময় পাইয়াই আলস্য স্বীয় প্রবল অস্ত্র প্রয়োগে তোমায় অভিভূত করত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তোমারই মুখ দিয়া বলাইয়া লয়—"আজ আর একটু গড়াইয়া লই, কাল নিশ্চয় উঠিব।" এই ত তোমার বীরত্ব ! একজন খ্যাতনামা কর্মবীর বলিতেন, "যেই আমার মনে হইত শয্যাত্যাগের এই উপযুক্ত সময়, অমনি আমি শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া গৃহতলে দাঁড়াইতাম। আলস্য ভয়ে পলায়ন করিত।"

তোমার কত স্থানে যাইতে নিষেধ, কত কার্য করা অবধি, তুমি নিজেই সে সকল গর্হিত বলিয়া স্বীকার করিতেছ, কিন্তু প্রবৃত্তি তোমায় সেই দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে ! তোমার সাধ্য কি তুমি সেই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির হস্ত এড়াইয়া বিবেক-সম্মত পথে যাও ? তোমার সকল সাহস, সকল শক্তি এখানে হার মানিয়া যায়।—এই ত তোমার বীরত্ব ! তুমিই না ব্যবসায়ী

হইবে? বাণিজ্য করিয়া লক্ষ্মীবন্ত হইবার না তোমার সাধ ? কিন্তু তুমি কি তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ? অমানুষিক পরিশ্রম এবং অমিতবলশালী পুরুষকে সচরাচর লোকে অসুরের সহিত তুলনা দিয়া বলিয়া থাকে, — "লোকটা অসুরের মত খাটিতে পারে"; "অমুক অসুরের বল ধারণ করে;" কিন্তু লক্ষ্মীলাভ করিতে হইলে আসুরিক বলে কার্যসিদ্ধি হয় না। যখন তোমাতে দেবতার গুণ আশ্রয় করিবে, তখনই তুমি জয়যুক্ত হইবে। দেবাসুর উভয়েই যখন মহোদধি মন্থন করেন, তখন স্বর্গ মর্ত্য পাতালের মহার্ঘ রত্নাদিসহ মহালক্ষ্মীও উঠিয়াছিলেন, কিন্তু একমাত্র দেবগণই লক্ষ্মীলাভে সমর্থ হন।

"লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে" ইহা একটি প্রবচন। পাশ্চাত্য জাতিসকল এক্ষণে বিজ্ঞান-বলে সমুদ্র-মন্থন করিয়া দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করিতেছেন এবং যে সকল গুণের বলে লক্ষ্মীলাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, সেই সকল গুণলাভ করিবার জন্য তুমি কি আয়োজন করিতেছ ? বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যাহারা শ্রীমন্ত হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া দেখ—তাঁহাদের বিশেষত্ব কোথায়? তাঁহারা যে উচ্চাভিলাষী, অধ্যবসায়ী ও উদ্যমশীল, সত্যনিষ্ঠ, সময়নিষ্ঠ, মিতাচারী ও মিতাহারী, এবং অনলসকর্মী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ ? তাঁহাদের সাহস ও শক্তির সম্মুখে কি বহিঃশত্রু, কি অন্তঃশত্রু কেহই তিষ্ঠিতে পারে নাই। তাঁহারা স্বীয় সংকল্পে দৃঢ় থাকিয়া এবং উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আলস্য, লোভ, বিলাসিতা প্রভৃতি অন্তঃশত্রু এবং প্রতিযোগিতা, বাধাবিঘ্ন প্রভৃতি বহিঃশত্রুর সহিত নির্ভীকভাবে প্রকৃত বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহাদিগকে দমন করিতে পারে নাই। এই সংগ্রামে কত কপর্দক-শূন্য-লক্ষপতি, কত সমাজের নিম্নতম ব্যক্তি—সমাজপতি, দেশের কত নগণ্য বালক—দেশপতি এবং কত "দিনমজুর"—ধনকুবের হইয়া গিয়াছেন।এককথায় ঋদ্ধি সেই সকল উচ্চাভিলাষীদিগেরই করতলগত হয়, যাঁহারা তজ্জন্য একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করেন এবং পূর্বোক্ত গুণাবলী অর্জন করিয়া আপনাদিগকে তাহার উপযুক্ত করিয়া লয়েন। তোমরাও আর কালহরণ না করিয়া অল্প বয়স হইতেই ঋদ্ধিলাভ করিবার

জন্য যত্নশীল হও।

একটা আরম্ভ কর

শুভকার্য শীঘ্র করাই বিধেয়। অনেকে "কাল করিব", "দুদিন পরে করিব" বলিয়া, অনেক কার্য ফেলিয়া রাখে এবং প্রায়ই দেখা যায়, সে কাজ আর হয় না। অনেকে এরূপও বলেন—"শুভকার্য করিতে হইবে, একটা দিনক্ষণ দেখিয়া করাই ভাল।" এই দিনক্ষণ দেখিতে দেখিতে কাজ আর আরম্ভ করা ঘটিয়া উঠে না। অনেকের বিশ্বাস, "যার ভাল হয় তার গোড়া থেকেই হয়"। এই বিশ্বাসবশে তাঁহারা মনে করেন—"আরম্ভেই যদি বিফলতার মুখ দেখিতে হয়, তাহা হইলে, ভবিষ্যতেও কখন কৃতকার্যতার মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে না"; এবং মুখেও বলেন—"কখন যদি ভাল করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারি, তবেই তাহাতে ব্রতী হইব।" কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, জীবনের সকল অবস্থায় এবং সংসারের সকল কর্মেই উত্থান ও পতন অবশ্যম্ভাবী এবং অধিকাংশ স্থলে বিফলতাই শিক্ষার সোপান এবং কৃতকার্যতার মূল। শিশুর পুনঃপুন পতনই তাহাকে দৌড়িতে সমর্থ করে। মহামতি গ্লাডষ্টোন্ পার্লামেন্ট মহাসভায় প্রথম বক্তৃতা এমনই করিয়াছিলেন যে, কেহই তাহা শুনিতে বা ভাল বুঝিতে পারে নাই। তাঁহাকে দ্বিতীয়বার সেই বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সকলে ইঁহার সিদ্ধি বা সফলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন কিন্তু ইনি কালে

জগদ্বিখ্যাত বক্তা বলিয়া সমাদৃত হন। কার্লাইলের ন্যায় মহাপণ্ডিতেরও প্রথম রচনা একপ্রকার অনাদৃতই হইয়াছিল।

যখন দেখিবে, যাহা তোমাকে করিতে হইবে তাহার উদ্দেশ্য শুভ, তখনই তাঁহার সূত্রপাত করিবে। আরম্ভ করিয়া দাও, দেখিবে, কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন তোমার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। একটি বালক প্রত্যহ প্রাতে জলখাবারের জন্য এক পয়সা করিয়া পাইত। একদিন তাহার দুই পয়সার খাবার খাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু এক পয়সার অধিক কোন দিনই সে পাইত না। বালকের লোভও বড় অল্প ছিল না। সে প্রত্যহ প্রতিজ্ঞা করিত, কাল না খাইয়া পরশ্ব দুই পয়সার খাবার এককালে খাইবে। কিন্তু লোভ তাহার এতই প্রবল ছিল যে, প্রতিদিন সে আহারের পর প্রতিজ্ঞা করিত পরদিনের পয়সা রাখিয়া দিবে, কিন্তু ঠিক আহারের সময় আর লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। একদিন অতিকষ্টে লোভ সংবরণ করিয়া প্রাতঃকালে জলযোগ করিল না। তৎপরদিন তাহার হাতে দু পয়সা হইল। কিন্তু জলখাবার না খাওয়ায় তাহার বিশেষ কষ্ট হইল না—একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সঞ্চয়ের আনন্দে তাহা ঢাকা পড়িল। সে আরও কয়েকদিনের পয়সা জমা করিল; ক্রমে তাহার সঞ্চয়ের এমনই ঝোঁক পড়িল যে, এক এক পয়সা করিয়া দুই বৎসরে ১২ টাকা জমা করিয়া ফেলিল ! তখন তাহার বয়স ১০ বৎসর; কিন্তু সঞ্চয়শীলতার সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়িতা তাহাকে অল্প বয়স হইতেই আশ্রয় করিল। ক্রমে এই মিতব্যয়ী বালক যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহার হস্তে একশত টাকা হইয়াছিল। সেই যুবক উত্তরকালে লক্ষপতি মহাজন হইয়াছিলেন; এবং তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "সঞ্চয় এবং মিতব্যয় করিতে যদি আরও অল্প বয়সে আরম্ভ করিতাম তাহা হইলে আরও উন্নতি করিতে পারিতাম।" যেরূপেই হউক আরম্ভ করা চাই। প্রত্যেক কার্যের আসল অংশই তাহার আরম্ভ। যদি আরম্ভই না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন কার্য অগ্রসর হইতে পারে না। কত ভাল কাজ আরম্ভ না করায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোন একটা সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিবার যুক্তিতেই এত কালবিলম্ব হইয়া যায় যে, অবশেষে তাহা অসম্ভব বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। একটা আরম্ভ করিয়া দাও দেখিবে, কাজের ভার অর্ধেক লঘু

হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ খুব জমকাল না হইলে নৈরাশ্যের কারণ নাই। বরং সামান্যভাবে আরম্ভ করাই বিধি। লোকে কথায় বলে "বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া" — অর্থাৎ বহু আড়ম্বরের সহিত যে কাজ আরম্ভ করা যায় তাহার ফল অতি সামান্যই হইয়া থাকে। মইখানা খুব উঁচু হইতে পারে কিন্তু, তাহার প্রথম সোপান সর্বনিম্নে একথা যেন মনে থাকে। যে বটবৃক্ষ শাখাপ্রশাখায় বহুবিস্তীর্ণ হইয়া শত শত শ্রান্ত পথিককে ছায়া দানে শীতল করে, তাহারও উৎপত্তি অতি ক্ষুদ্র একটি বীজ হইতেই হইয়া থাকে। বিশাল বিটপীর অঙ্কুর দেখিয়া কি কেহ নিরাশ হইবে ?

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, "আমাদের খাইতেই কুলায় না আমরা বাঁচাইব কি!" "আর যদি বা কোনমতে বাঁচাইতে পারি তাহাতে আর কি হইবে ? মাসে যদি দুই এক টাকা বাঁচে, তাহাকে কি আর বাঁচান বলে ? ঐ সামান্য অর্থ বাঁচাইবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, ঐ অর্থে যদি সেই কষ্টের লাঘব হয়, বা সেই অসুবিধা দূর হয়, সে কি অধিক শ্রেয়স্কর নহে ?" না উহা কোন ক্রমেই উচিত নহে। মাসে যদি যৎসামান্যই বাঁচে, তাহাতে ক্ষতি কি ? প্রতিদিন যে এক আনা বাঁচায়, মাসে তাহার দুই টাকা জমা হয় ; বৎসরে সে চব্বিশ টাকার অধিকারী হয়। ইহা ত অনেক বেশী হইল। প্রত্যহ এক পয়সা সঞ্চয় করিলে ষোল বৎসরে একশত টাকা হয় ! একপয়সার শক্তি বড় কম নহে। এই একশত টাকা পুঁজি করিয়া কত মহাজন লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এক টাকাই হউক আর এক পয়সাই হউক, একটা কিছু লইয়া আরম্ভ করা চাই এবং যেমন করিয়াই হউক— কষ্ট স্বীকার করিয়াই হউক আর অসুবিধা ভোগ করিয়াই হউক—সঞ্চয়ের একটা সূত্রপাত করিতেই হইবে। এজন্য কাহার অসমসাহসিকতা, অনন্যসাধারণ প্রতিভা বা অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না ; কেবল একটু স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকা চাই, এবং আমোদ প্রমোদ বিলাস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করা ও লোভ সংবরণ করা চাই। ইহাতে অবশ্য প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু, ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য যদি কিছুকাল কষ্টই স্বীকার করিতে হয়, তাহা শতগুণে শ্রেয়ঃ। কষ্টসহিষ্ণু না হইলে কেহ মিতব্যয়ী হইতে পারে না। শ্রম না করিলে উপার্জনও হয় না।

কষ্টসহিষ্ণু না হইলে পরিশ্রমীও হয় না সুতরাং কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা এবং মিতব্যয়িতা, উপার্জন ও সঞ্চয়ের মূল। সঞ্চিত ধন—অসময়ের সম্বল, উপায়হীনের ভরসা, আর্তের সান্ত্বনা! এহেন অমৃত লাভ করিবার জন্য এই মুহূর্ত হইতে উদ্যোগ কর, এইক্ষণ হইতেই আরম্ভ করিয়া দাও। ইহা শুদ্ধ শক্তি নহে, শুদ্ধ গুণ নহে, ইহাই ধর্ম।

সামান্য সামান্য বিষয়

তোমবা "চরিত্রগঠন" পুস্তকে পাঠ করিয়াছ যে, সামান্য সামান্য বিষয় অবহেলার যোগ্য নহে। সামান্য সামান্য বিষয়ই মানবের চরিত্রগঠনের উপাদান। একখানি ইষ্টক সাধারণের চক্ষে সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে তাহার মূল্য অনেক। ঐ সামান্য ইষ্টকের এক একখানিতেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা, রাজার প্রাসাদ নির্মিত হয়। এক একজনের সামান্য সামান্য দোষ আশ্রয় করিয়া জগতের কতশত জাতি উৎসন্ন গিয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সামান্য সামান্য গুণ একত্র হইয়া জাতি বিশেষকে সমুন্নত করিয়াছে। স্বভাবের ইহাই নিয়ম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহার সমষ্টি তাহা এতই ক্ষুদ্র যে আমাদের চর্মচক্ষের অগোচর! আমাদের জীবনটাই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমষ্টি মাত্র! জাতীয় ইতিহাস বহুজীবনের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে সকল মহাজন, চরিত্রবলে ধন্য এবং অদ্ভুতকর্মা বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা হঠাৎ একদিন কোন অলৌকিক

ক্রিয়ার দ্বারা জগৎকে বিস্মিত করেন নাই। তাঁহাদের দৈনিক জীবনের মধ্যেই সংঘটিত সামান্য একটি দয়ার কার্য, সামান্য একটি ন্যায়ের কার্য, সামান্য একটি সত্য পালন, সামান্য একটু স্বার্থত্যাগ, সামান্য সামান্য কর্তব্যপালন এবং সাধারণে যাহাকে নিতান্ত সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করিয়া থাকে অথবা পালন করিতে বিমুখ হয়,—এমন সকল সামান্য সামান্য কার্য, প্রাণমন সমর্পণ করিয়া এবং ধর্মভাবে ও সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াই তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন।

নিত্য যাহার অনুষ্ঠান করা যায়, লোকে তাহাতেই অভ্যস্ত হয় ; প্রথম যাহা চেষ্টাপূর্বক এমন কি কষ্ট করিয়াও অভ্যাস করিতে হয়, কিছুদিন পরে তাহাই সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক হইয়া আইসে। একথার সত্যতা তোমরা অনায়াসেই পরীক্ষা করিতে পার। তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের কোন একটি অংশ একদিন ত্রিশবার আবৃত্তি কর, দেখিবে হয়ত তাহা কণ্ঠস্থ হইল না, কিন্তু যাহা একদিন ত্রিশবার আবৃত্তি করিয়াও কণ্ঠস্থ করিতে পারিলে না, তাহা প্রতিদিন একবার মাত্র আবৃত্তি করিয়া ত্রিশ দিন পরে দেখিবে তোমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। অভ্যাসের এমনই শক্তি ! এই শক্তি সামান্য সামান্য সৎকার্যে নিয়োগ করিতে পারিলে, তুমিও জগৎকে চমকিত করিতে পার। মনে কর, তুমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, "প্রত্যহই ত নানা কারণে এবং বিনাকারণেও কত মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি, আজ যতক্ষণ জাগিয়া থাকিব একটিও মিথ্যা কথা মুখ দিয়া বাহির হইতে দিব না।" প্রতিজ্ঞা করিলে অতি সহজে, কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল ততই তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করা কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। তুমি মহাবীরের মত তোমার স্বভাবের সহিত, তোমার প্রবৃত্তির সহিত, যুঝিতে লাগিলে। তোমার পূর্বের অভ্যাস যেই তোমার মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির করিতে যায়, অমনি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে হয়, আর তুমি দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। হয়ত কোন ঘটনার উল্লেখ করিতে করিতে অভ্যাসবশে ভাবিতেছ এই স্থান নানা মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া যাইবে, তোমারও বেশ আমোদ বোধ হইবে, কিন্তু হঠাৎ লোভ সম্বরণ করিয়া তথায় থামিয়া গেলে; তোমার মনে হইল "লোকের মনোরঞ্জন

হউক আর নাই হউক, আজ মিথ্যা কখনই বলিব না"। এইরূপে প্রতিবারেই তোমার পূর্বের অভ্যাসকে পরাস্ত করিয়া বীরের ন্যায় সত্য পালন করিলে। অতঃপর যদি আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখ, শতচেষ্টা করিয়াও প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পার নাই, তথাপি, ইহা নিশ্চয় যে, অন্যদিন যথায় দশটা মিথ্যা বলিতে, তথায় তুমি দুই কিম্বা তিনটি মাত্র বলিয়াছ! পরদিনের চেষ্টায় তুমি তিনটির স্থানে দুইটি এবং তৎপরদিনের চেষ্টায় একটি মাত্র বলিতে পার। কিন্তু যদি দিবসের শেষে দেখিতে পাও সেদিন একটিও মিথ্যাবচন তোমার মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই, তাহা হইলে, বিজয়ী সেনাপতি যুদ্ধাবসানে যেমন জয়োল্লাসে বিভোর হয়, তদ্রূপ তোমারও হৃদয় আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমি কিছু শক্তিও সঞ্চয় করিবে। প্রতিদিন যদি তুমি এই ঘোরতর যুদ্ধে জয়লাভ করিতে থাক তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই দেখিবে, সত্যকথা বলাই তোমার স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতিদিনের সেই সামান্য শক্তি পুঞ্জীকৃত হইয়া তোমায় মহাশক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে; তখন তোমার শক্তির সম্মুখে হীনশক্তি স্বতঃই মস্তক অবনত করিবে; বালক হইলেও তোমার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া বৃদ্ধেরাও তোমায় ভক্তিশ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস করিবে; যাহাতে তুমি হস্তক্ষেপ করিবে তাহাতেই তুমি জয়যুক্ত হইবে!

ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না। গরলের ক্ষুদ্র এক বিন্দুমাত্র রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, সমস্ত শরীর জর্জরিত করিয়া মৃত্যু সংঘটন করিতে পারে। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা , দংশনের দ্বারা, মহাবল হস্তীকেও উত্যক্ত, ব্যাথিত করিতে পারে। ক্ষুদ্রের ক্ষমতা জান না! ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহযানগুলি শত শত মণ দ্রব্যসম্ভার এবং অসংখ্য নরনারী লইয়া অবলীলাক্রমে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতেছে, উহা কি ইঞ্জিনের ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রমধ্যস্থ বাষ্পশক্তির কাজ নহে ? তোমরা অনেকেই মুহূর্তের কোন সংবাদই রাখ না, মনে কর কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, এমন সময় তাহার নিকট হঠাৎ তারযোগে সংবাদ আসিল তাহার জননী মুমূর্ষুপ্রায়, তাহাকে অবিলম্বে গৃহে যাইতে হইবে! রেলযোগে তাহার গৃহ তথা হইতে কয়েক ঘণ্টার পথ মাত্র। সে তৎক্ষণাৎ ছুটি লইয়া বাসায় ফিরিল এবং "টাইমটেবলে" দেখিল

দশমিনিট পরেই গাড়ি ছাড়িবে। সে কালবিলম্ব না করিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। বাসা হইতে ষ্টেশন প্রায় দশমিনিটের পথ। ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিতে হইবে, ইতিমধ্যে যদি গাড়ি ছাড়িয়া দেয়? সেদিন আর গাড়ি নাই! এদিকে সন্তানবৎসলা জননী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া জন্মের শোধ একবার পুত্রের মুখ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া আছেন; যেন তাহারই প্রতীক্ষায় এখনও তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে না। পুত্র কল্পনার চক্ষে এই হৃদয়বিদারক অবস্থা দর্শন করিতেছে, জননীর স্নেহ, তাঁহার যত্ন, তাঁহার আদর, স্মরণ করিতেছে আর ব্যাকুলচিত্তে উন্মত্তের ন্যায় ষ্টেশনের দিকে ছুটিতেছে; টিকিট করিতে করিতেই ঘণ্টারবের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজিয়া উঠিল—আর এক মুহূর্তের অপেক্ষা! তাহার পরই গাড়ি অদৃশ্য হইয়া যাইবে! ভাব দেখি সেই মুহূর্ত? মনে কর দেখি, সময়ের সেই ক্ষুদ্রাংশটুকু এখন কত মূল্যবান্!

সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবার কিছু নাই। সামান্য একটি মুখের কথা — "আহা" বলিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিলে যদি একজন শোকার্তের সান্ত্বনা হয়, তথায় একটি ক্ষুদ্রতম কাঠোর বাক্যে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। যখন তোমার অধরপ্রান্তের সামান্য একটু হাসির রেখা দেখিয়া ছোট বোনটি আহ্লাদে আটখানা হইয়া যায়, আবার সামান্য একটু ভ্রূকুটিতেই চারিদিক আঁধার দেখিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া ফেলে; তখন সেই সামান্য হাসিটুকুর কত শক্তি তাহা কি আর বুঝাইতে হয়? এইরূপে দেখিতে পাইবে জগতের যাবতীয় সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল সামান্য সামান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

এই যে শুনা যায়, "অমুকের বেশ 'গোছাল' সংসার", "অমুক বেশ গুছাইয়া সংসার করিতে জানে", "অমুক বেশ পাকা গৃহস্থ বা গৃহিণী" —এ সকলের অর্থ কি?—এসকল কথায় আমরা এই বুঝি যে, সেই সকল গৃহে দৈনন্দিন কার্যগুলি নিতান্ত সামান্য হইলেও যথাসময়ে ও প্রয়োজনমত শক্তি, মন ও উপায় দ্বারা নির্বাহিত হয়; সে গৃহে যাহার যাহা কর্তব্য সে নির্বিবাদে তাহা যথাশক্তি করিয়া যায়; যে দ্রব্য যথায় রাখা চাই তাহা সেইস্থানেই থাকে; যখন যাহা করিতে হইবে, তখনই তাহা সম্পাদিত হয়;

তথায় যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা, সে তাহার অনুষ্ঠান কর। বুঝিতে হইবে, সে সংসারে অযথা ব্যয় না হইয়া আয়ের অনুযায়ী ব্যয় হইয়া, ভবিষ্যতের অভাব পূরণের জন্য সঞ্চয় হয়। সে গৃহে সামান্য বিষয় বলিয়া, তুচ্ছকর্ম বলিয়া, উপেক্ষা করিবার কিছুই নাই। তথায় সামান্য এক মুষ্টি চাউলেরও অপচয় হয় না, ছিন্ন বস্ত্রের একটুকরাও ফেলা যায় না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অমনোযোগ বশতঃ অথবা সামান্য ত্রুটির জন্য অনেক বড় বড় ব্যবসাদার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। আবার সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কড়া ক্রান্তির হিসাবেরও প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনেক দরিদ্র ফেরিওয়ালা ক্রোরপতি বণিক হইয়া গিয়াছেন! স্থান কাল পাত্র বিশেষে প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়েরই মূল্য আছে। যদি ঋদ্ধিমন্ত হইতে চাও তাহা হইলে ক্ষুদ্র বা সামান্য বলিয়া কিছু উপেক্ষা করিও না।

ক্ষুদ্রের শক্তি

জগতের মহাপরিবর্তনসকল প্রায় সমস্তই ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। এই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তোমরা কি মনে কর উহারা হঠাৎ একদিনের ভূমিকম্পের ফল? কত অযুত কোটি প্রবালকীটের দেহাবশেষ কত শতাব্দী, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া পুঞ্জীকৃত হইতে হইতে তবে এক একটি প্রবালদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকৃতির নিকট আমরা অহরহঃ এই শিক্ষা পাই যে, ধৈর্য,

সকল মহৎ অনুষ্ঠানের মূলে অবস্থিতি করিতেছে। প্রকৃতি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হইতে বিরাট্‌কে গড়িয়া তুলে। যে সত্য জগতের পরিবর্তন সম্বন্ধে খাটে, সেই সত্য আমাদের সংসার ক্ষেত্রেও খাটে। আমরা দেখিতে পাই, নিত্য এবং নিয়মিত চেষ্টা, সামান্য হইলেও, তদ্দ্বারা অধিক কার্য সম্পাদিত হয়। অনিয়মিত ও খামখেয়ালী চেষ্টা অসাধারণ হইলেও তাহাতে ততদূর ফল দর্শে না, কিন্তু স্বল্প চেষ্টা, বহুদিনব্যাপী এবং নিয়মিত হইলে, তাহার শক্তি বিস্ময়কর হয়।

পাঁচ মিনিট অতি অল্প সময়; দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়; কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিট প্রতিদিন নষ্ট করিলে, বৎসরে এক দিন ছয় ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট নষ্ট হয়। দশ বৎসরে দ্বাদশ দিনেরও অধিক অর্থাৎ প্রায় মাসার্ধকাল নষ্ট হয়। একজন যদি কুড়ি বৎসর বয়সে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ষাট বৎসর জীবিত থাকে এবং প্রতিদিন ঐ পাঁচ মিনিট করিয়া নষ্ট করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসরের কর্মজীবনে পঞ্চাশ দিন ষোল ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট অর্থাৎ প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া ক্রমাগত তিন বৎসর চারি মাস হেলায় হারাইয়াছে! ঐ দীর্ঘকালের মধ্যে সে একটি দুরূহ ভাষা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা কোন অর্থকরী বিদ্যালাভ করিতে পারিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের জীবনে প্রত্যহ কত পাঁচ মিনিট যে নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই! যুবকগণ সাবধান! জীবনের কত স্বর্ণ সুযোগ মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে। মুহূর্তগুলিকে উপেক্ষা করিও না সুযোগ আপনিই ধরা দিবে।

মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করিয়া কত কর্মবীর কত মহাগ্রন্থ লিখিয়া চিরবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

এক পয়সার শক্তি

ভারতবর্ষে প্রায় ৩০ কোটী লোকের বাস। এই ত্রিশ কোটী লোক যদি সপ্তাহে এক পয়সা করিয়া রাখে, তাহা হইলে, বৎসরে ১৪৪০,০০,০০,০০০ এক হাজার চারি শত চল্লিশ কোটী পয়সা বা ১,৫০,০০,০০০ গিনি (২২,৫০,০০,০০০ টাকা) একত্র হয়। ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলি পাশাপাশি রাখিলে, প্রায় ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রেলপথে ভোর ৭ টার গাড়িতে উঠিলে, অতটা পথ অতিক্রম করিতে,অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটা হইয়া যায়। কিন্তু যদি ঐ এক হাজার চারশত চল্লিশ কোটী পয়সা পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রজ্জুর আকারে সাজান হয়, তাহা হইলে আমাদের এই পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং ঠিক এতবড় আর আটটি পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়াও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ২,৩৮,০০০ মাইল, এবং চন্দ্রের পরিধি ৬৩০০ মাইল, সুতরাং ঐ রজ্জু পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াও সমস্ত চন্দ্রমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে পারে অথবা, যে হিমাচলের অত্যুচ্চ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫ মাইল ৮৬৬ গজ উচ্চ, সেইরূপ উচ্চ ২৭৫৮ টি হিমালয় পর্বত একটির উপর একটি করিয়া রাখিলে তবে তাহার সমতুল্য হয়! এমন মনে করিও না যে, রাজা, মহারাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ যাঁহারা, আইনকানুন, বিচারালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারা মনে করিলেই, তৎক্ষণাৎ জগতের হিতসাধন ও উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হন, আর তুমি তাহা পার না। হঠাৎ যাহা হয়, তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে; কিন্তু যাহা সময়ে, অতি ধীরে ধীরে হয়, তাহা সুদৃঢ় দেশমান্য এবং চিরপ্রচলিত থাকে। আমরা যদি আমাদের জীবন উন্নত এবং অবস্থাসম্পন্ন

করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে তাহার আয়োজন করিতে হইবে। তাহার জন্য কোন কোন অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন লোকের প্রয়োজন হইবে না। দেশপতিগণ এবং শাস্ত্রকারগণ কখন মানুষকে সাধু, সাহসী, প্রেমিক করিয়া দিতে পারেন না, এমন কি কাহাকেও সুখী করিবার সাধ্যও তাঁহাদের নাই; কিন্তু প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে নিজেও সুখী হইতে পারেন এবং দেশে সুখ শান্তি স্থাপন এবং উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারেন। ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং কার্য সামান্য হইলেও প্রত্যেকেই যদি স্বীয় কর্তব্য সাধন করেন, প্রত্যেকেই যদি সুচরিত্র, উদ্যমশীল, পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী এবং মিতব্যয়ী হইয়া ঋদ্ধিশালী হন, তাহা হইলে তিনি সমগ্রজাতি ও দেশের উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয় ব্যয়

যে দেশে দরিদ্রলোক অধিক, বুঝিতে হইবে, তথায় জ্ঞান সভ্যতা এবং পুরুষকারের অভাব আছে। কিন্তু, যদি দেখা যায়, কোন এক এক জাতির মধ্যে জ্ঞান সভ্যতা পুরুষকার যথেষ্ট আছে, অথচ তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না ; তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে তাহাদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভাব হইয়াছে। অনেকে বলেন, অপব্যয় করাই যাহার স্বভাব, তাহাকে কি উপদেশের দ্বারা মিতব্যয়ী করা যায়? স্বভাব পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তাহা অসাধ্য নহে। অমিতব্যয়ী ব্যক্তি সংসারক্ষেত্রে অভাবের মুখ দেখিতে দেখিতে এবং ঋণের দায়ে অশান্তিময় জীবন যাপন করিতে করিতে কতবারই প্রতিজ্ঞা করে "এইবার হইতে একটু বুঝিয়া খরচ করিব" ; কতবার ভাবে "একটু হিসাব করিয়া চলিব" ; কিন্তু কি যে তাহার প্রতি 'অলক্ষ্মীর দৃষ্টি', সে কোন মতেই স্বীয় দৈন্য ঘুচাইতে পারে না। কেন তাহার এই প্রতিজ্ঞা থাকে না? কেন সে কখনও ঋণমুক্ত হইতে পারে না? সে ত বেশ সুজন, সে ত বেশ শিক্ষিত, তাহার স্বাস্থ্যও ত বেশ ভাল, সে ত বেশ পরিশ্রম করে, তাহার বুদ্ধিও ত প্রখর, পুরুষকারও আছে, আর যে সকল গুণ থাকিলে লোকে উপার্জনক্ষম হয়, তাহার সে সকলই আছে ; এমন কি, সে বেশ "দুপয়সা" উপার্জনও করে ! তবে তাহার কিসের অভাব? যদি কেহ এই ব্যক্তির অভাব কোথায়, ত্রুটি কি, দেখিতে চাহেন, একবার মাসের প্রথমে কয়েকদিন তাহার গৃহদ্বারে গিয়া উপস্থিত হউন ; দেখিবেন, মুদি তাহার খাতা পত্র লইয়া পাওনা আদায় করিতে গিয়াছে, গোপ তাহার অনুসরণ করিয়াছে, মিষ্টান্নবিক্রেতা, মৎস্যবিক্রেতা, বস্ত্রবিক্রেতা এবং যাহারা তাহাকে সমস্ত মাস সংসারের যাবতীয় আবশ্যক বস্তু—কেহ

অন্ন, কেহ বস্ত্র, কেহ বিলাসদ্রব্য বিনামূল্যে যোগাইয়া ছিল, তাহারা এখন স্ব স্ব পাওনা আদায় করিতে আসিয়াছে। গৃহস্থ তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে করিতে উপার্জনের প্রায় সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত করিয়া উগ্রপ্রকৃতি ও 'জবরদস্ত' পাওনাদারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল এবং যাহাকে পারিল, পরমাসে তাহার ঋণশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় দিল। এদিকে কোন কুসীদব্যবসায়ী আসিয়া গৃহস্থের হৃৎপিণ্ড চমকিত করিয়া দ্বারে আঘাত করিল—গৃহ তখন প্রায় রিক্তহস্ত ! কুসীদব্যবসায়ীকে অধমর্ণ কোন মতে রিক্ত হস্তে ফিরাইতে পারিলেও, গৃহস্থ কিছুদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইতে পারেন ; কিন্তু উত্তমর্ণের রক্তআঁখি, ক্রোধপূর্ণ মুখমণ্ডল, তাহার তর্জন গর্জন ও অভিসম্পাতবাণী স্মরণ করিয়া যাতনাক্লিষ্ট রোগীর ন্যায় দিন যাপন করিয়া থাকেন। যদি একটু কৌতুহলী হইয়া রোগের মূল অন্বেষণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার গৃহস্থালীর সংবাদ লউন। দেখিবেন গৃহস্থ উপার্জনশীল, কিন্তু হিসাবী নহেন ; গৃহিণী রমণীর যাবতীয় গুণে গুণান্বিতা, কিন্তু "গোছাল" বা পাকা গৃহিণী নহেন। দেখিবেন, সে মাসে সংসারে এমন অনেক দ্রব্য ক্রীত হইয়াছে, মানসিক সন্তোষ বা শারীরিক আরাম বা বিলাসবাসনা চরিতার্থ করা ব্যতীত যাহার অন্য প্রয়োজন ছিল না ! এমন কোন সামগ্রী আসিয়াছে যাহার উপস্থিত প্রয়োজন ছিল না, অথচ কেবল সস্তার অনুরোধেই ক্রীত! এমন আহারীয় এবং পরিধেয় আসিয়াছে, যাহা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু একটু বেশী ভাল একটু আরাম ও সুখদায়ক হইবে বলিয়াই অধিক মূল্যে ক্রীত হইয়াছে ! এইরূপে দেখা যাইবে যে সকল ব্যয় না করিলে চলিত, সেই সকল অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া যে পরিমাণ আয়. তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়াই গৃহস্থ ঋণগ্রস্ত, বিব্রত এবং সুখস্বচ্ছন্দে সংসারাযাত্রা নির্বাহ করিতে অসমর্থ। অমিতব্যয়িতাই রোগের নিদান ; মিতব্যয়িতার অভ্যাস ইহার মহৌষধ। মিতব্যয়ী হইতে কিছু ব্যয় হয় না বা অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। কেবল কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। কোন উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যেমন কতকগুলি ঔষধসেবন করিতে হয়, কতকগুলি নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, অপব্যয়ীর তদ্রূপ কতিপয় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এরূপ

নিয়মের সংখ্যা নির্দেশ করা অসম্ভব। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যাহা কিছু অনুকূল তাহা গ্রহণ করা ও যাহা যাহা প্রতিকূল তাহা বর্জন করাই সাধারণ নিয়ম। তন্মধ্যে এখানে সর্বোতভাবে ও প্রায় সকল অবস্থাতেই অনতিক্রমণীয় কতিপয় নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে ;–

বিধি

আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প করিবে

আয় অপেক্ষা অল্প ব্যয় করাই প্রথম বিধি। যাহারা আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করেন, তাহারা যে ঋণগ্রস্ত, পরমুখাপেক্ষী ও দীনদশাপন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?–তাহাদের মধ্যে অনেকেই হীনচরিত্র, নিস্তেজ এবং স্বল্পায়ু হইয়া থাকে। অনেক ধনকুবের জমিদার সন্তানের কথা আমরা জানি, যাঁহারা পূর্বপুরুষের অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও, অমিতব্যয়িতার জন্য কপর্দকশূন্য, ঋণগ্রস্ত, উন্মাদ এবং আত্মঘাতী হইয়াছে ! প্রায় দেখা যায়, অনেক জমিদারসন্তান আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করায়, আপনার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এবং গবর্ণমেন্ট 'কোর্ট অব ওয়ার্ডের' হস্তে তাঁহার বিষয়-আশয়ের পরিচালন কার্য ও ব্যয় সঙ্কোচাদির ভার প্রদান করেন। ধনীর যখন এই অবস্থা, তখন গৃহস্থের ত কথাই নাই !

সংসারের খরচ পত্রের হিসাব স্বহস্তে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য এবং প্রত্যহই দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব রাখা কর্তব্য। কারণ তদ্বারা স্বীয় অবস্থা অনেকটা স্বীয় আয়ত্ত থাকে এবং কোথায় অপব্যয় রহিত করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। সঞ্চয় দ্বারা ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার ইহা একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

নিষেধ

"যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিও না

'যত্র আয় তত্র ব্যয়' বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, আয়ের সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলা। যাহারা এরূপ করে, তাহারা উপস্থিত ঋণগ্রস্ত না হইলেও সঞ্চয় করিতে পারে না এবং হঠাৎ কোন প্রয়োজন হইলে ঋণজালে জড়িত হয়। সেই ঋণ পরিশোধ করিতে সারাটি জীবন দুঃখে কাটে। সুতরাং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাহস, অপরাধীনতা, পরোপকার ও পরদুঃখ মোচনের জন্য আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প করা কর্তব্য। যে সঞ্চয় করিতে পারে সেই, সময়ে, অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় এবং অসময়ে উদ্ধার লাভ করে। কত বাঁচাইতে হইবে তৎসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। আয়ের ষোড়শাংশ হইতে অর্ধেক পর্যন্ত সঞ্চয় করিবার পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা কঠিন, কারণ, অবস্থানুসারে তাহার ব্যবস্থা; এবং একথা নিশ্চয় যে অতিরিক্ত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত সঞ্চয় বরং ভাল কারণ, স্মাইলস্ সাহেব বলেন, দ্বিতীয় ত্রুটি সহজে সংশোধন করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রথম ত্রুটি সংশোধন করা দুরূহ!

ঋণ করিও না

যতদূর সম্ভব নগদ দাম দিয়া দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবে, কারণ, যাহা ধারে লইবে তাহারই জন্য অধিক দাম দিতে হইবে এবং অনেকে সময় প্রবঞ্চিত হইবে। যে ঋণ করে সে আর সহজে মাথা তুলিতে পারে না; সে দিবসে দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে। অনেকে অনিশ্চিত লাভ বা আয়ের আশায় ঋণ করিয়া বসে; তাহারা প্রথমে দেখে না যে, যদি কোন অনিবার্য কারণবশতঃ উক্ত লাভ বা আয় না হয়, তাহা হইলে সেই ঋণ,

সিন্দ্‌বাদের বৃদ্ধের মত তাহাদের স্কন্ধে এমন চাপিয়া বসিবে যে, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

অপচয় করিও না—অভাব হইবে না

অপচয় নানাপ্রকারে হইতে পারে, কিন্তু দুই প্রকারের অপচয়ের প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, গৃহে যাহা আসিয়াছে তাহার মধ্যে কোন দ্রব্য নষ্ট না হয় এবং যে বস্তুর কোন প্রয়োজন নহে, তাহা কোন কারণেই গৃহে না আইসে। এ সম্বন্ধে সংযম অভ্যাস করিতে হয়। "অমুক দ্রব্য আমার বড়ই পছন্দ হইয়াছে", "অমুক দ্রব্য না হইলে চলিতেই পারে না", "এটা না হইলে আর মান থাকে না", "ওটা না থাকিলে আর লোকের কাছে মুখ দেখান যায় না, সুতরাং সঙ্গতি থাক আর নাই থাক, তাহা ক্রয় করিতেই হইবে"—এরূপ কথা অনেকের মুখে শুনা যায়। এ সমস্তই অমিতব্যয়ী, অপচয়ীদিগের কথা। ইঁহারা স্বীয় অবস্থার সহিত বাসনার সামঞ্জস্য রাখিতে জানেন না এবং বাসনা অচিরে চরিতার্থ না হইলে অধীর হইয়া পড়েন। ইহাদিগকে সংযমী ও ধৈর্যশীল হইতে হইবে।

সঞ্চয়

"কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং।
কর্তব্যো নাতি সঞ্চয়ঃ।।"

মানুষ যদি সারাটি জীবন পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, তাহার ভোগাবিলাষ, অপব্যয় এবং অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে বড় কিছু বলিবার ছিল না এবং যত আয় তত ব্যয় তাহার পতনের কারণ হইত না ; দৈনিক উপার্জন তাহার দৈনিক অভাব দূর করিতে পারিত। কিন্তু আজীবন কেহ শ্রম করিতে পারে না। যৌবনের শক্তি প্রৌঢ়ে থাকে না ; প্রৌঢ়াবস্থার শক্তি বার্ধক্যে থাকে না। সুতরাং বাল্যে যেমন মানুষ জীবিকার্জনে অক্ষম থাকে, বার্ধক্যেও সেইরূপ অসমর্থ হইয়া পড়ে। অনেকে রোগ, শোক প্রভৃতি দ্বারা অল্প বয়সেই ভগ্নস্বাস্থ্য এবং অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন তাহাদিগের পূর্বের শক্তি, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি আর তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। তখন হয় অন্যের শক্তি ও শ্রমের উপর, না হয় পূর্ব অর্জিত, যৌবনের শ্রমলব্ধ সঞ্চিত ধনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষ যদি বনের পশুর মত জীবন যাপন করিতে পারিত, বন্য ফলমূল এবং অন্যান্য প্রাণীর মাংসাহারে তাহার উদরপূর্তি হইত, তাহা হইলে সঞ্চয়ের বড় প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। অভাব, আকাঙ্ক্ষা, আশা, বিশ্বাস, বাসনা প্রভৃতিই মানুষকে চিরগতিশীল এবং অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ক্রমোন্নতিই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। বন্য অসভ্য অবস্থায়, মানুষ নগ্ন পশুর মত জীবনযাপন করিত, শিকারলব্ধ আহার্য দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, ভবিষ্যতের জন্য তাহার কোন চিন্তাই ছিল না;

কিন্তু ক্রমে যখন দেখিল নিত্য শিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কোন কোন দিন উপবাসও করিতে হয়, তখন এক দিনের আহারীয় হইতে পরদিনের সংস্থানের জন্য কিছু কিছু বাঁচাইয়া রাখিতে শিখিল। পরে যখন ক্রমাগত পশুবধ করিতে করিতে বন্য পশুর সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল. তখন মধ্যে মধ্যে ক্রমাগত কয়েক দিবস উপবাস করিতে হয় দেখিয়া, জীবন ধারণের নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিল। তখন শস্য এবং তাহার বীজ সংগ্রহ, বীজবপন, ক্ষেত্রকর্ষণ, কৃষিকর্মোপযোগী যন্ত্রাদিনির্মাণ ইত্যাদিতে বুদ্ধিচালনা করিতে লাগিল। ক্রমে শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুর প্রভাব হইতে দেহরক্ষা, সিংহ ব্যাঘ্র সর্পাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য অশন, বসন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির প্রয়োজন হইল। কিন্তু যখন দেখিল একই ব্যক্তির দ্বারা আহারীয়সংগ্রহ, রন্ধন, বন্টন, রক্ষণ. ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, পশুপালন, গোদোহন, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ, উপকরণসংগ্রহ, যন্ত্রাদিনির্মাণ প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা অসম্ভব, অথচ সকলগুলি না করিতে পারিলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না, তখন মানুষের স্বার্থত্যাগের ভাব জাগ্রত হইল। প্রত্যেকেই তখন কিছু কিছু সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে কার্যনির্বাহ করিতে লাগিল ; কেহ লৌহ সংগ্রহ করিল, কেহ তাহাকে পোড়াইয়া পিটিয়া শাবল ও কুদাল তৈয়ার করিল, কেহ তদ্দারা ভূমি খনন করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল ; কেহ বীজবপন, শস্য কর্তন ও সংগ্রহ করিল ; কেহ তাহা একজনের নিকট হইতে অন্য বস্তুর বিনিময়ে গ্রহণ করিল এবং স্থানান্তরে গিয়া, যাহাদের অভাব ছিল তাহাদিগকে স্বীয় প্রয়োজনমত দ্রব্যের বিনিময়ে প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধনের উৎপত্তি হইল ; অসভ্য বন্যজীবন অতিক্রম করিয়া মানুষ শিষ্ট সভ্য এবং প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইল। এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়াছে তবে এক্ষণে মানুষ নীতি, ধর্ম, সমাজ দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া সভ্যতার সমুন্নত ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজিকার সহিত তাহার আদিম বাল্যজীবনের তুলনাই হয় না ! ইহার মূল কি ? একমাত্র স্বার্থত্যাগ এবং স্বার্থত্যাগজনিত সঞ্চয় ! অদ্যকার সমগ্র আহারীয় হইতে বঞ্চিত না হইলে

সঞ্চয় করা যায় না, সুতরাং কল্যকার জন্য যদি সঞ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে, অদ্য একটু ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। আজ যদি দশ টাকা আমার হাতে আইসে এবং সেই দশ টাকাই খরচ করিলে রসনার পরিতৃপ্তি ফলমূল মিষ্টান্ন ও পলান্ন ভোজন, শকটারোহণে গমনাগমন, সুগন্ধি তৈলব্যবহার অথবা পাঁচজন বন্ধু লইয়া আমোদপ্রমোদের সুখলাভ করা যায়, অথচ, কল্যকার উপার্জনের কোন নিশ্চয়তা না থাকে, তাহা হইলে আমার কর্তব্য অদ্যই স্থির করা চাই। কল্য আমার উপার্জন হউক আর নাই হউক, আমায় আহার করিতেই হইবে। সুতরাং হয় আমার আহারীয় সামগ্রীর কিয়দংশ অথবা ঐ দশ টাকার মধ্য হইতে কয়েকটি টাকা, বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। অর্থাৎ অদ্যকার সম্পূর্ণ সুখ হইতে আমায় কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমার অত উত্তম আহার করিলে চলিবে না, শকটের পরিবর্তে পদব্রজে অথবা অল্পব্যয়সাধ্য যানে গমনাগমন করিতে হইবে এবং আমোদ প্রমোদের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এতটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলে আমি ঐ দশ টাকা হইতে ৩-৪ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব। ইহা একটি ধ্রুব সত্য। এই সত্য যেমন একদিনের পক্ষে খাটে, ইহা ঠিক তেমনিই সমস্ত জীবনের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য, অসময়ের জন্য এবং ব্যাধিবার্ধক্যজনিত উপার্জনাক্ষম হইয়াও জীবনধারণ করিবার জন্য বর্তমানের উপার্জন হইতে ব্যক্তি মাত্রেরই সঞ্চয় করা কর্তব্য। আপনার জন্য যতটুকু স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক আপনার অবর্তমানে স্ত্রীপুত্রপরিবার প্রভৃতি প্রিয়জনের যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় তাহার সংস্থানার্থ অধিক স্বার্থত্যাগ করিয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিকরা কর্তব্য।

চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে লোকে সঞ্চয়শীল হইতে শিক্ষা করে। অসভ্যগণ সর্বাপেক্ষা অসঞ্চয়ী; কারণ কল্যকার ভাবনা বা ভবিষ্যচ্চিন্তা তাহাদের নাই। আদিমকালে লোকে কিছুই সঞ্চয় করিত না। আদিম অসভ্যগণ কৃষিকার্যের কিছুই জানিত না; পরে তাহারা সভ্যতার আলোক পাইতে পাইতে সঞ্চয়শীল হয়। সভ্যতা বহুযুগের সঞ্চয়ের পরিণতি মাত্র। সঞ্চয় ব্যতীত উন্নতি হয় না। অতএব যুবকগণ! তোমরা যদি এই বয়স

হইতে স্ব স্ব দৈনিক জীবনে সামান্য সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে, কখনও অভাবের মুখ দেখিতে পাইবে না; যৌবনে চিন্তাক্লিষ্ট ও বার্ধক্যদশাগ্রস্ত হইবে না; বরং, সারাটি জীবন সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইবে। পরের সুখের জন্য আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা কর, আপনা হইতেই সঞ্চয়শীল হইবে। কারণ সঞ্চয়ের মূলে স্বার্থত্যাগ। যাঁহারা সঞ্চয়ী এখনও হয়েন নাই তাঁহারা সামান্য কিছু সঞ্চয় করিলেই অভ্যস্ত হইবেন এবং এককালে কিছু অর্থ জমা হইলে ক্রমেই সঞ্চয়ের দিকে ধাবিত হইবেন। প্রথমে নিজ অভাবগুলি মোচন করিয়া, যেরূপ সঙ্গতি এবং সামাজিক অবস্থা তদনুরূপ ক্রিয়াকর্ম সমাপন করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করাই বুদ্ধিমানের কার্য ও ধর্ম, কিন্তু আপনাকে এবং পরিবারবর্গকে কষ্ট দিয়া অতিসঞ্চয় করা অকর্তব্য এবং অধর্ম।

বর্তমানকালে অর্থের অপব্যয়ের জন্যই সমাজ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অর্থের অভাবে নহে। অর্থ উপার্জন করা বরং সহজ, কিন্তু উহা সঞ্চয় করা সহজ নহে। সুতরাং অর্থসঞ্চয়ের উপায় জানা কর্তব্য। একজন যাহা উপার্জন করেন তাহাই তাঁহার ধনের পরিমাণ নহে; কিন্তু তাঁহার ব্যয় ও সঞ্চয়ের উপর তাঁহার ধনবত্তা নির্ভর করে। আপনার ও পরিবারের অভাবমোচন করায় যে অর্থের প্রয়োজন, তদপেক্ষা যিনি অধিক উপার্জন করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন, তিনি নিঃসন্দেহ সমাজের উন্নতির হেতুস্বরূপ হন। সঞ্চয় যৎসামান্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাই তাঁহাকে স্বাধীনচিত্ত ও আত্মনির্ভরশীল করিবার পক্ষে যথেষ্ট। জিনিসপত্র পূর্বাপেক্ষা অধিক দুর্মূল্য হইয়াছে সত্য, এবং সেই পরিমাণে আয়বৃদ্ধিও হয় নাই সত্য, কিন্তু যদি বর্তমান আয়ের মধ্য হইতে কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করা হয় তাহা হইলে, ন্যায্য ব্যয় নির্বাহ করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। অন্যথা বুঝিতে হইবে, অবশ্যই এমন কোন কারণ আছে যাহার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে। অনুসন্ধানে জানা যাইতে পারে যে, বিলাসিতা বা আরামপ্রিয়তা, শৃঙ্খলার অভাব বা অসাবধানতা, সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ প্রিয়তা বা এইরূপ কোন প্রলোভন বা ত্রুটিই তাহার কারণ। এই সকল ব্যক্তির সংখ্যাধিক্যে সমাজ শক্তিহীন ও দরিদ্র

হইয়া পড়ে। প্রাচুর্য ও আরাম প্রত্যেকেরই আয়ত্ত হইতে পারে, কেবল, তাহা অর্জন এবং সম্ভোগ করিতে জানা চাই। যিনি তাহা জানেন, তিনি শুদ্ধ আপনারই উন্নতি নহে, সমাজেরও উন্নতিসাধন করেন। সুতরাং প্রত্যেকেরই শ্রমশীল, সঞ্চয়ী এবং উন্নতিশীল হওয়া কর্তব্য।

অপচয় ও মিতব্যয়

"অপচয় করিও না -অভাব হইবে না।" প্রবচন।

"কি সংসারে কি সাম্রাজ্যে মিতত্বই ধনের শ্রেষ্ঠ উৎপাদক।" --সিসিরো।

"পিতামহ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান, পিতা সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন, পুত্র সর্বস্ব ক্ষয় করিয়া চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে।"
স্কটল্যাণ্ডীয় প্রবচন।

"যে জন দিবসে, মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার না দেখিবে আর
নিশীথে প্রদীপ-ভাতি।।

-সদ্ভাবশতক।

পরিমিত ব্যয়ের বিপরীত অপচয়। যে মিতব্যয় করে না সে নিশ্চয় অপচয় করিয়া থাকে। অপচয় রহিত হইলে মিতব্যয় আপনা হইতেই হয়। প্রয়োজন অপেক্ষা ন্যুন বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইতে না দেওয়ায় মিতব্যয় করা হয়। অল্পাহারে শরীর দুর্বল এবং অধিক আহারে রুগ্ন হয়, সুতরাং যে পরিমাণ আহার করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহাকে মিতাহার বলে। মিতভাষী বৃথা বাক্যব্যয় করে না এবং অন্যের বিরক্তিকর মৌনাবলম্বনও করে না। জীবনের সকল কার্যকলাপে যে মিতাচারী হইতে পারে, সেই, জীবনের সকল অবস্থাতেই সুখী হয়। সংসারে মিতব্যয়ের অভাব হইলেই দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্ভাবনার উদয় হয়।

প্রকৃতির রাজ্যে অপচয় বলিয়া কিছু নাই। সকলেই বলেন, অপচয় করা অন্যায়, কিন্তু অনেকে অপচয় এবং বদান্যতার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান না। সাধারণতঃ যিনি একটু সাবধানতার সহিত পরিমিত খরচ করেন, তাঁহাকেই অল্পাধিক ব্যয়কুণ্ঠ হইতেই হয়। তিনি হঠাৎ কোন বিষয়ে ব্যয় না করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া, উপযোগিতা এবং প্রয়োজন বুঝিয়া তবে খরচ করেন বলিয়া, লোকে চলিত কথায় তাঁহাকে কৃপণ বা অর্থপূজক বলিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অপচয় বলিতে, জগদীশ্বর যাহা আমাদিগকে বিবেচনার সহিত যথাযথ ব্যবহার করিবার জন্য দিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত কর্মে না লাগান, কিংবা তাহা ব্যবহার করিতে অবহেলা করা অথবা নির্বোধের মত তাহার অযথা ব্যবহার করা বুঝায়। অপর পক্ষে, যাঁহারা তাঁহার দানের মর্যাদা না বুঝিয়া তাহা সাবধানে এবং ধর্মভাবে ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহারাই অধিকাংশস্থলে দেবতার দান অকাতরে বিতরণ করিয়া বদান্য বলিয়া নাম লইয়া থাকেন; অথচ তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে এই প্রশংসালাভের উপযুক্ত নহেন। আমরা যে কত দিকে কত প্রকারে অপচয় করি তাহার ইয়ত্তা নাই। গত জীবনের যদি সকল অপচয়গুলি রাশীকৃত করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমাদের অবশিষ্ট জীবন অনুতাপদগ্ধ এবং অবসাদপূর্ণ হয় মাত্র। বাল্যের শিক্ষাবস্থা হইতে প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত আমরা দেবতার দান বৃথা ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়া যখন বার্ধক্যে উপনীত হই তখনই আমাদের

ধনবিবেকের উদয় হয় এবং আমরা কেবল আক্ষেপ করিয়া থাকি। জীবনটা যাহাতে এরূপ অনুতাপময় না হয়, শৈশব হইতেই তাহার আয়োজন করা কর্তব্য। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয় শিক্ষাও অবশ্য কর্তব্য। মিতব্যয়িতা একটি অভ্যাস মাত্র। যেমন অন্যান্য অভ্যাস ধীরে ধীরে লাভ করা যায়, মিতব্যয়িতাও অভ্যাস দ্বারা শিখিতে হয়। মিতব্যয় সম্বন্ধে উপদেশশ্রবণ, পুস্তকপাঠ, আলোচনা এবং প্রমাণসংগ্রহ করিলেই মিতব্যয়ী হওয়া যায় না। ইহা "হাতে কলমে" শিক্ষা করিতে হয় এবং বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করিতে হয়। ছাত্রজীবনে নানা প্রলোভন উপস্থিত হয়, যাহার বশে কত বালক সামান্য কারণে এবং বিনা কারণেও সামান্য সামান্য খরচপত্র করে। তাহারা দুই এক পয়সার ব্যয়, গণনার মধ্যেই আনে না ; কিন্তু তাহারা যদি সেই এক পয়সা দুই পয়সাই একত্র করে, তাহা হইলে দেখিতে পায়, ছয় সাত বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪০/৪৫ টাকার উপর খরচ করিয়া ফেলিয়াছে! ইহাতে তাহাদের ঐ ৫০ টাকা ব্যয়ও হয় অথচ তাহারা অমিতব্যয়ী হইতে অভ্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি তাহারা প্রতিদিনের বৃথা ও অনাবশ্যক বিষয়ে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহা হইলে ছয় সাত বৎসরের অভ্যাসে মিতবায়ী হইত অথচ তরুণ বয়সেই ৪০/৫০ টাকার অধিকারী হইত। তাহারা অল্প বয়সে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা অসময়ে এবং নিতান্ত টানাটানির সময় পিতামাতাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং তজ্জনিত প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিত। যে বালক প্রথম হইতে এইরূপে সঞ্চয়শীল হইতে শিক্ষা করে এবং পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনের নিকট উত্তরোত্তর উৎসাহলাভ করে, সে নিশ্চয়ই উত্তরকালে সহিষ্ণু, আত্মসংযমী বা লোভ সংবরণক্ষম, দূরদর্শী এবং ধনশালী হয়। ছাত্রাবস্থায় অপব্যয় অনেক হয়;—জলছবি, লজেঞ্জ, লেমনেড, বরফ এবং নানা প্রকার অস্বাস্থ্যকর অথচ মুখরোচক খাদ্য, নয়নের তৃপ্তিকর অথচ ক্ষণভঙ্গুর খেলনা ইত্যাদির কত দ্রব্যের প্রতি শৈশবে মন ও নয়ন আকৃষ্ট হয় এবং তৎপ্রতি কত অপব্যয় হইয়া থাকে। এই যে অনেকে ক্ষণকালের জন্য রেলভ্রমণ করিবার কালে সোডা. লেমনেড, চা প্রভৃতির জন্য কতই না খরচ করিয়া ফেলেন, যদি তাঁহারা একটু ধৈর্য ধারণ করেন, এমন কি, যে সকল

দ্রব্য রেলভ্রমণকালে ক্রয় করেন সেই গুলিই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তথাকার বাজার হইতে ক্রয় করেন, তাহা হইলে অনেকটা অপব্যয় রহিত হইতে পারে।

অপচয় নানা প্রকারে হইয়া থাকে। যে বস্তুর প্রয়োজন নাই তাহার জন্য ব্যয় করিলে অপচয় করা হয়; যাহা আবশ্যক বলিয়া ক্রীত হয় তাহা বা তাহার কোন অংশ নষ্ট হইতে দিলেও অপচয় করা হয়। উপস্থিত কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু সামান্য মূল্যে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া যাহা ক্রয় করিয়া গৃহে রাখা হয়, তাহাও অপচয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এমন কি, যে দ্রব্যের নিতান্তই প্রয়োজন, তাহা সামান্য চেষ্টায় যে দরে পাওয়া যাইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক দরে ক্রয় করিলেও অপব্যয় করা হয়। এই রূপ অপচয় বা অপব্যয় দরিদ্রের গৃহে এবং গৃহস্থের সংসারে প্রায়ই হইয়া থাকে। দিনমজুরদের প্রায় দেখা যায়, তাহারা পুঁজি অভাবে অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। এক জনের প্রত্যহ একসের চাউলের আবশ্যক। একসের চাউলের জন্য সেই ব্যক্তিকে হয়ত প্রত্যহ অন্তত ২ আনা ব্যয় করিতে হয়। কোন আড়ত হইতে লইলে এক মণের কম পাওয়া যায় না অথচ মণ প্রতি ৪ টাকা ১২ আনা পড়ে, কিন্তু এককালে ৪ টাকা ১২ আনা সে ব্যয় করিতে অসমর্থ সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে ছোট দোকান হইতে খুচরা লইতে হয়। এইরূপে তাহাকে প্রত্যেক দ্রব্যের জন্যই কিছু না কিছু অধিক মূল্য দিতে হয়। এইরূপে প্রতিবৎসরে তাহার দশটাকা অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। সে দিনমজুরি করিয়া প্রত্যহ নগদ কিছু না কিছু উপার্জন করে। সে যদি প্রত্যহ ১ আনাও পায়, তবে ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই পয়সাও বাঁচাইতে পারে এবং প্রতিদিনের এই দুই পয়সা বৎসরে তাহাকে ১১ টাকা ৬ আনার অধিকারী করে। তখন হইতে যদি সে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আড়ত হইতে আবশ্যকদ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া দশ টাকার অপব্যয় রহিত করিতে পারে। অপব্যয় রহিত করিলে আয়ের পথ ও সঞ্চয়ের পথ মুক্ত করা হয়। সুতরাং দিনমজুরও ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিতে পারে। অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের অবস্থাও কি এই দিনমজুরের মত নহে? দিনমজুরগণ যত আয় তত ব্যয় করিয়া আজীবন দিনমজুরই থাকিয়া যায়।

গৃহস্থও এইরূপ করিয়াই চিরদরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী এবং ঋণগ্রস্ত হয়। এইরূপ ব্যয়কে মিতব্যয়ও বলে না; ইহা প্রকারান্তরে অপব্যয়। যাঁহারা 'যত্র আয় তত্র ব্যয়' নীতি অনুসরণ করিয়া সর্বদাই রিক্তহস্তে থাকেন, তাঁহারা দারিদ্র্য-রাক্ষসের কবলের সম্মুখে অহরহঃ অবস্থান করেন। তাঁহাদিগকে দুর্বল, অসমর্থ এবং সময় ও অবস্থার দাস হইতেই হয়। তাঁহারা আত্মসম্মান হারান এবং পরের মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারেন না। স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। পুরুষোচিত গুণ ও ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইবার পক্ষে একমাত্র অমিতব্যয়িতাই যথেষ্ট। তাঁহারা দরিদ্র হয়েন না, তাঁহারা আপনাদিগকে দরিদ্র করিয়া রাখেন। তোমার কি সাধ তুমি দরিদ্র হইয়া থাকিবে? তুমি কি চাও, তুমি পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে? তুমি সর্বদাই সকলের নিকট 'হাত পাতিবে' এবং 'মাথা হেঁট' করিয়াই থাকিবে? তুমি কি সংসারে পরের গলগ্রহ ও সদাসঙ্কুচিত থাকিতে চাও, না স্বাধীনচিত্ত ও সচ্ছল হইতে চাও? -উভয়ই তোমার ইচ্ছাধীন এবং তোমারই ক্ষমতাধীন। ইহা নিশ্চয় জানিও যে মিতব্যয়ী না হইলে কেহ তোমাকে বিশ্বাসই করিবে না। কারণ যে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে অসদুপায় ব্যতীত তাহার চলিতেই পারে না।

ঋণ

"অপ্রবাসী এবং অঋণী শাকান্ন ভোজন করিলেও সংসার মধ্যে সুখী।"
—মহাভারত।

এই দারিদ্র্যপ্রপীড়িত দেশে ঋণ কাহাকে বলে বুঝাইতে হইবে না এবং ঋণ করিলে জীবন কিরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে তাহাও অনেকের জানা আছে। যাঁহাদের আয় নিতান্ত অল্প, এরূপ ব্যক্তি গণ যথাসম্ভব মিতব্যয় করিলেও মধ্যে মধ্যে ঋণ করিতে ব্যধ্য হন। দেশাচারের দায়ে, লোকলজ্জার ভয়ে, এমন কি আত্মীয়বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট স্বীয় প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য এবং 'বাহ্‌বা' পাইবার লোভে অনেকে ঋণ করিয়া ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেকে আবার অনিশ্চিত আয়ের আশায় ঋণ করিয়া খরচ করেন। যাঁহারা এইরূপে ঋণজালে জড়িত হইয়া সারাটি জীবন দুঃখে অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের জন্যই অনেক ধর্মানুষ্ঠান, অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান, আজি জীবনের ভার, দায়, বা দণ্ড বলিয়াই উক্ত হইতেছে। আনন্দের অনুষ্ঠান এবং উৎসব, নিরানন্দের এবং দুর্ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই কন্যার বিবাহ কন্যাদায়, পিতামাতার শ্রাদ্ধ পিতৃদায় ও মাতৃদায় বলিয়া উক্ত হইতেছে। অমিতব্যয়, অসঞ্চয়, অপরিণামদর্শিতা এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, যশোমান ও প্রশংসা আশু লাভ করিবার তীব্র বাসনা বা অসহিষ্ণুতা সমাজের অযথা-শাসন, শাস্ত্রের কঠোর বন্ধন এবং লোকলজ্জার ভয় অর্থাৎ হৃদয়ের দুর্বলতা, ঋণের জনক। যে ঋণ দান করে তাহাকে উত্তমর্ণ এবং যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে অধমর্ণ বলে। অধমর্ণ তাহার উপযুক্ত সংজ্ঞা, কারণ ঋণদাতার নিকট তাহাকে "মাথা

হেঁট” করিয়াই থাকিতে হয় এবং তাহার অনুগৃহীতের ন্যায় অবস্থান করিতে হয়। অর্থ প্রত্যর্পিত হইলেও উত্তমর্ণ অধমর্ণকে ঋণের বাঁধন দিয়া চিরবদ্ধ করিয়া রাখে। এই কারণেই বিশেষ উপকৃতজন সম্যক্‌রূপে স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য উপকারককে বলিয়া থাকে, “আপনার নিকট চিরঋণী রহিলাম”। অব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ঋণের যখন এইরূপ বন্ধন, কুসীদব্যবসায়ী মহাজন—ঋণদান করা এবং সুদ আদায় করাই যাহাদের জীবিকা—তাহাদের বন্ধন, অধমর্ণের প্রতি তাহাদের আচরণ কিরূপ কঠিন তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। শোণিত শোষক বাদুড়ের ন্যায় তাহারা ললাটে বা বক্ষে বসিয়া একদিকে পাখার ব্যজন করিতে থাকে এবং অপরদিকে হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিতশোষণ করিয়া দুর্বল এবং রুগ্ন করিয়া ছাড়ে।

একজন উদ্যমশীল যুবক মুরুব্বীর অভাবে স্বচেষ্টায় কোন সরকারী দপ্তরে ১৫ টাকা বেতনের চাকরী গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ইতিপূর্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়া ছিল। সংসারের এই লৌহশৃঙ্খলই বোধ হয় উচ্চাভিলাষী এবং উদ্যমশীল যুবককে আত্মোন্নতির সুযোগ না দিয়া অচিরেই সামান্য বেতনের চাকরী গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। যাহা হউক যুবকের কর্মক্ষমতা এবং শ্রমশীলতা দেখিয়া দপ্তরের কর্তা প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার বেতন ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা করিয়া দেন এবং পরবর্তী চারি বৎসরের মধ্যে আরও ৫ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ২৫ টাকা করেন। সঞ্চয়শীল, মিতব্যয়ী যুবক প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে ১৪৪ টাকা এবং পরবর্তী চার বৎসরে ২৪০ টাকা সুতরাং দশবৎসরে ৩৮৪ টাকা সঞ্চয় করিলেন। এমন সময় তাঁহার প্রথম সন্তান কন্যা কমলার বিবাহ উপস্থিত। বিবাহের ব্যয় যাহাতে অল্প হয় তিনি বহু চেষ্টায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথম কন্যার বিবাহ, সুতরাং যাহাতে বিলক্ষণ খরচপত্র করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করা যায়, অনেকেই তাহার পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু রমেশবাবু সুবুদ্ধি বশতঃ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তথাপি তাঁহাকে সঞ্চিত ৩৮৪টাকার উপর দুই শত টাকা মহাজনের নিকট হইতে ধার করিতে হইল। বিবাহের সকল ব্যয় করিয়া প্রায় এক শত টাকা তাঁহার বাজার দেনা হইল। এত খরচ করিলেন ‘মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া’ যে টাকা উপার্জন এবং অতি কষ্টে সঞ্চয়

করিয়াছিলেন সে সমুদয় জলের মত ব্যয় করিলেন, তথাপি কমলার শাশুড়ী এবং ননদেরা 'কনের' গহনার নিন্দা করিতে ছাড়িলেন না। তাঁহারা "ফুলশয্যার" জিনিসপত্র দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। নূতন বৈবাহিক, জামাতার পিতা মাতা এবং কোন কোন আত্মীয়ার "বাক্যবাণ" হইতেও অব্যাহতি পাইলেন না! সে যাহা হউক, প্রথমে বাজার দেনা পরিশোধ করিতে তিনি তিন মাস মহাজনকে কিছুই দিতে পারিলেন না। তাঁহার ঋণ চক্রবৃদ্ধিসুদের হিসাবে ২২৩ টাকা ১ আনায় পরিণত হইল। চতুর্থ মাসে অতি কষ্টে তিনি এক মাসের সুদ ৬ টাকা ১আনা দিয়া ২১৭ টাকা মোট দেনা রাখিয়া দিলেন। পঞ্চম মাসে কমলার শ্বশুরবাড়ি পূজার 'তত্ত্ব' পাঠাইতে হইবে, সুতরাং রমেশবাবু ভাবিয়া আকুল হইলেন। পূজার এই প্রথম তত্ত্ব। অতিকষ্টে বেচারি জনৈক প্রতিবেশীর নিকট অল্প সুদে ৫০ টাকা ধার করিয়া তত্ত্ব করিলেন। ৫০ টাকা খরচ করিলেন বটে, কিন্তু কুটুম্ববাড়ি তাঁহার নিন্দা হইল! মাস দুই তিনের মধ্যে মহাজনের সুদ বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার ঋণ ২৩৮ টাকা ৭ আনা হইল। ক্রমে ঋণ বৃদ্ধি হইতে চলিল দেখিয়া রমেশবাবু সংসারের ব্যয় হ্রাস করিয়া দেনা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার দুই কন্যা এবং এক পুত্র সন্তান। তাহাদের প্রতিও যে ব্যয় হইতেছিল তাহাও কিছু কিছু হ্রাস করিলেন। এইরূপে সামান্য অশন ও সামান্য বসনে সংসার চালাইয়া পুষ্টিকর আহারাভাবে এবং দুর্ভাবনাবশতঃ দেনার কিয়দংশ পরিশোধ করিতে না করিতেই তিনি রোগশয্যায় শয়ন করিলেন। ছেলেদের অসুখ মধ্যে মধ্যে হইতেছিল কিন্তু তাহাতে খরচের মাত্রা বড় বেশী বৃদ্ধি হইতেছিল না; এক্ষণে রমেশবাবু রুগ্ন হওয়ায় অর্থ জলের মত ব্যয় হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি প্রথম এক মাস পূর্ণবেতন পাইয়াছিলেন, তাহার পর হইতেই অর্ধেক বেতন পাইতে লাগিলেন। ক্রমাগত চার পাঁচ মাস রোগভোগ করিয়া তিনি পুনরায় কর্ম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অন্যত্র তাঁহার ঋণ হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইল এবং তিনি বিশেষ বিবেচনার সহিত খরচপত্র করিয়া প্রায় সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন কিন্তু ইহা দুই এক বৎসরে হয় নাই। ক্রমাগত নয় দশ বৎসর সাবধানে চলায় ও সকল বিলাসবাসনা

পরিত্যাগ করায় তবে পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই নয় দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আরও দুই তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের খরচ বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। এখন তাঁহার মাসিক বেতন ৭৫ টাকা মাত্র। এই আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষার ব্যয় এবং পোশাকপরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, অসুখ ভিষক্ ও পর্ব উৎসবের খরচও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং দেনা শোধ করিবার পর বড় কিছু সঞ্চয়ও করিতে পারেন নাই। এমন সময় কন্যাদায় উপস্থিত। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ অল্প খরচে "সারিয়া" ছিলেন এবার আদরিণীকে পাশকরা বরের হাতে দিতে হইবে, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেরই মুখে এই কথা। গৃহস্থের যে কি অবস্থা, তাঁহার আর্থিক সঙ্গতি কিরূপ তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ দেখিতেছেন না। বাহিরের লোক তাঁহার এত বৎসরের উপার্জন এবং সমাজে তাঁহার মানসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহার পক্ষে কিরূপ ব্যয় করিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয়, তাহাই দেখিতেছে এবং তাঁহাদের তৃপ্তির জন্যই গৃহস্থকে 'ধরিয়া' বসিয়াছেন। গৃহস্থ বেচারি কতক ভাবী আয়বৃদ্ধির ভরসায়, কতক লোকলজ্জায়, কতকটা কন্যার প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ এবং কতক আত্মপ্রসাদের জন্য, ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ একটু জাঁকজমকের সহিত দিলেন। পাত্রও ভাল পাইলেন। কিন্তু এবার যে তাঁহার ঋণ হইল তাহা সিন্দ্‌বাদের বৃদ্ধের মত তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। বহু কষ্টে এই ঋণ পরিশোধ করিতে না করিতে তাঁহার মাতৃদায় উপস্থিত! তিনি সেই যে মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন জীবনে আর তাঁহাকে উঠিতে হইল না। কুলপুরোহিত, পণ্ডিতগণ, আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার পদোচিত মাতৃশ্রাদ্ধ করার বিধি দিলেন। কত শাস্ত্র কত তন্ত্র কত বিধি নিষেধ তাঁহাকে শুনান হইল, কেহ কেহ দানসাগরের ব্যবস্থা দিলেন, কেহ তাঁহার বংশগৌরব, তাঁহার উদার হৃদয় এবং দানশীলতার প্রশংসা করিয়া গেলেন, কিন্তু হায়! একটিও প্রাণীও তাঁহার অর্থবল, সঙ্গতি এবং পারিবারিক মঙ্গলামঙ্গলের কথা মুখে আনিলেন না; তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলেন না; পরামর্শদাতা যদি কয়েক সহস্র মুদ্রা তাঁহার হস্তে রাখিয়া তাহার পর দানসাগর করিবার

ব্যবস্থা দিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত বন্ধুর কার্য করিতেন, পরামর্শে গুরুস্থানীয় হইতেন এবং সহৃদয়তা পরোপকার প্রভৃতি দুর্লভগুণে দেবতার ন্যায় পূজার্হ হইতেন; কিন্তু এ জগতে ইহা আকাশকুসুম মাত্র। যাহা হউক মাতৃদায়গ্রস্ত, দুর্ভাবনা ও ঋণভার পীড়িত গৃহস্থ কতক অনিচ্ছায় কতক সমাজের ভয়ে, কতক বা মাতৃভক্তিবশে এবং শ্রদ্ধাস্পদের পরলোকগত আত্মার শান্তির ও তৃপ্তির আশায় ঋণের বোঝা ভারি করিয়া বসিলেন। এদিকে দুই এক বৎসর পরে তাঁহার পেন্সন হইয়া গেল। আয় অর্ধেক হওয়ায় এবং নিত্যশ্রম ও কর্মশীল ব্যক্তি অবসর প্রাপ্ত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য ও চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। শীঘ্রই তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হইয়া আসিল; প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহাতে বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অচিরে তিনি ঋণের বোঝা সংসারে প্রবেশানুখ পুত্রের মস্তকে দিয়া এবং অসহায় রোরুদ্যমান পরিবারবর্গকে বিপদসাগরের মধ্যে ফেলিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

যাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে জানেন না, কিম্বা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার সাহসবল যাঁহাদের নাই তাঁহাদের কখনও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সমাজে থাকিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সকলেই ইচ্ছা করেন; কিন্তু কি করিলে প্রকৃতই সম্ভ্রম রক্ষিত হয় তাহা সকলে জানেন না। এই যে পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে, পুত্রকন্যার বিবাহে এবং ব্রতপর্বোপলক্ষে কত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লক্ষপতি ধনীর মত মুক্তহস্তে খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হন, কিছুদিন অবশ্য তাঁহার যশে, মানে, সুনামে পল্লী মুখরিত হউয়া উঠে, বৃদ্ধদিগের আশীর্বাদে ও ভিক্ষুকের জয়ধ্বনিতে তাঁহার বক্ষঃ স্ফীত হয় এবং সময়ের বন্ধুও অনেক জুটিয়া থাকে, কিন্তু রিক্তহস্তে কেহ অধিকদিন স্বীয় সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারেন না। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, অপব্যয়ী শতচেষ্টা দ্বারাও আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। যিনি একদিন মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া মানসম্ভ্রমে সমুন্নত, আত্মীয়পরিজনে, বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত ও চাটুকারদিগের তোষামোদ স্ফীত ছিলেন, তিনিই আজি রিক্তহস্ত হইয়া যখন সর্বজনপরিত্যক্ত, অর্থাভাবে অনাহারক্লিষ্ট, ঋণভারাক্রান্ত ও দীনদশাপন্ন হয়েন, যখন তিনি হৃদয়হীন পরশ্রীকাতর ব্যক্তিবর্গের বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার

পাত্র হয়েন, তখন তাঁহার জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপ অদূরদর্শী অমিতব্যয়ী ব্যক্তিগণ জীবনের ভারবহন করিতে করিতে হঠাৎ আত্মহত্যার ন্যায় কাপুরুষোচিত মহাপাপ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। জীবনের অনিশ্চি ত তাই দুঃসময়ের জন্য সংস্থান করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রলোভন। ইহা প্রত্যেকেরই যুগপৎ নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক কর্তব্য। সুসময়ে অবিবেচনার সহিত ব্যয় করিলে, দুঃসময়ে কাঁদিতে হয়। এ ক্ষেত্রে অর্থের ব্যবহার করা বলে না; ইহা প্রকৃতপক্ষে অপব্যবহার। অভিজাত এবং সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণের অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া কত মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত দরিদ্র স্বীয় সর্বনাশ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনুকরণ হেতু তাঁহারা জীবনে যে কখনও শ্রীমন্ত হইবেন তাহারও পথ স্বহস্তে রুদ্ধ করিযা দেন।

নগদ এবং ধারে ক্রয়

অপব্যয়ের যে সকল পন্থা উক্ত হইয়াছে তদ্ব্যতীত আর একপ্রকার অপব্যয়ের কথা বলা যাইতেছে। এই অপব্যয়—ধারে দ্রব্যাদি ক্রয় করা। এতদ্বারা যে অপব্যয়ই হয় তাহা নহে, ইহাতে মানসম্ভ্রমও নষ্ট হয়। যে রকম দোকান হউক না কেন এবং যে কোন দ্রব্য ক্রয় কর না, ধারে লইলেই, তজ্জন্য কিছু না কিছু অধিক মূল্য দণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে। এমন অনেক দোকানদার আছেন যাঁহারা বলিয়া দেন যে নগদ লইলে দুই পয়সা বা এক

আনা বাটা বাদ যায়, অর্থাৎ এক টাকা মূল্যের দ্রব্য নগদ লইলে পনের আনা বা সাড়ে পনের আনা মূল্যে বিক্রয় করা হয় আর ধারে লইলে এক টাকাই দিতে হয়। অন্যত্র ধারে লইলে নির্দিষ্ট মূল্যের কিছু অধিক দামও দিতে হয়। তথায় হয়ত এক টাকার স্থলে সাড়ে ষোল আনা বা সতের আনা মূল্য দিয়া আসিতে হয়। সুতরাং এক টাকা মূল্যের জন্যই ধারে লইলে দুই আনা অপব্যয় করিতে হয়। এইরূপ টাকা প্রতি দুই আনা অধিক দিতে হইলে দশ টাকার জিনিস কিনিতে এক টাকা চারি আনা দণ্ড দিয়া আসিতে হয়। যিনি একশত টাকার জিনিস ধারে লয়েন, দোকানদারকে তিনি একশত বার টাকা আট আনা দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে নগদ লইলে তিনি ৯৩ টাকা ১২ আনা মাত্র দিয়া ১০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য পাইতে পারেন। সুতরাং নগদ না লওয়ায় একশত টাকায় তাঁহাকে ১৮ টাকা ১২ আনা দণ্ড দিতে হয়। এই ১৮ টাকা ১২ আনা দুর্ভিক্ষের দিনেও দুইমণ চাউলের দাম; উহা অনেক কেরানীর মাসিক বেতন অপেক্ষাও অধিক; উহা ভৃত্যের প্রায় চারি মাসের মাহিনা! সংসারে অনেক গৃহস্থের এই রূপ কতশত টাকার সামগ্রী ক্রীত হইতেছে এবং গৃহস্থ ক্রমাগত এইরূপ দণ্ড দিয়া আসিতেছেন কে তাহার হিসাব রাখে? জীবনের সন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া তিনি যদি হিসাব করিয়া দেখেন সারাটি জীবনে তিনি যত দ্রব্য ধারে ক্রয় করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে চারি পাঁচ সহস্র টাকা অধিক দিতে হইয়াছে এই অপব্যয় না করিলে তিনি মৃত্যুকালে পরিবারের হস্তে ঐ চারি পাঁচ সহস্র টাকা ভবিষ্যতের সংস্থানস্বরূপ দিয়া যাইতে পারিতেন। অধিকন্তু দোকানদারগণ দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাস হইতে ধারে বিক্রীত দ্রব্যের উপর শতকরা বার্ষিক ১২ হইতে ২০ টাকা পর্যন্ত হিসাবে সুদ গণনা করিয়া ক্রেতার দেনা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

নগদমূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ, যেখানে উৎকৃষ্ট এবং সুবিধাজনক মূল্য দেখা যায় সেখানে, নগদ দাম দিয়া রীতিমত দরদস্তুর করিয়া লওয়া যাইতে পারে,—এ সম্বন্ধে খরিদদার ও দোকানদারের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। অথচ যিনি সর্বদা নগদমূল্য দেন, প্রত্যেক দোকানদারই তাঁহাকে সম্মান ও সমাদর করিয়া থাকেন। যিনি ধারে ক্রয় করেন, তিনি এরূপ দরদাম করিতে পারেন না, এবং যে কোন দোকান হইতে

দেখিয়া শুনিয়া অন্যের সহিত তুলনা করিয়া সুবিধাজনক মূল্যে ঈপ্সিত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন না। যে দোকানে তাঁহার হিসাব পত্র আছে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেই দোকানেই যাইতে হয়, যে দাম বলে তাহাই দিতে হয় এবং সেই দোকানে প্রাপ্তব্য সস্তায় পাওয়া যাইতেছে বলিয়া কোন দ্রব্য অন্য দোকান হইতে লইলে পুরাতন দোকানদার তাঁহাকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিয়া, বিলক্ষণ অপ্রস্তুত করিয়া, হয়ত পুনরায় তাঁহাতে ধারে বিক্রয় রহিত করেন এবং সেই সঙ্গে পুরাতন ঋণ অবিলম্বে পরিশোধের জন্য পীড়াপীড়িও করেন।

নগদ ক্রয় বিক্রয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় আপনাকে লাভবান্ মনে করিয়া থাকেন। ক্রেতার লাভ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে;বিক্রেতাও মূলধন যত অধিকবার খাটাইতে পারেন ততই তাঁহার লাভ অধিক হয়। এক টাকার দ্রব্য একবার বিক্রয় করিয়া যদি তিনি এক আনা উপার্জন করেন তাহা হইলে, ঐ টাকা ১৬ বারে এক টাকা উপার্জনের পথ করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে ঐ টাকার মাল ক্রেতাকে ধারে দেওয়ায় যে সময়ের মধ্যে তাহা ১৬ বার খাটিত সেইকালে একবার বা দুইবার খাটিতে পাইল। সুতরাং ঐ টাকা হইতে এক টাকার স্থলে মহাজনের দুই বা চারি আনা মাত্র উপার্জন হইল। এইরূপ হিসাব দ্বারা শত শত এবং লক্ষ লক্ষ টাকার ক্রয় বিক্রয়ের উপর মহাজন স্বীয় লাভ লোকসান গণনা করিয়া থাকেন। নগদ এবং ধারে ক্রয়কারী উভয়ে এক সময়ে কোন দোকানে পদার্পণ করুন, দেখিবেন, দোকানদার হাস্যমুখে প্রথমে নগদক্রেতাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার মনোমত দ্রব্য সামগ্রী দেখাইতে থাকিবেন, একপ্রকার দ্রব্যের স্থানে তাঁহাকে দশ প্রকার সামগ্রী দেখাইবেন, দরদাম করিতে বিরক্তি বোধ করিবেন না এবং যতক্ষণ তাঁহার ক্রয় করা না হইবে অথবা যতক্ষণ তিনি দোকানে থাকিবেন ততক্ষণ তাঁহারই প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তাঁহারই সহিত কথোপকথন করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে দ্বিতীয় ক্রেতার প্রশ্নের দশবারের পর একবার অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিবেন, তাহার কারণ যিনি ধারে জিনিস লইবেন, সুবিধামত তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা যাইতে পারে এবং ক্রেতাও একটু অপেক্ষা করিতে পারেন।

নগদক্রেতা স্বাধীন; তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি দোকানদারের নাই, তাঁহার সঙ্গতি ও সততা দোকানদার সন্দেহের চক্ষে দেখেন না, তিনি যাহাতে দোকানে পদার্পণ করেন তজ্জন্য দোকানদার নানা প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া থাকেন। অল্প লাভ রাখিয়া অন্য দোকান হইতে কিছু সস্তায় বিক্রয় করিয়া এবং অধিকতর সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহাকে বশ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ধারে ক্রয়কারীকে দোকানদার একপ্রকার 'চোখেচোখে' রাখিয়া থাকেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা, তাঁহার আয়, তাঁহার অপব্যয়, তাঁহার সঙ্গ এবং 'চাল চলন' প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, ও তদ্বিষয়ে ভিতরে ভিতরে সন্ধান রাখেন এবং পাছে তিনি ঋণ শোধ না কবিয়া স্থান ত্যাগ করেন, পাছে তাঁহার নিকট হইতে পাওনা আদায় না হয়, সেই সকল চিন্তা বিক্রেতার মনে উদয় হয়। অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অধিক লাভবান হইতে ইচ্ছা হইলে, অসদুপায়ে বা কৌশলদ্বারা ক্রেতার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতে হইলে, দোকানদার তাঁহারই উপর দিয়া পরীক্ষা করেন যিনি ধারে ক্রয় করিয়া তাঁহার নিকট ঋণী এবং বাধ্য হইয়া আছেন। কৌশল নগদ ক্রেতার সহিত অধিক দিন চলে না এবং তাহাতে তিনি "হাতছাড়া" হইয়া যান, কারণ নগদ ক্রেতা স্বাধীন। তিনি কোন বিশেষ দোকানদারের বাধ্য নহেন। ধারে ক্রয়কারী প্রবঞ্চিত হইয়া কতক চক্ষুলজ্জায় ও কতকটা বাধ্য হইয়া সহ্য করিয়া যান এবং কেহ কেহ ভাবেন, "আমিও রিক্তহস্তে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছি, দশ দোকান 'টো টো' করিয়া ঘুরিয়া দশ জনের সহিত দরদাম করিবার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইতেছি, দোকানদারও তাহার মূল্যস্বরূপ কিছু লইতেছে মাত্র"- এইরূপ অলস, অসহিষ্ণু, অপরিণামদর্শী এবং অসঞ্চয়ী ব্যক্তিগণকেই সংসারের দুর্ভাবনা, অসন্তোষ এবং অভাবের সহিত বাস করিতে হয়। তাঁহারা আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারে না, দেনা পরিশোধ করিবার পর তাঁহাদের অর্থবল কিরূপ দাঁড়াইবে এবং হঠাৎ কোন বিপদাপদ উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন কিনা, তাহা তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহারা সর্বদাই নগদ টাকা খরচ করিয়া স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করেন তাঁহাদের অবস্থা তাঁহাদের চক্ষের উপর থাকে এবং স্বীয় শক্তি

অনুসারে তাঁহারা অভাববোধ ও তাহা দূর করিয়া থাকেন। সিদ্ধি এবং ঋদ্ধি লাভ করিতে হইলে ঋণ পরিহার করিতেই হইবে।



তৃতীয় অধ্যায়

দারিদ্র্য

নিধনতা সর্বাপদামাষ্পদম্।
যাহার যত অভাব সে তত দরিদ্র।
"অপচয় করিও না অভাব হইবে না।" —প্রবচন।

"যে নিজের অভাব মোচন করিয়া কিছু সঞ্চয় করে
তাহাকে দরিদ্র বলা যায় না।" —স্যামুএল স্মাইলস্।

"ব্যক্তিগত সঞ্চিত ধন হইতে জাতীয় ধন সঞ্চিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,
অপর পক্ষে ব্যক্তিগত অপচয় হইতেই রাজ্যের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।"

মূর্খতা বা শিক্ষার অভাব দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এখানে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিকর্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। জীবিকার যাহা প্রাধান অবলম্বন, সে-সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজিও তাহাই আছে! জগতের উন্নতিশীল জাতি সকল বিজ্ঞান ও রসায়নের বলে কৃষিকর্মের বিস্ময়কর উন্নতি করিয়া চলিয়াছে, আর ভারতের যুগযুগান্তর কাটিল কিন্তু বৈদিক যুগের সেই হলকুদাল আর ঘুচিল না!

ভারতের কত স্থানে কত প্রকার বৃক্ষ জন্মিতেছে, ভূগর্ভে কত রত্ন প্রোথিত রহিয়াছে এবং জলে, স্থলে কত ধন বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান জানিয়া এবং প্রয়োজন বুঝিয়াও লোকে শিক্ষা এবং জ্ঞানের অভাবে তাহা সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিতেছেনা। এই যে মধ্যভারতে

অসংখ্য খর্জুর বৃক্ষ জন্মে, তাহা হইতে রস নিষ্কাশিত করিয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, অজ্ঞান অধিবাসীরা সর্বদাই সেই ক্ষেত্রে বর্তমান রহিয়াছে, বৃক্ষ চক্ষে দর্শন করিতেছে, ইহার রসে গুড় ও চিনি হয় তাহা শুনিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহার জ্ঞানের অভাবে কিছুই করিতে পারিতেছে না। যে ক্ষেত্রের যে শস্য উৎপাদনের শক্তি আছে তথায় তাহাই উৎপাদন করা জ্ঞান ও বুদ্ধির কার্য। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বিচার না করিয়া তাহা হইতে যে শস্যের প্রয়োজন তাহা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং আশানুরূপ ফল ত দর্শেই না, অধিকন্তু প্রায়ই অকৃতকার্য হইতে হয়। যথায় যে শিল্পের প্রয়োজন তথায় তাহার প্রবর্তন না করিয়া শিল্পী যে শিল্প শিক্ষা করিয়াছে তাহারই প্রচলন করায়, এবং যে দেশে, যে ঋতুতে ও যে মৃত্তিকায় যে বীজ বপন করা কর্তব্য তাহা না করিয়া, যে শস্যের স্থানীয় অভাব উপস্থিত তাহারই বীজ বপন করায়, কার্যসিদ্ধিও হয় না; দারিদ্র্যও আর ঘুচে না। দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, দারিদ্র্যের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, লোকে ততই বাণিজ্য শিল্পাদি ব্যবসায় পরিহার করিয়া, সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রকর্ষণে মনোনিবেশ করিতেছে; অর্থাৎ মূলধনের অভাবে যাহা সামান্য পুঁজিতে সাধ্য তাহাই অবলম্বন করিতেছে। বঙ্গের প্রথম গবর্ণর লর্ড ক্লাইব বঙ্গের প্রাচীন রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্ত লোকের সংখ্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "লণ্ডন অপেক্ষাও এখানে অধিক শক্তিশালী লোকের বাস।" এখন ভারতে ৩০ কোটীরও অধিক লোকের বাস, কিন্তু শতকরা ৭ জনও সহরে বাস করে না, কিন্তু ইংলণ্ডে শতকরা ৬৭ জন সহরে বাস করে। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার চতুর্দশভাগের ত্রয়োদশ ভাগই পল্লীবাসী। বিলাতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন শিল্পী। কিন্তু ভারতবাসীর শতকরা ১৫ জন মাত্র শিল্পব্যবসায়ী!

বড় বড় সহরের বাহিরের সৌষ্ঠব, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং প্রাসাদ, মস্ত মস্ত 'জুড়ী', মহামূল্য অলঙ্কার, নয়নঝলসিতকর পোশাকপরিচ্ছদ, পণ্যবীথী, জনকোলাহল, নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, আমোদপ্রমোদ এবং

প্রাচুর্যের চিহ্ন সত্ত্বেও যে দেশের মর্মস্থল ভেদ করিয়া অন্নবস্ত্রের জন্য শত শত নরনারীর হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইতেছে তাহার কারণ দেশব্যাপী দারিদ্র্য। ১৯০১ সালের আদমসুমারির গণনায় জানা যায় ভারতে ভিক্ষান্নভোজী 'সাধু' ও 'পেশাদার' ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫২ লক্ষ! তাহারা স্ব স্ব উদরান্নের জন্য উপার্জন ত করেই না এবং এমন কোনই কর্ম করে না যাহাতে দেশের ধনোৎপাদনের কোন প্রকার সাহায্য হইতে পারে; অধিকন্তু, তাহারা দেশের উপার্জনক্ষম প্রজাবর্গের উপার্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে, এবং অধিকাংশভাগই অলস, অকর্মণ্য জীবন যাপন করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্য ন্যূনতম হারেও মাসিক ৩ টাকা করিয়া পড়ে, সুতরাং ভারতের উপার্জনশীল পরিশ্রমী নরনারী প্রতি বৎসর ১৮ কোটী টাকা ব্যয়ে, দেশের ৫২ লক্ষ অকর্মণ্য লোকের ভরণপোষণ করিতেছে। প্রতি বৎসর ১৮ কোটীর হিসাবে ২৫ বৎসরে কুপোষ্যপোষণ করিতে প্রজাবর্গের চারিশত পঞ্চাশকোটী টাকা ব্যয় হয়। সম্প্রতি সার আর্ণেষ্ট্ কেব্‌ল্ হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, সমগ্র ভারতের সঞ্চিতধনের পরিমাণ চারিশত পঞ্চাশকোটী টাকা।* সুতরাং বলা যাইতে পারে, প্রতি ২৫ বৎসরে ভারতের সমস্ত ধন এমন ৫২ লক্ষ লোক ভোগ করিতেছে—যাহারা দেশের ধনোৎপাদনে কোনরূপ সাহায্য ত করেই না, বরং কোটী কোটী দরিদ্র শ্রমজীবীর দারিদ্র্য বৃদ্ধির পক্ষেই সাহায্য করে। ঐ অর্থ রাশীকৃত করিলে বিশকোটী সুবর্ণমুদ্রা বা তিনশত কোটী টাকায় পরিণত হয়। এতগুলি সুবর্ণমুদ্রা পাশাপাশি সাজাইয়া গেলে চারসহস্র মাইল পথ বিস্তৃত হয়!

স্পেনের এত দারিদ্র্য কেন? যে দশা ভারতের সেই দশাই স্পেনের, তথায় লোকে ভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করে না, কিন্তু মজুরী করিতে, খাটিয়া খাইতে লজ্জা পায়! পরিণামে কি দেখা যায়? ভারতে ৫২ লক্ষ ভিক্ষুক; আর স্পেনে? তথায় এক গোয়াডাল্‌কুইভার্ নদীর তীরবর্তী

** "The hoarded wealth of India Sir Earnest says has been estimated at three hundred millions sterling. ---' The Pioneer. 2-7-08*

ভূভাগে, যথায় এক সময় দ্বাদশ সহস্র গ্রাম ছিল, তথায় এখন আটশতও নাই এবং যাহাও আছে তাহা ভিক্ষুকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে! অলস হস্তই লোককে অপকর্মে নিযুক্ত করে। যাহারা দরিদ্র হয়, তাহারা পরের সম্পত্তি লুণ্ঠনদ্বারা লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে দরিদ্র না করিলেও, দারিদ্র্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। দেশের অগণিত ভিক্ষুক জাতীয় দারিদ্র্যই যে বৃদ্ধি করিতেছে তাহা নহে, তাহারা অলস, অদৃষ্টবাদী এবং নীচাশয়ের প্রতিনিধি হইয়া দেশের প্রজাকুলের সমক্ষে এক অতীব ঘৃণিত আদর্শ স্থাপন করিতেছে। যাহারা অধ্যবসায়, উদ্যম এবং নবীন উৎসাহে স্বর্গমর্তপাতাল আলোড়িত করিয়া ফেলিবে, এমন সকল যুবকের মুখে শুনা যায়, "কিছু না হয়, ভিক্ষা মাগিয়া খাইব"; "ভিক্ষান্ন ত আর কেহ ঘুচায় নাই!" যুবকদের এই অবসাদ, এই ঘৃণ্যজীবনের প্রতি আস্থার ভাব দেখিয়া মর্মাহত হইতে হয়।

যজন যাজন অধ্যাপনা নিরত ব্রহ্মপরায়ণ ধর্মাত্মাগণ যে মহান্ আদর্শে ভিক্ষান্নে জীবনধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার সমালোচনা করা বা তদ্বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে উদ্দেশ্যে উক্ত প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহার পরিণাম যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য। কি ছিল তাহা ভাবিবার আর সময় নাই; কি হইয়াছে এবং কি হইবে তাহাই উপস্থিত চিন্তার বিষয়। এদেশে কি ধনী, কি গৃহস্থ, কি দরিদ্র, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল এবং নিরুপায় হইলে, হঠাৎ ভিক্ষার ঝুলি লইতে লজ্জাবোধ করিবেন না কিন্তু 'মজুরী বা মুটেগিরি' করিতে প্রাণান্তেও পারিবেন না। অবশ্য ইহার কারণও আছে। বঙ্গের ধনকুবের লালাবাবুও ভিক্ষা করিয়া গিয়াছেন; ভিক্ষা বুদ্ধদেব চৈতন্যদেবও করিয়াছেন। কিন্তু এখনও এদেশে কোন রাজা মহারাজা কোন জমিদারসন্তান দিনমজুরী করিয়া জীবনধারণের পথপ্রদর্শন করেন নাই। এখনও কোন 'পিটার দি গ্রেট' মিস্ত্রীর 'তামাক সাজিয়া' দিয়া শিল্পশিক্ষা করেন নাই। এখনও কোন গ্লাডষ্টোন কাঠ কাটিয়া, বাগানে 'কোদাল পাড়িয়া' প্রৌঢ়বয়সে এবং বার্ধক্যেও শরীরচালনা ও ব্যায়াম চর্চার পথ দেখান নাই। কোন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন স্বীয় মুদ্রাযন্ত্রালয়ের জন্য কাগজ ক্রয় করিয়া ঠেলাগাড়ি করিয়া স্বহস্তে টানিয়া আনেন নাই। কিন্তু রাজচক্রবর্তী

রাজা সত্যপালনের জন্য জীবনের সারভাগ বনবাসে এবং অতি ক্লেশে অতিবাহিত করিলেন, রাজকুমার যৌবনে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন, সর্বস্ব দান করিয়া ধনকুবের পথের ভিখারী হইলেন-এইরূপ স্বর্গীয় চিত্রে ভারতেতিহাস পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; এ চিত্র জগতের ইতিহাসে বিরল এবং প্রকৃতই অপার্থিব। পার্থিব সমাজের পক্ষে কিন্তু ইহাই একমাত্র স্থির আদর্শ নহে। ত্যাগের পার্শ্বে ভোগেরও আদর্শ চাই। অনুরাগ ও বিরাগ এবং কর্ম ও বিশ্রাম—উভয়ের সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে। এই সামঞ্জস্যসাধক চরিত্রেরও আমাদের অভাব নাই। পিটার দি গ্রেট, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ প্যালিসী বা অব্রাহাম লিঙ্কন এদেশের জলবায়ুতে জন্মগ্রহণ না করিলেও, আজিও আমরা আমাদের উপযোগী আদর্শে হীন হই নাই। আদর্শের অভাব নাই সত্য, কিন্তু আদর্শানুসারে জীবনগঠন করিতে আমরা কি উদ্যোগ করিতেছি? কয়জন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন? কয়জন রামদুলাল সরকার, নসরবান্জী তাতা, স্যর মুথুস্বামী আইয়ার বা স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুকরণ করিয়া থাকেন? কিন্তু রিক্তহস্তে গৌরী সেনের অনুকরণ করিতে, অন্নবস্ত্রের সংস্থান না থাকিলেও অভিজাতব্যক্তিবর্গের অনুকরণে খরচপত্র করিতে ও পূজাপার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে ঋণ করিয়া আমোদপ্রমোদ এবং দানধ্যান করিয়া নাম যশঃ লইতে অনেককেই দেখা যায়। ধনকুবের কার্নেগী, রক্‌ফেলার বা তাতার অধ্যবসায়, উদ্যোগ, মিতব্যয় ও সঞ্চয়শীলতার অনুকরণ বড় কেহ করেন না, কিন্তু, রথস্‌চাইল্ড যে জেব্রার গাড়ি চড়িয়া বেড়ান, বিদ্যুতের আলোকে যে তাঁহার গৃহ আলোকিত হয় এবং তাঁহার প্রাসাদের সজ্জা সৌষ্ঠব দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়—যিনি সহস্রপতি তাঁহার দৃষ্টি এই সকলের প্রতি পতিত হয়। ধন না থাকিলেও, শুদ্ধ সাধ পূরণের জন্য যে ধনী হইতে চাহে এবং ধনীদিগের অনুকরণে অর্থব্যয় করে সে-ই প্রকৃত দরিদ্র। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, মানবের সুখের শত্রু দারিদ্র্য। ইহা, নিশ্চয়ই স্বাধীনতা হরণ করে, কতকগুলি ধর্মানুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া এবং আর কতকগুলিকে কঠিন বা অসাধ্য করিয়া তুলে।

মিতব্যয় ব্যতীত কেহ ধনী হয় না এবং মিতব্যয়ে কেহ দরিদ্র হয় না।— ব্যক্তিগত অপচয়ই সমগ্র দেশকে দরিদ্র করিয়া ফেলে। সেই সকল ব্যক্তিই দেশের প্রকৃত শত্রু। জগতের সঞ্চয়বুদ্ধিশূন্য, অপচয়ী এবং অপরিণামদর্শী জাতি দ্বারা কখন কোন মহৎ কার্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। সঞ্চিত-ধনহীন ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই শক্তিহীন হইয়া থাকে। তাহারা যেমন আত্মমর্যাদাশূন্য হয়, তেমনই পরের মর্যাদা-জ্ঞান-বিহীনও হয়। স্বাধীনতা তাহাদের পক্ষে আকাশকুসুম মাত্র। কাহাকেও পুরুষোচিত তেজঃ ও ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য একমাত্র দারিদ্র্যই যথেষ্ট। পরের সাহায্য না লইয়া বা পরের গলগ্রহ না হইয়া আপনার ও স্বীয় পরিবারের ভরণপোষণ করা, যাহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তাহারই কর্ম। সকল স্বাবলম্বী এবং তেজস্বী ব্যক্তিরই আত্মমর্যাদা বোধ থাকে। যে আপনাকে উন্নত করে সে জগৎকে উন্নত করে। সামাজিক উন্নতি ব্যক্তিগত উন্নতির ফল। যাহার নিজেরই অভাব মোচন হয় না সে পরের অভাব কি প্রকারে দূর করিবে?

প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য পুরুষকার দ্বারা দারিদ্র্যকে দূর করা। সকলকেই যে কোটীপতি হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই এবং তাহা সম্ভবও নহে, কোন দেশে--কোন জাতির মধ্যে তাহা হয় নাই এবং হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই "সামান্য অশন ও সামান্য বসনের" সংস্থান করিতে পারে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সুখী হইতে পারে। দরিদ্র হওয়া কলঙ্কের কথা নহে। সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা এবং সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ দরিদ্রকেও সম্মানাস্পদ এবং গৌরবান্বিত করে। সামান্য অবস্থাপন্ন বলিয়া যাহাকে দরিদ্র বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাকে দরিদ্র বলে না, কিন্তু যে ব্যক্তি এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে না এবং ঋণ করিয়া ব্যয় করে সেই প্রকৃত দরিদ্র। এরূপ ব্যক্তি চরিত্র বজায় রাখিতে পারে না। সুতরাং যদি কিছু কলঙ্কের কথা থাকে, তবে, এই শ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায়তঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ অর্থাভাব মনুষ্যত্ব নষ্ট করে এবং দারিদ্র্য মানুষের মধ্যে সহস্র প্রকার নীচতা আনয়ন করে। পক্ষান্তরে সাধুচরিত্র স্বাবলম্বী সামান্য গৃহস্থ চরিত্রহীন ভূম্যধিকারী অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুচরিত্র গৃহস্থের ভদ্রাসন রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা

পবিত্র। যাঁহাদের ধন নাই, তাঁহারাই প্রায় হৃদয়বান হইয়া থাকেন এবং যাঁহাদের ধন আছে তাঁহারা অধিকাংশস্থলে কর্তব্যবিমুখ ও সামান্য সামান্য স্বার্থত্যাগে পশ্চাৎপদ হন। কিন্তু যদি ধনের সহিত ত্যাগশীলতার এবং কর্তব্যবুদ্ধির সংযোগ হয় তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্য অনেক ঘুচিয়া যায়। ধনীর প্রাসাদ অপেক্ষা সামান্য গৃহস্থের গৃহেই প্রতিভাশালী মহাজনের জন্ম হয়।—যীশু, নানক, চৈতন্য তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বিদ্যাসাগর, ভূদেব, দ্বারকানাথ, কৃষ্ণদাস, অক্ষয়কুমার ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ সামান্য গৃহস্থেরই সন্তান ছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ফার্গুসন্ দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; তিনি পূর্বে চিত্র অঙ্কন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। উইঙ্কল্ম্যানের পিতা জুতা গড়িতেন; এবং পিতা পুত্রে রজনীযোগে পথে পথে গান গাহিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। বালক উইঙ্কল্ম্যান সেই অর্থে কলেজে শিক্ষা লাভ করিতেন। এই বালক উত্তরকালে প্রাচীন সাহিত্য এবং সূক্ষ্ম শিল্পকলা-সাহিত্যে প্রখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। এ্যাণ্ড্রু কার্ণেগী, রক্‌ফেলার প্রভৃতি বাণিজ্যবীর দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্কিনের সাধারণতন্ত্রের সভাপতি লিঙ্কন্ দরিদ্রের সন্তান। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবীর ফ্যারাডেকে পথে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে যাঁহারা গৌরবান্বিত-পদে উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতেই দেখা যায়, সামান্য অবস্থার লোকও বড় হইবার আশা করিতে পারে। উচ্চাভিলাষ, উদ্যম এবং অধ্যবসায় বলে সকলেই উন্নত হইতে পারে। যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মহাজনের নাম করা হইল, তাঁহারা দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পুরুষকার দ্বারা দারিদ্র্যকে নিহত করিয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, কোটীপতিরও নমস্য হইয়াছেন এবং সমগ্র মানবজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

কৃপণ

কৃপণ তাহাকেই বলে, যে ধন বর্তমান থাকিতে, প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করে না। যে অহরহঃ কেবল ধন বৃদ্ধি এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণেই জীবন অতিবাহিত করে, সুবর্ণই যাহার আরাধ্য, সঞ্চিত ধন দেখিয়াই যাহার তৃপ্তি, যে ধনের ব্যবহারমাত্র করিতে বিমুখ এবং অর্থপূজায় যাহার দয়া, ধর্ম, পরোপকার প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি লোপ পাইয়া হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাকে কৃপণ বলে। কৃপণ এবং দরিদ্রের মধ্যে বড় প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কৃপণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জন করে এবং উদরে প্রচুর অন্ন না দিয়া, অঙ্গে উপযুক্ত বস্ত্র না দিয়া, দিবা রাত্রি কেবল কড়া ক্রান্তি জুড়িতে জুড়িতে প্রভূত ধন সঞ্চয় করে; কিন্তু কি যে তাহার ধনতৃষ্ণা কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হয় না, —সঞ্চয়লালসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না! কোটী কোটী টাকার অধিপতি হইলে কি হয়, তাহা তাহার ভোগ করিবার সামর্থ্য নাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকিলে কি হয়, তাহার দৈন্য ঘুচিবার নহে! স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্যে তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলে কি হয়, তাহাতে তাহার অধিকার নাই! তাহা তাহার স্পর্শ করিবারও অধিকার নাই! কৃপণ তাহা দেখিয়াই পরিতৃপ্ত! সে ত ভোগ করিতে আইসে নাই, সে কেবল অর্থস্তূপ করিবার জন্য আসিয়াছে; সে ধনাগারে প্রহরী হইয়া সঞ্চিত ধন, সুবর্ণস্তূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আসিয়াছে; তাহার জীবিতকালে এই "যক্ষের ধন" কোন্ কার্যে আসিবে? ভূগর্ভে প্রোথিত স্বর্ণখনি ও রত্নাকরগর্ভে মুক্তা-প্রবালাদি সঞ্চিত থাকাও যেরূপ, কৃপণের ধনরত্নও তদ্রূপ। অশন বসন এবং জীবনধারণোপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা স্বল্প মূল্যে প্রাপ্তব্য তাহাই কৃপণের গৃহে সংগৃহীত হয়। কৃপণ পরিবারবর্গসহ ছিন্ন

মলিন শত গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রে অঙ্গাবৃত করিয়া নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, কারণ সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, কৃপণ তাহা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। তাহার গৃহস্থালীর অবস্থা শোচনীয়; ভদ্রাসন পুরাতন হইয়াছে, স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, ছাদ হইতে স্থানে স্থানে বর্ষার বারিপতনজন্য অন্তঃপুরবাসিগণের কতই অসুবিধা ভোগ হইতেছে, অথচ কৃপণের তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। জীর্ণসংস্কার করিতে যে অর্থব্যয় হইবে তাহা সঞ্চয় করিলে, তাহার কোটী টাকার উপর আর একশত টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

নিন্দা, কটূক্তি, বিদ্রূপের প্রতি কৃপণের দৃকপাত নাই। কৃপণ মানসিক এবং দৈহিক সকল কষ্ট, সকল অসুবিধা এবং সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রাণ বিনিময়েও অর্থব্যয় করিতে, স্তূপীকরণে বাধা পাইতে এবং ধননাশ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। এই কৃপণই কি সুতরাং দরিদ্র নহে? কৃপণের ধনরাশির পশ্চাতে যে দারিদ্র্যশনি লুক্কায়িত থাকিয়া অহরহঃ কৃপণের বংশে প্রবেশ করিবার মত ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকে, কৃপণ তাহার সন্ধান লয় না। শনি যে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে, সে তাহা জানিতেও পারে না। সে যখন উদরে অন্ন না দিয়া, অঙ্গে বস্ত্র না দিয়া, প্রতিবেশীর সুখদুঃখের সহচর না হইয়া, দেশহিতকর কার্যে যোগ না দিয়া, আহারব্যবহার লোকলৌকিকতার অভাবে সমাজের অপ্রীতিভাজন হইয়া, মঙ্গল অমঙ্গল, ভূত ভবিষ্যতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কেবল কড়াক্রান্তির সহিত কড়াক্রান্তি জুড়িয়া, পয়সার সহিত পয়সা এবং আনার সহিত আনা যোগ করিয়া শত শত টাকা সঞ্চয় করিতে থাকে, এবং শত হইতে সহস্র, সহস্র ক্রমে লক্ষ, লক্ষ কোটীতে এবং কোটী শত কোটীতে পরিণত হইতে দেখিয়া আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হন, তাহার দেহ মন প্রাণ যখন অহরহঃ অর্থের পশ্চাতে ফিরিতে থাকে, তখন তাহার গৃহে সন্তানগণ পুষ্টিকর আহারাভাবে দুর্বল, উপযুক্ত শিক্ষাভাবে মুর্খ ও উন্নত আদর্শাভাবে চরিত্রহীন হইয়া এবং কৃপণের শাসনে অতৃপ্ত লালসা লইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হঠাৎ যদি এই অবস্থায় কৃপণের মৃত্যু হয়, তাহার অতুলঐশ্বর্য সেই অশিক্ষিত, অদূরদর্শী, পশুগণের হস্তে পতিত হয়। একদিন যাহারা পিতার

কার্পণ্যবশতঃ সকল সুখ, সকল আরাম, ভোগবিলাস এবং আমোদপ্রমোদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, হঠাৎ তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে বন্ধনমুক্ত বারণের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। তাহারা ত আর পিতার মত মদমত্ত কড়াক্রান্তির সহিত কড়াক্রান্তি জুড়িয়া কোটী কোটী মুদ্রা সঞ্চয় করিবার শিক্ষা ও সহিষ্ণুতা লাভ করে নাই? তাহারা যৌবনের অতৃপ্ত বাসনার সঙ্গে প্রচুর ধনের অধিপতি হইয়াছে; স্বভাবতঃ তাহারা ধনীদিগের মতই থাকিতে চাহিবে, সুতরাং যে অর্থ কষ্টার্জিত নহে, তাহা অকাতরে ব্যয় করিতেই বা কুণ্ঠিত হইবে কেন? কিন্তু দূরদর্শিতা এবং শিক্ষার অভাবে, অতি অল্পদিনেই সেই বহুকষ্টার্জিত ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং কোটীপতির সন্তান পথের ভিখারী হইয়া পড়ে।

দাতাকর্ণ

অতিদান, অতিব্যয় এবং অপব্যয় অপচয়েরই নামান্তর।
"অতিদানে বলির্বদ্ধঃ।"
দাতাকর্ণ পিতা, দারিদ্র্য তাহার সন্তান।

মহাবীর কর্ণের ন্যায় দাতা আর কে? জগতে দানবীর অনেকেই হইয়াছেন এবং এখনও অনেক আছেন, যাঁহাদের অনুগ্রহে আজি জগৎময় দেবালয়, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, বিদ্যালয়, পুস্তাকাগার, আতুরাশ্রম

প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে ;—এমন অনেক "গৌরী সেন" হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের নাম আজি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে; অনেক রাজা মহারাজা বৈরাগ্যবশে রাজভাণ্ডার লুটাইয়া গিয়াছেন ; কোন কোন ভূপতি কোন কোন দিন "কল্পতরু" হইয়া বসিয়াছেন আর প্রজাবর্গ যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে তাহাই পাইয়াছে ; অতিদান করিয়া বলিরাজাও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; —কিন্তু অদ্যাবধি কোন্ দাতা যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে শত্রুহস্তে স্বীয় রক্ষাকবচ ও কুণ্ডল দান করিয়া স্বীয় মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন? কোন্ দাতা অজ্ঞাতকুলশীল অতিথির প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য স্নেহের পুত্তলী নয়নের মণি শিশুপুত্রের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়াছেন? পুরাণের দাতাকর্ণই জগৎসংসারে তাহার একমাত্র আদর্শ। এই কারণেই কেহ বদান্যতায় যশোলাভ করিলে অথবা মুক্তহস্তে দান করিলে তাঁহাকে দাতাকর্ণ বলা হয়। ক্রমে এই সংজ্ঞা বিদ্রূপচ্ছলেও ব্যবহৃত হইতে থাকে। সে যাহা হউক, প্রকৃতই আদর্শানুযায়ী দাতাকর্ণ হইলে সংসারে কাহারও ধন মান এবং প্রাণ নিরাপদ হয় না।

এরূপ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়—"অমুক ব্যক্তি বৎসরে হাজার হাজার টাকা দান করিত। এমন দয়াশীল বদান্য আর দেখা যায় না। লোকটা যেন সাক্ষাৎ 'দাতাকর্ণ' ছিল ; পথের লোককে ডাকিয়া অন্ন দিত, বস্ত্র দিত ; কন্যার বিবাহে টাকা ঢালিয়া দিয়াছে; পিতৃশ্রাদ্ধে বা মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর করিয়া গিয়াছে; বারইয়ারী নাচ-তামাসায় অর্থকে অর্থ জ্ঞান করে নাই।" কিন্তু বিধাতার কি যে বিধান,—হায় তাঁহার মায়া কে বুঝিবে,—সেই "দাতাকর্ণের" স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আজি পথের ভিখারী! যে ব্যক্তি এক সময়ে পথের লোক ডাকিয়া অন্ন বিতরণ করিয়াছে তাহার পরিবার আজ "হা অন্ন হা অন্ন করিতেছে! যিনি এক সময়ে "দুহাতে অর্থ বিতরণ করিয়াছেন", যখন তাঁহার মৃত্যু হইল তখন দেখা গেল, গৃহে এক কপর্দকও নাই!' এমন কি তাঁহার মৃতদেহের সৎকার হয় এমন সংস্থানও রাখিয়া যান নাই! তাঁহার শ্রাদ্ধশান্তি করিতে, উত্তমর্ণদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে গহনাপত্র সমস্তই বিক্রয় করিতে হইল এবং আসবাবপত্র যাহা কিছু ছিল অল্পদিনেই সমস্ত নিঃশেষিত হইল। কেন এমন হইল? ঐ যে বলা হইয়াছে

তিনি জীবিতকালে "দুহাতে অর্থ বিতরণ করিয়া ছিলেন"—ইহা তাহারই পরিণাম। তিনি জীবিতকালে যাহা উপার্জন করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া, পরিবারবর্গের জন্য কোন সংস্থান না করিয়া সমস্তই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সেই অপরিণামদর্শিতার জন্য, সেই "যত্র আয় তত্র ব্যয়" নীতির জন্য ঋণ করিয়া অপব্যয় করিবার জন্য, "দাতাকর্ণের" স্ত্রী-পুত্র পরিবার আজি "পথের ভিখারী"! তিনি মুক্তহস্ত হইয়া "দাতাকর্ণের" খ্যাতি লাভ না করিয়া যদি ব্যয়কুণ্ঠ হইয়া এমন কি কৃপণের দুর্নামভাগীও হইতেন, তাহা হইলে, বিনাপরাধে বিধবা পত্নী, বৃদ্ধা জননী এবং অপোগণ্ড শিশুসন্তানগুলিকে পথের ভিখারী করিতেন না। এই নিষ্ঠুরতার মূল তাঁহার অতিব্যয় অথবা অপব্যয়। সুতরাং এই নিষ্ঠুরতার জন্য, এই অপরাধের জন্য, একমাত্র তিনিই কি দায়ী নহেন?

খ্রীঃ ১৪৭০ অব্দে ইংলণ্ডরাজ চতুর্থ এডবার্ডের রাজত্বকালে আর্ল অব ওয়ারউইকের ভ্রাতা জর্জ নেভিল্ প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইবার কালে এক ভোজ দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি প্রধান প্রধান ধর্মযাজক এবং দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। এই ভোজে এত অর্থব্যয় হইয়াছিল যে, আজিও তাহা ইংলণ্ডে উপমার স্থল হইয়া আছে। ভোজের ফর্দ যখন দাখিল হইল, তখন দেখ গেল ১০৫ মণ ময়দা, ৯৪৫০ মণ 'এল' মদ্য, ২৮০৮ মণ সুরা, মসলাযুক্ত মদিরা এক পিপা (৯.৫ মণ), ৮০ টা হৃষ্টপুষ্ট বলদ, ৬টি বন্য ষাঁড়; ১০০৪ টি খাসী ভেড়া, ৩০০ শূকর, ৩০০ বাছুর, ৩০০০ রাজহাঁস, ৩০০০ খাসী কুক্কুট, ৩০০ শূকরশাবক, ১০০ ময়ূর, ২০০ চক্রবাক, ২০০ ছাগশিশু, ২০০০ মুরগী, ৪০০০ পায়রা, ৪০০০ শশক, ২০৪ বিটার্ণ পক্ষী, ৪০০০ পাতিহাঁস, ২০০ ফেজাণ্ট পক্ষী, ৫০০ তিতির, ২০০০ কাঠঠোকরা, ৪০০ প্লোভার পক্ষী, ১০০টি ক্রৌঞ্চ, ১০০ বটের, ১০০০ বক, ২০০ রীস্ (রীভ পক্ষী?), ৪০০ মৃগ, ১৫০০ শুষ্কমৃগমাংসের গরম পিষ্টক ও ৪০০০ ঠাণ্ডা পিষ্টক, ১১০০০ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্ষীরপুলী, মোরব্বা, পিষ্টকাদি এবং এক সহস্রাধিক মৎস্য, শুশুকাদির ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ভোজে আর্ল অব ওয়ারউইক ছিলেন ভাণ্ডারী, আর্ল অব বেডফোর্ড ধনাধ্যক্ষ এবং লর্ড হেষ্টিংস ছিলেন প্রধান

হিসাবপরীক্ষক। অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্তকর্মকর্তা ব্যতীত ১০০০ পরিবেশক, ৬২ জন পাচক এবং , ৫১৫ জন রন্ধন-গৃহের যোগাড়দাতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অমিতব্যয়ের পরিণামে কি হইয়াছিল একবার স্মরণ করা কর্তব্য। অমিতব্যয়ের ফলে এই অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি দীনহীন ভিখারীর ন্যায় অতি শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।* যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যাঁহাদের পরিতোষ সাধন করিয়াছিলেন তাঁহার শোচনীয় অকালমৃত্যুতে তাঁহারা এক বিন্দুও অশ্রুপাত এমন কি একটি "আহা" শব্দ উচ্চারণ মাত্রও করে নাই; বরং তাঁহার অদূরদর্শিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনেকে বিদ্রূপই করিয়াছিল। এদেশে কত জমীদারসন্তান এই অমিতব্যয় ও অতিদানের ফলে পথের ভিখারী হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালীগৌরব বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি অসামান্য ধীসম্পন্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পন্নের সন্তান হইয়াও স্বীয় অপরিণামদর্শিতা এবং অমিতব্যয়ের ফলে স্ত্রী পুত্র লইয়া বিব্রত, ঋণগ্রস্ত, সংসারভারাক্রান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং ক্রমে তাঁহার এমনই দুঃসময় আইসে যে তিনি পরিবারবর্গকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া অন্য কবি অমর ভাষায় বলিয়াছেন—

"সে মধুসখারে আজি পাষাণ পরাণে
(কি বলিব হায়!)
অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায়!"

রাশিয়ার ধনকুবের ডারউইকস্ (Derwics) বংশের শেষ বংশধর পলডারউইকস ১৮৮৭ অব্দে পিতার ১২০,০০০,০০০ রুবু** মুদ্রার অধিকারী হন। কিন্তু তাঁহার অমিতব্যয়িতা, বিলাসিতা ও খেয়ালের জন্য তিনি অতি অল্পদিনেই সমস্ত উড়াইয়া দিয়া জননী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গের

** A new Dictionary of the Belles Letters. Page 435*

*** রুবু্ প্রায় ২ টাকার সমতুল্য।*

সাহায্যভিখারী হন। প্যারিসের জনৈক ধনকুবের স্বীয় পুত্রকে চারিকোটী ফ্রাঙ্ক* মুদ্রা দিয়া যান। পুত্র এরূপ অমিতব্যয়ী ছিলেন যে, তিনি সেই বিপুল ধন, প্রাসাদ নির্মাণে এবং বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। তিনি পরে এমনই শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হন যে, তাঁহাকে রাজপথ সম্মার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। ধন, বংশগৌরব, সুরূপ, বিদ্যাবিনয়াদি গুণ কিছুতেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে না, যিনি মিতব্যয়রূপ রক্ষাকবচ ধারণ না করেন। সঞ্চয়শীল ও মিতব্যয়ী না হইলে কিছুতেই রক্ষা নাই। অমিতব্যয়িতারূপ একমাত্র দোষ গুণরাশিনাশী হইয়া রাজচক্রবর্তীকে পথের ভিখারী করিয়া ছাড়ে! ঋদ্ধির গুপ্তমন্ত্র মিতব্যয়।

দান

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়"।

অতিদান যেমন পতনের মূল, বেহিসাবী খরচপত্র যেমন ঋণের জনক, তেমনি দান এককালে না করাও অকর্তব্য। বদান্যতার অভাব হইলে মানব-হৃদয়ের কয়েকটি অতি কোমল বৃত্তির অভাব হয়। শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন, "দয়াই ধর্ম"। দান সেই দয়ার অভিব্যক্তি মাত্র। দয়াপ্রবণ হৃদয়

** ফ্রাঙ্ক প্রায় দশ আনার সমান।*

ধন মান ঐশ্বর্য এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিপদে সহায়তা করা দয়ার কার্য ; অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, দরিদ্রকে অর্থদান, অনাথকে আশ্রয়দান, আতুরকে ঔষধ পথ্যাদি দান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে বারিদান, অনুতপ্তজনকে ক্ষমাদান, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং বিপথগামীকে সৎপরামর্শদান করা দয়ার কার্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "দানমেকং কলৌযুগে" অর্থাৎ বর্তমান যুগে দানই একমাত্র উদ্ধারের পথ, উহাই ধর্ম। এই দানধর্ম পালন করিতে হইলে কয়েকটি বিধিনিষেধ মানিতে হয়। এই ধর্ম রক্ষা করিতে হইলে কতিপয় নিয়মও রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। অতিদান, অপাত্রে দান, বিচারশূন্য বা পাত্র-নির্বিশেষে দান, অকারণ দান, নাম কিনিবার জন্য দান, অনিচ্ছায় বা বিরক্তির সহিত দান, এবং ভয়ের বশে দান করিলে ধর্ম রক্ষিত হয় না। যাহাতে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যাহাতে অকর্মণ্য লোককে দেশের দারিদ্র্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়—এমন দান করিতে নাই। জগৎসংসারে দানবীর অনেক হইয়া গিযাছেন এবং এখনও অনেক আছেন। তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন। এক শ্রেণীর আদর্শ "গৌরী সেন" অন্যের আদর্শ "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর"। "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন"—ওই যে এক প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে তাহার অর্থ এই যে, গৌরী সেন এমন অর্থশালী এবং দাতা ছিলেন যে, যাহারই সাহায্যের প্রয়োজন হইত গৌরী সেনের অর্থভাণ্ডার তাহারই জন্য উন্মুক্ত হইত, সুতরাং যাহারা অলস, অকর্মণ্য, দায়িত্ববিহীন, তাহারাই অধিকাংশ স্থলে তাঁহার বদান্যতার সুযোগ গ্রহণ করিত। এই সকল দায়িত্বহীন ব্যক্তিদিগের উক্তি "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন" ক্রমে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। গৌরী সেনের এই দান বিচারশূন্য অতিদানের অন্তর্ভুক্ত। এই হেতু আজিও প্রবাদ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু গৌরী সেনকে বড় কেহ জানে না। তিনি কোনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন স্থানে তাঁহার ভিটা ছিল. সাধারণের নিকট তাহা অজ্ঞাত। যিনি প্রকৃত দানের মর্যাদা রক্ষা করেন না সংসারে তাঁহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'দয়ার সাগর' বলিয়া উক্ত হন, তিনি কত কোটী টাকা দান করিয়া গিয়াছেন? তিনি কোন্ রাজভাণ্ডার

বিতরণ করিয়াছেন?—তিনি কোটী কোটী টাকাও দান করেন নাই, তিনি সাম্রাজ্যও বিতরণ করেন নাই, তবে তিনি দয়ার সাগর কিরূপে হইলেন? কারণ, তিনি এমন দান করিয়া গিয়াছেন—যাহার সুফল দেশের নরনারী পুরুষপরম্পরায় ভোগ করিতেছেন। দুই একজন প্রবঞ্চক তাঁহার উদার হৃদয় এবং দয়ার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিলেও তিনি যখনই দান করিয়াছেন, উপযুক্ত পাত্রেই দান করিয়াছেন ; অনাথকে আশ্রয় দিয়াছেন, আতুরকে ঔষধ দিয়াছেন, অজ্ঞানকে জ্ঞান দিয়াছেন, দেশে শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃত অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিয়াছেন এবং সমাজপরিত্যক্তজনের প্রতি সহানুভূতি দান করিয়া দানধর্মের সার্থকতা সাধন করতঃ "দয়ার সাগর" নামে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে আজিও পূজা পাইতেছেন।

"দয়ার সাগরের" শত শত দান ও দয়ার কার্য লোকবিশ্রুত। উপযুক্ত পাত্র পাইলে যে তাঁহার দয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকটই পৌঁছিত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।* বিদ্যাসাগর মহাশয় একদা তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে বলেন—"দেখ কলুটোলার অমুক গলির অমুক নম্বর বাড়িতে এই নামে একজন মাদ্রাজবাসী আছেন। জানিয়াছি, তিনি অর্থাভাবে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। অতএব তুমি তথায় গিয়া সবিশেষ সংবাদ লইয়া আইস। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে কর্মচারী নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে গৃহস্বামীর দেখা পাইলেন। তাঁহার নিকটে উক্ত মাদ্রাজবাসীর নামোল্লেখ করাতে তিনি বলিলেন, "হাঁ! আমার বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহে তিনি সপরিবারে বাস করেন। আমি তাঁহার নিকটে ছয় মাসের ভাড়া ৩০ টাকা পাইব। তিনি উহা দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে ভাড়া পরিশোধ করিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছি, কিন্তু কি করি, তিনি অর্থাভাবপ্রযুক্ত আজ দুই তিন দিন সপরিবারে অনাহারে রহিয়াছেন।" কর্মচারী গৃহস্বামীর এই কথা শুনিয়া, উক্ত মাদ্রাজবাসীর

** রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় প্রণীত "প্রতিভায়" উদ্ধৃত "দৈনিক" পত্রে প্রকাশিত আখ্যান হইতে গৃহীত।*

নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি একটি সঙ্কীর্ণ গৃহে পাঁচটি কন্যা ও দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র লইয়া সামান্য দরমার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। পুত্রকন্যাগণ রুগ্ন ও অনাহারে শীর্ণ। কর্মচারী এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত মাদ্রাজবাসীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কহিলেন, "আমি এই কলিকাতা সহরে অনেক বড় লোকের নিকটে আমার কষ্ট জানাইয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমার দুরবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া একটি কপর্দক দিয়াও আমার সাহায্য করেন নাই। অবশেষে একটি বাবুর নিকটে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। তিনি ভিক্ষা না দিয়া, একখানি পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"এই সহরে এক পরম দয়ালু বিদ্যাসাগর আছেন। আমি তোমারই নামে তোমার দুরবস্থার বিষয় লিখিয়া দিলাম। পত্রখানি ডাকঘরে দিয়া আইস।" আমি তদনুসারে উক্ত পত্র ডাকঘরে দিয়াছি। এখন আমার অদৃষ্ট।" কর্মচারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে এই সকল কথা জানাইলেন। শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে ঐ কর্মচারী মহাশয়ের হস্তে মাদ্রাজবাসীর বাড়ি ভাড়ার দেনা ৩০ টাকা, খোরাকী ১০ টাকা এবং তাঁহাদের জন্য নয়খানি কাপড় দিয়া বলিলেন, "যদি তাহারা বাড়ি যায়. তাহা হইলে কত হইলে চলিতে পারে, জানিয়া আসিবে। আর এখানে থাকিলে আমি প্রতি মাসে ১৫ টাকা দিব।" কর্মচারী যথাস্থানে উপনীত হইয়া উক্ত মাদ্রাজবাসীকে টাকা ও কাপড় দিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা জানাইলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের অসীম দয়ায় দুঃখী মাদ্রাজবাসী স্ত্রীপুত্রের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "এক শত টাকা হইলে আমরা সকলে স্বদেশে যাইতে পারি।" ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্মচারীর হস্তে উক্ত টাকা দেন। কর্মচারীও তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে রাখিয়া আসেন। বদ্যান্যতা, অর্থ উড়াইয়া দিলেই হয় না। দান করিলেই পরের উপকার সাধন হয় না। অপাত্রে দান করিলে অধর্ম হয়। দানের উপযুক্ত পাত্র না পাইলে দান করিতে নাই। যাহারা বিশেষ সঙ্গত কারণে উপার্জনে অক্ষম, যথা অতিবৃদ্ধ, রুগ্ন প্রভৃতি অথচ অভাবগ্রস্ত, তাহারাই দানের পাত্র। দেশে অনেক সময় শ্রাদ্ধে দানসাগরের কথা শুনা যায়, অনেক স্থলে অন্নসত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এ

সকল শুনিতে বেশ এবং এতদ্দ্বারা অনেক প্রকৃত দানের পাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে কত কার্যক্ষম অথচ অলস প্রবঞ্চক অপাত্রও প্রতিপালিত হয় তাহার সংখ্যা নাই। ধনী দাতাগণ যদি অন্ধ, আতুর, নিরাশ্রয়, বিধবা এবং অনাথ বালকবালিকাদের আশ্রমের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তত্ত্বাবধানের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দেন, যাহাদের সামর্থ্য নাই তাহাদের বিনাব্যয়ে অর্থকরী শিক্ষাদানের উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রকৃত দানের ফলভোগী হন এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ধন্য হন। এ স্থলে একটি সত্যঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। পশ্চিমাঞ্চলবাসিনী কোন বঙ্গীয়া জননী একদা পাঠবিমুখ সন্তানকে তাড়না করিলে, সহসা কোন বর্ষীয়সীকর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। বর্ষীয়সী নবীনা জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছেলেকে দাঁতের বাড়ি দিয়াই মেরে ফেলবে দেখছি; তোমার ছেলেকে আর শাসন করতে হবে না, ও আমার মুখ্যু হয়ে বেঁচে থাক্, —লেখাপড়া না শেখে কাশী গিয়ে ছত্তরে খাবে—" ইত্যাদি। বালক পরে কি হইয়াছে জানি না, কিন্তু দানসত্র অন্নসত্র সম্বন্ধে এই সংস্কার নিতান্ত অবসাদময় এবং ভীতিজনক।

যে জ্ঞানগর্ভ দেবভাষা ও সাহিত্য, সৌন্দর্যে গাম্ভীর্যে অতুলনীয় এবং আর্যজাতির গৌরবের ধন সেই অমৃতময়ী সংস্কৃতের চর্চা এবং শিক্ষার অবনতি দেখিয়া মহামতি ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মর্মাহত হইয়াছিলেন। ইনি দরিদ্র অধ্যাপকের পুত্র ছিলেন ; কষ্টের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু কষ্টে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন না হইয়া অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার সহিত শিক্ষা করিয়া তাহাতে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণত্ব, হিন্দুত্ব এবং জাতীয় চিকিৎসা, জ্ঞান, নীতি এবং ধর্মশাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সেই সকলের পুনরুদ্ধার ও চর্চার নিমিত্ত স্বোপার্জিত ধন হইতে একলক্ষ যাট হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। একজন ভারতবাসী রাজকর্মচারীর এই দান অতুলনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

মোহিনীমোহন রায় হাইকোর্টের একজন প্রতিভাসম্পন্ন উকীল ছিলেন। তিনি ওকালতী করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। জগতে অনেক কৃপণের ঐশ্বর্যের অবধি থাকে না; কিন্তু তাহা খনিগর্ভস্থ সুবর্ণস্তরের

মত প্রেথিত থাকে ; কাহারও উপকারে আইসে না। উপযুক্ত হস্তে অর্থাগম হইলে, তাহা জগতের হিতার্থেই ব্যয়িত হয়। মোহিনীবাবু উপযুক্ত পাত্রে স্বোপার্জিত অর্থ দান করিয়া প্রকৃতদানের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাউথ সুবর্বণ স্কুলের গৃহ নির্মাণার্থ, ঢাকায় সারস্বত সমাজে, ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভায়, আলিপুর পশুশালা প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছোটলাট ও বড়লাট সভার সদস্য হইয়া এবং দেশের প্রত্যেক হিতকর কার্যের সহায়তা করিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে শেষ দানস্বরূপ এক লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করেন। এই টাকার উপস্বত্ব হইতে উপার্জনে অসমর্থ দরিদ্রদিগকে হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে মাসে এক টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপে দান করিয়াও তিনি নিজ উপার্জনে বার্ষিক একলক্ষ বিশ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি এবং নগদ দশলক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।*

সিংহলদ্বীপের দীনহীনের সন্তান মহাতা শৈসা,** সাধুতা, অধ্যবসায় এবং স্বাবলম্বনের বলে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কষ্টার্জিত ধন আপনার এবং পরিবারবর্গের সুখসম্ভোগের জন্য সমস্ত ব্যয়িত বা সঞ্চিত হয় নাই। তিনি বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু "দুই হাতে সর্বস্ব বিতরণ করিয়া দাতাকর্ণের" যশোলাভ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সকল দানের তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।

মরুটোয়া শৈসা কলেজ	বার্ষিক ব্যয়	২০,০০০
নিগম্বো ধীবর বিদ্যালয়	ঐ	২,০০০
পারাদেনীয়া কৃষি কলেজ ও কৃষিক্ষেত্রে	ঐ	১,০০,০০০
		১,২২,০০০

** হিতবাদী ১৩০৫, ১ লা আশ্বিন।*

*** পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ধর্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় লিখিত 'মহাতা শৈসা'র জীবনী হইতে সংগৃহীত।*

পূর্ব পৃষ্ঠার জের		১,২২,০০০
কলম্বোর তিনটি বালিকাবিদ্যালয়	বার্ষিক ব্যয়	৬,০০০
কলম্বো শৈসা কলেজ	ঐ	২৪,০০০
মরুটোয়া খৃষ্টগির্জা ও খৃষ্টসভা	ঐ	১৩,০০০
কলম্বো খৃষ্টসমাজ	ঐ	১০,০০০
কলম্বো, কাণ্ডি, অনন্তপুর ও গলবন্দরের রাস্তার জন্য	ঐ	৩,৫০০
কাণ্ডি কলেজ	ঐ	১,২০০
ত্রিন্‌কমলী বন্দরে দীনহীন যাত্রীদিগের দুঃখাপনোদন জন্য সভার সাহায্যার্থ	ঐ	২,৫০০
গলবন্দরে ঐ জন্য	ঐ	২,৫০০
বৌদ্ধ কাঙ্গালী সভায় দান	ঐ	১২,০০০
খৃষ্ট কাঙ্গালী	ঐ	১২,০০০
সমুদয় সিংহলের দরিদ্র খৃষ্টীয়দের জন্য পান্থশালায়	ঐ	৮,০০০
সিংহলীয় ভাষার উন্নতিকল্পে	ঐ	৬,০০০
খৃষ্টীয় পুস্তক প্রচার জন্য	ঐ	৬,০০০
কয়েকটি হাসপাতালের জন্য	ঐ	১,০০,০০০
সঙ্গীত কলেজে	ঐ	১২,০০০
দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়	ঐ	২,০০০
অনাথাশ্রমের জন্য	ঐ	১০,০০০
	বার্ষিক ব্যয়	৩,৫২,৭০০

এই দান ব্যতীত আরও অনেক দান করা সত্ত্বেও তিনি পুত্র কন্যার বিবাহে এক কোটী টাকা ব্যয় করেন এবং মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে নগদ দুই কোটী টাকা দিয়া এবং জমিদারি, কুঠি, আসবাবপত্র প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য রাখিয়া গিয়াছেন। মহারানীর পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা তাঁহার স্ত্রীর অঙ্গে এক কোটী টাকার অলঙ্কার দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"উহা বিলাতের

একজন বড়দরের লর্ডের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্।” তাঁহার শ্রাদ্ধে ভিখারীগণ তিনলক্ষ টাকার দান প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা শৈসার জয়ধ্বনিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল।

“নরওয়েবাসী ইমানুয়েল নোব্লের পুত্র আল্‌ফ্রেড নোব্ল্ যিনি বারুদ, গন্‌কটন্, নাইট্রোগ্লিসারিণ্. ডাইনামাইট, প্রভৃতি দাহ্য ও বিদারণশীল দ্রব্য এবং কৃত্রিম গটাপার্চা আবিষ্কার ও তাহার ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন—“আমি দেখিয়াছি যে, যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে অধিক ধনের অধিকারী হয় তাহারা সুখী হইতে পারে না। তাহারা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহারা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার অথবা স্বাবলম্বনের দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারে না, তাহারা অলস হইয়া পড়ে। সন্তানগণ যাহাতে জীবনের কর্মক্ষেত্রে জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাদিগকে শুদ্ধ তদুপযুক্ত অর্থ বা সম্পত্তি দিয়া অবশিষ্ট সমাজের হিতার্থ ব্যয় করা কর্তব্য।” নোব্লের আত্মীয়স্বজন সকলেই সম্পন্ন বলিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না দিয়া সমস্ত সম্পত্তিতে একটি সাধারণ অর্থভাণ্ডার করিয়া গিয়াছেন। তাহার আয় হইতে এক লক্ষ বিশ হাজার করিয়া পাঁচটি বার্ষিক পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তদনুসারে (১) পদার্থ বিজ্ঞানে (২) রসায়ন বিজ্ঞানে ও (৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানে বৎসর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়ার জন্য (৪) সাহিত্যের উন্নতিকল্পে উচ্চ আদর্শের কাব্য রচনার জন্য এবং (৫) বিভিন্ন জাতীয়দিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষাকল্পে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যের জন্য পাঁচ জন সর্বপ্রধান ব্যক্তি প্রতিবৎসর ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সুতরাং নোব্ল্ যাহা মুখে বলিয়াছিলেন, কার্যে তাহার সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা দান করেন, জমষেদজী নসরবান্‌জী তাতা, এণ্ড্রু কার্ণেগী প্রভৃতি যেরূপ রাজকীয় দান করিয়াছেন তাহা দানের আদর্শ তাহাতে সন্দেহ নাই। কার্ণেগী ১৮৯৯ অব্দে ৭৫ লক্ষ টাকা মার্কিনের অবৈতনিক পুস্তকালয় সমূহে এবং দশ লক্ষ টাকা তথায় অন্যান্য জনহিতকর কার্যে দান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসরের মধ্যে ১৮ কোটী টাকা দান করিয়াছেন।

সার হেনরি টেটএর “টেটগ্যালারি” দান, মিসেস্ রাইল্যাণ্ড কর্তৃক

ম্যাঞ্চেষ্টারবাসীদিগকে ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের গ্রন্থ্ সহিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা দান, লর্ড ষ্ট্রাথবোনের ম্যাক্‌গিল্‌ বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার নারীজাতীর উন্নতি বিধান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেশহিতকর বহুতর কার্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান, ডবলিন্‌ সহরের উন্নতি ও বিজ্ঞান-জগতের হিতকল্পে লর্ড আইভিগ্নের দান, জগদ্বিখ্যত বর্মিংহাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সার্‌ জোসায়া ম্যাসনের রাজোচিত দান এবং এইরূপ প্রসিদ্ধ জনহিতৈষিগণের বিরাট দান, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের দান সকল দেশের ও সকল জাতিরই আদর্শ।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রম

"ঋদ্ধির যে উচ্চাসন, লভি মহাজনগণ
রক্ষা করেছেন সযতনে।
সে আসন একদিনে, হঠাৎ মন্ত্রের গুণে
লব্ধ কভু ভাবিও না মনে।।
কিন্তু যবে তাঁহাদের, সহযাত্রী জীবনের
থাকিতেন সুখে নিদ্রাগত।
সেই সব মহাজন, হইয়া অনন্যমন
থাকিতেন রাত্রে শ্রমরত।।"

—*অনুবাদ*

"কর্ম কর (যেন আলস্য ধরে না)।
অঙ্গে যেন তব মরিচা পড়ে না।।"

কর্মগীতা হিন্দুপত্রিকা

জড় এবং চেতনে যে প্রভেদ, পরিশ্রমী এবং কর্মহীনে প্রায় ততই প্রভেদ। শ্রম ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না; প্রত্যেক কর্মেরই মূলে শ্রম। গ্রহ উপগ্রহ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিরাম ঘূর্ণন, প্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনশীলতা, এবং নিত্য সৃজন, ধ্বংসচেষ্টা ও গতি—শ্রম ও কর্মের গাথা নিয়ত গাহিতেছে। দিনযামিনী ইহাই বলিতেছে, শ্রম ব্যতীত কিছুই হয় না। জীবন ধারণ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়; স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে পরিশ্রম চাই; উপার্জন করিতে হইলে পরিশ্রম চাই; আত্মোন্নতি এবং জগতের উন্নতি ও

হিতসাধন করিতে হইলে পরিশ্রমের প্রয়োজন; পরিশ্রম ঋদ্ধিলাভের প্রথম এবং শেষ সোপান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কুত্রাপি অলসের স্থান নাই। চির-অলস, কর্মহীন-চিরনিদ্রিতের ন্যায়—জড়ের ন্যায়—মৃতের ন্যায়। কারণ কেবল শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া থাকিলেই যে জীবনধারণ করা হয়, তাহা নহে। কর্মক্ষেত্রে রাজচক্রবর্তী হইতে রাজপথসম্মার্জক পর্যন্ত, প্রতিভার অবতার হইতে স্থূলমতি কৃষক পর্যন্ত, সকলেরই পরিশ্রমে সমান অধিকার এবং যিনি এই গুণের অংশভাগী যত অধিক হইতে পারেন, তাঁহার উন্নতি, পদমর্যাদা এবং যশ তত অধিক হয়। প্রতিভা অমানুষিক পরিশ্রমক্ষমতা ও একাগ্রতার নামান্তর। আপনাপন কর্মক্ষেত্রে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ সাধারণ অপেক্ষা অত্যধিক শ্রম করিতে এবং এক বিষয়ে অবিচলিতভাবে লগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন। আদর্শ শিক্ষাগুরু রুগবী বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক আর্ণল্ড বলিতেন, "একের সহিত অন্যের প্রভেদ ধীশক্তিতে তত নির্ভর করে না যত কর্ম ও শ্রমশক্তিতে। যদি কাহারও আশা থাকে, তাহা হইলে, অকপট কর্মী এবং কঠোর শ্রমশীলের। অলসের আশা কখনই নাই।"

কি শারীরিক, কি মানসিক, উভয় শ্রমই সম্মানজনক। সকল দেশের পণ্ডিতগণই একবাক্যে শ্রমের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ভারতের শ্রীসম্পদের দিন কোন শ্রেণীর লোকই পরিশ্রম করিতে লজ্জাবোধ করিত না। রোমক প্রজাতন্ত্রের দিনে সমাজের শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম জনগণ স্বীয় ক্ষেত্র স্বয়ং কর্ষণ করিতেন। ভারতের শুভক্ষণেই রাজর্ষি জনক হলস্পর্শ করিয়াছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার জামাতা সম্রাট ফ্রেডরিক মুদ্রণশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র যুবরাজ হেনরী পুস্তক বাঁধাইএর কাজ শিখিয়াছিলেন, রুশসম্রাট মহামতি পিটার সূত্রধরের বেশে কামারের বেশে উমেদারী করিয়া বিবিধ শ্রমশিল্প স্বয়ং শিক্ষা করিয়া সেই সমুদয় প্রজাবর্গকে শিখাইয়াছিলেন! ইংলণ্ডে এমন অনেক সমাজপতি আছেন যাঁহারা, একসময়ে কামারশালের ধোঁয়া খাইতে খাইতে কালীবর্ণ হইয়া যাইতেন। যদি এদেশের ধনী, অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও মান্যব্যক্তিগণ, সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ সোপান হইতে অবতরণ করিয়া, দেশের কৃষি-শিল্প-ক্ষেত্রে স্ব, স্ব শক্তি নিয়োগ করেন, তাহা হইলে অতি অল্পদিনেই দীন ভারত সুদিনের মুখ দেখিতে

পায়।

নরওয়ে ও সুইডেনরাজের পুত্র রাজকুমার অস্কার বার্ণাডোট রবিবাসরীয় বিদ্যালয় খুলিয়া স্বয়ং বালকবালিকাগণকে নীতি ও ধর্মশিক্ষা দান করেন। রাজপুত্র যখন প্রজাবর্গের সন্তানসন্ততিগণকে স্বীয় সন্তান বোধে যত্নসহকারে শিক্ষা দেন, তখনকার দৃশ্য কি মনোহর—কি মহান! দেশের ছেলেদের নীতিশিক্ষার জন্য আমাদের রাজামহারাজগণ কবে মহামতি অস্কারের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবেন? তাঁহারা কি বিলাসশয্যা ত্যাগ করিয়া কঠোর নীতি বিদ্যালয়ে পদার্পণ করিবার এবং রাজবেশে শিক্ষকের পদে দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ দানের পরিশ্রম স্বীকার করিবেন?

জগতে কেহই হঠাৎ সমুন্নত এবং শ্রীসম্পন্ন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানের দ্বারে, যশের দ্বারে, হঠাৎ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। জ্ঞান, বিদ্যা, যশ, অর্থ সমস্তই শ্রমসাধ্য। কারণ এ সমুদয়ই 'ধন' বলিয়া পরিগণিত এবং শ্রম ব্যতীত ধন লাভ হয় না। 'শ্রম' এবং 'ধন' উভয়ে এমনি জড়িত যে, একের অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব সূচিত হয়। উভয়ের মধ্যে কার্যকরণ সম্বন্ধ। যেখানে ধন সেখানেই শ্রম। কারণ শ্রমই ধনের উৎপাদক।

শ্রমবিভাগ ও যৌথব্যবসায়

"ধনপতি হইতে সামান্য গৃহস্থের স্বার্থ এক সূত্রে জড়িত করিবার এবং বিপুল জনসঙ্ঘের সম্মিলিত শক্তি এক বিষয়ে নিয়োগ করিবার উৎকৃষ্ট

ক্ষেত্র—যৌথব্যবসায়।”

এক জনের পরিশ্রমকে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করার নাম শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগনীতি অনুসারে একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, সেই দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত হয়; অথবা কোন কর্ম এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন না করাইয়া, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক এক ভাগ এক এক জনকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমবেত শ্রমের ফলে সে কার্য সম্পূর্ণ হয়। এই শ্রমবিভাগনীতি প্রাচীন ভারতে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। হিন্দুসমাজ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বণ্টন করিয়া দেওয়ায়, এবং প্রত্যেক বর্ণ স্ব স্ব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করায় হিন্দুসমাজতন্ত্র পরিচালিত হইত। প্রত্যেক সংসার শ্রমবিভাগনীতি অনুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। একজন ব্যক্তিকে যদি অর্থোপার্জন হইতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়, ইন্ধনসংগ্রহ, রন্ধন, পরিবেশন, তৈজসপত্রাদি মার্জন, গৃহপরিষ্কার ও বস্ত্রধৌতকরণ, হিসাবরক্ষণ, ছিন্ন বস্ত্রাদি সীবন, সন্তানপালন, রোগিচর্যা প্রভৃতি সমস্ত করিতে হইত, তাহা হইলে সংসার অচল হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎপরিবর্তে গৃহের ভিন্ন ভিন্ন কাজকর্ম বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা এবং পরস্পরের সহযোগে সম্পন্ন হয় বলিয়া সুচারুরূপে সংসার চলিয়া যায়। শ্রমবিভাগ করিয়া এইরূপ সহযোগে কাজ করিলে, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ কার্য, অধিক সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়। বড় বড় কারখানা ও বাণিজ্যকুঠি প্রভৃতি দশ জনের অর্থ ও শ্রমনিয়োগে পরিচালিত হইয়া বিপুল ধন উৎপন্ন করে। যৌথব্যবসায়ের সৃষ্টি এই জন্যই হইয়াছে। ডাকবিভাগ শ্রমবিভাগের সুফল প্রতিপন্ন করিবার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি স্বকীয় খরচে লোক মারফৎ যথাস্থানে একখানি পত্র প্রেরণ করিতে হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে পত্র প্রেরণ করা হইত না এবং যে অধিক দূরে পত্র পাঠাইত, তাহাকে এত অর্থব্যয় করিতে হইত যে তদ্দ্বারা তাহার কয়েক মাসের খরচ চলিয়া যাইত। ফলকথা দূরদেশে পত্রাদি প্রেরণ সাধারণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইত

কিন্তু ডাকবিভাগ শ্রমবিভাগনীতিতে কার্য করায় অচিন্তনীয় অল্প ব্যয়ে কোটি কোটি পত্র পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে লইয়া যাইতেছে। এইরূপ কর্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই শ্রমবিভাজনে কার্যের শৃঙ্খলা হয়, ব্যয় অল্প হয় এবং আয় বৃদ্ধি হয়। একজনে যদি একলক্ষ টাকা এককালে খাটাইতে না পারেন তাহা হইলে, তাহাকে একশত অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এবং যদি শত ব্যক্তি অংশীদার হইয়া প্রত্যেকে এক এক সহস্র টাকার অংশ ক্রয় করেন, তাহা হইলে ঐ এক লক্ষ টাকা উঠিয়া যায়। তখন ঐ একশত ব্যক্তি একলক্ষ টাকা যদি কোন লাভজনক ব্যবসায়ে খাটান, এবং লভ্যাংশ প্রত্যেকে সমান অংশে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যৌথ ব্যবসায়ের অংশীদার বা সরিক বলা যায়। এক ব্যক্তির একসহস্র টাকায় যদি ৫০ টাকা লাভ হয়, তাহা হইলে একলক্ষ টাকায় তাঁহার শতগুণ লাভ হইয়া থাকে। লাভ মূলধনে যুক্ত করিয়া পুনরায় খাটাইলে একজন ১০৫০ টাকাই খাটাইতে পারেন ; কিন্তু যৌথব্যবসায়ীর দল, এককালে ১০৫০০০ টাকার উপর লাভ উঠাইতে সমর্থ হন। এক্ষণে ঐ একলক্ষ টাকার সরিকগণ যদি সংখ্যায় দশ সহস্র হইতেন, তাহা হইলে প্রত্যেকে দশটাকা করিয়া দিলেই চলিত। তখন প্রত্যেক অংশীদার মনে করিতে পারিতেন যে, তিনি দশটাকা মাত্র মূলধনে একলক্ষ টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতেছেন এবং তদুৎপন্ন লাভের অংশভাগী হইতেছেন ; এই সুবিধা হইতে যাবতীয় যৌথ বণিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে। রেলকোম্পানী, যৌথমহাজনী, খনি , কাগজ, কাপড়, দেশলাই, সাবান, পেন্সিল, লৌহঢালাই, ধাতু ও মৃৎবাসন, কাষ্ঠনির্মিত আসবাবপত্র এবং সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর কারখানা প্রভৃতি, জগতের নানা স্থানে নানা জাতির যৌথ বা মিলিত শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রায় সমস্ত যৌথকারবারই মধ্যবিত্ত লোকের সঞ্চিত অর্থেই প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে একজন ধনকুবের, একজন সামান্য গৃহস্থ অংশীদারের তুল্য সহযোগী অংশীদার। এক একটি যৌথকারবার যে হাজার হাজার টাকা মূলধনে চলিতেছে তাহার অংশীদারগণ হয়ত প্রত্যেক অংশের জন্য পাঁচ টাকা মাত্র দিয়াছিলেন!

এদেশে অন্যান্য স্থানের ন্যায় অধিক মূলধনের যৌথকারবার সংখ্যায় অধিক নাই ; তাহার কারণ, দেশ দরিদ্র। তথাপি প্রজাসংখ্যা এদেশে এত অধিক যে, সামান্য সামান্য অংশ মিলিত করিয়া কোটি কোটি টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সকলের মধ্যেই লোকে ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে, সাধুতার সহিত, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত, পরস্পর বিশ্বাসের সহিত, ধর্ম ও কর্তব্যবুদ্ধির সহিত, একযোগে কর্ম করিবার প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, সুখের বিষয়, শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকেই ইহার যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়াছেন এবং তাহারই ফলে দেশে কাপড়ের কল, সাবানের, কাচের, ইষ্টকের ও নানা দ্রব্যের কল-কারখানা এবং যৌথব্যাঙ্ক প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছে। যে কোনও যৌথকারবার শ্রমবিভাগ ব্যতীত চলিতেই পারে না। কারণ যাবতীয় সম্মিলিত অনুষ্ঠান শ্রমবিভাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। একজন সামান্য মুদিখানার দোকানদার একাকী দোকান চালাইতে পারেন এবং তাহাতেই তাঁহার ব্যয় লাঘব হয়। কিন্তু যদি কোন গোলদারী দোকানে অথবা বিবিধ পণ্যসামগ্রীর বড় দোকানে শত শত মণ এবং শত শত প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় হয়, ও প্রত্যহ শত শত খরিদদারের আগমন হয়, তাহা হইলে, দোকানের মালিক একাকী দ্রব্যাদির খরিদবিক্রয়, দোকান সুসজ্জিত করণ, হিসাব রক্ষণ, প্রত্যেকের ফরমাইস মত দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শন এবং সমুদয় যথাস্থানে পুনঃস্থাপন, কার্যসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার এবং তদুপরি নিজ সংসার পরিচালনা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় সহকারী, হিসাবরক্ষক, গোলদার বা বিক্রয়কারী, পত্রাদিলেখক, এবং অন্যান্য কর্মচারী ও দোকানঘর পরিষ্কার করিবার, দ্রব্যাদি পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত রাখিবার, বিলের টাকা আদায় করিবার, এবং দপ্তরের কর্মচারিগণের ফরমাইস খাটিবার জন্য ভৃত্যাদি প্রয়োজনমত সংখ্যায় নিযুক্ত করিতে হয়। একজনের কারবার চালাইতে যদি এইরূপ শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে কারবার শত শত অংশীদারের টাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধনে বিস্তারিতভাবে পরিচালিত হয়, তথায় শ্রমবিভাগ ব্যতীত চলিতেই পারে না। শ্রমবিভাগের প্রধান উপকারিতা এই যে, এতদ্বারা সময় নষ্ট হইতে পায় না। কারণ যে ব্যক্তি যে কার্য করে সে তাহাই করিতে থাকে এবং

সে কার্য ত্যাগ করিয়া কার্যান্তরে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে যে সময়ক্ষেপ হয় ও মনঃসংযোগের সূত্র ছিন্ন করিয়া নূতন কর্মে পুনরায় মনঃসংযোগ করিতে যে সময় নষ্ট হয়, পূর্বোক্ত উপায়ে তাহা হইতে পায় না। অথচ একই কার্য করিতে করিতে একজন সেই কার্যে তৎপর, স্বল্প সময়ে সম্পাদনক্ষম এবং সুচারুরূপে করিতে সমর্থ হয়। এমন কি সে বহুদর্শন দ্বারা সেই কার্য সরলভাবে, লঘুশ্রমে এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত নিষ্পন্ন করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিয়া লয়। অনেক বিকলাঙ্গ ও একবিষয়ে পারদর্শী নরনারী এবং বৃদ্ধ ও বালক শ্রমবিভাগনীতির কৃপায় জীবিকার্জন করিতে সমর্থ হয়। যে খঞ্জ সে একস্থানে বসিয়াই কোন কার্য করিতে পারে, যাহার হস্ত নাই সে কেবল বার্তাবহন করিতে পারে। শ্রমবিভাগনীতি মঙ্গলজনক বলিয়া যাবতীয় বিস্তৃত ব্যবসায় ও যৌথকারবার ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার হিতকারিতা উপলব্ধি করিয়া মহাজনসম্রাট পরোপকারী টমাস লিপ্টন কয়েক বৎসর হইল স্বীয় ব্যবসায় যৌথকারবারে পরিণত করিয়া আপনার কর্মচারীদিগকে তাহার অংশীদার করিয়াছেন। প্রত্যেক অংশের পূর্ণ মূল্য ১৫ টাকা এবং অগ্রিম ৪ টাকা ১২ আনা দিয়া অংশীদার হইবার নিয়ম ধার্য হয়। এত অল্প টাকায় অংশীদার হইয়া অত বড় কারবারের লাভের অংশভাগী হইতে কে না চাহিবে? সুতরাং ৭ দিনের মধ্যেই প্রায় ৭৫ কোটি টাকার অংশীদার জুটিয়াছিল। এই যৌথকারবারের নাম লিপ্টন কোম্পানী। "লিপ্টন কোম্পানী" যে কিরূপ চলিতেছে তাহা একটি দৃষ্টান্তদ্বারা অবগত হওয়া যায়। অন্যান্য শত পণ্য ব্যতীত শুদ্ধ লিপ্টনের "চা"র বাক্স খুলিয়া যে টিন বাহির হয় কেবল সেই টিন বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর ৭৫০০০ টাকা আয় হয়। যৌথকারবারের উপকারিতা অবধারণ করিতে হইলে বণিকশ্রেষ্ঠ মহাপতি তাতা প্রবর্তিত এম্প্রেস মিলের ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়।

এই মিলের* মূলধন ৫০০ টাকা হিসাবে ৩০০০ হাজার অংশে বিভক্ত হইয়া মোট ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য হয়। ১৮৭৭ সালে ১৫,৫৫২ থ্রসেল

** ১৩১২ সালের "মহাজনবন্ধু"র আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয় লিখিত নাগপুর এম্প্রেস মিল শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।*

(Throstle Spindle) ও ১৪,৪০০ মিউল চরকা (Mule Spindle) ও ৪৫০ টি তাঁত (Loom) লইয়া ইহার কার্যারম্ভ হয় এবং একটি ৮০০ ঘোড়ার ক্ষমতাশালী এঞ্জিনের দ্বারা উহা চালিত হয়। এই কোম্পানি নাগপুরে ২৬৪ বিঘা জমী খরিদ করিয়াছে। মিল, গুদাম, অফিস, কর্মচারীদের থাকিবার বাসস্থান, বিক্রয়ঘর, ধোলাই ও রঙ্গের কারখানা প্রভৃতি ৬৭৪৪৫৯ বর্গ ফুট (Square feet) জমীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থানে তুলার স্পিনিং ও প্রেস আছে। ইহার স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১৭,৯৬,০৭২ টাকা ইহার পুরাতন সমস্ত কল বদলাইয়া নূতন কল বসিয়াছে এবং এক্ষণে ইহার ৭৪৯২৪ Ring Spindle চরকা ও ১৩৮৪ টি Loom তাঁত আছে এবং দুইটি এঞ্জিন ২৪০০ ও ৩৭৫ I. H. P. ঘোড়ার শক্তিযুক্ত এবং "৮×৩০" ফুট ১২ টি ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার দ্বারা কলের কাজ চলিতেছে; ইহা ছাড়া নানা প্রকার ধোলাই করিবার, রঙ্গ করিবার ও ফিনিশ করিবার যন্ত্র আছে। এই সকল অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৪৪,৮৬,৮৪৯ টাকা। এই কলে প্রত্যহ ৪৩০০ ব্যক্তি কাজ করে। ইহার জিনিং ফ্যাক্টরিতে তুলার মরসুমের সময় প্রত্যহ ৪৩০ জন কুলী খাটে। তুলা খরিদ করিবার জন্য স্থানে স্থানে স্থাপিত ৬টি আড়তে ১২০ জন কর্মচারী কার্য করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য ভারতের স্থানে স্থানে ২৮ টি আড়ৎ স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৯ বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানী লাভের অংশ হইতে একত্রিশ লক্ষ সাতাশী হাজার পাঁচশত টাকা মূলধন বৃদ্ধি করিয়াছেন। অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ সুদের হিসাবে (Dividend) এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার তিন শত একাশী টাকা দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রিজার্ভ ফণ্ড, ইন্সিওরেন্স ফণ্ড, কর্মচারীদিগের পেন্সন ফণ্ড, প্রভিডেণ্ড ফণ্ড প্রভৃতিতে সর্বসমেত নগদ ৩৩ লক্ষ ২১ হাজার ১৮৪ টাকা মজুত আছে। প্রথম ২৮ বৎসরের মধ্যে এই কলে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৯ টাকা লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সাবেক মূলধনের ১৩ গুণ লাভ হইয়াছে। যাঁহারা প্রথমে ৫০০ টাকার এক একটি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার নূতন অংশ ও সুদ বাবদ ৯,২১৬ টাকা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ৫০০ টাকার অংশে ২০০০ টাকার নূতন অংশ পাইয়াছেন। একুনে বর্তমান বাজার দরে

প্রতি অংশের হিসাব ৪,৭৭৩ টাকা ও সুদ বাবদ ৪,৪৪৪ টাকা, মোট ৯,২১৬ টাকা (Dividend) পাইয়াছেন।

ধন ও অর্থ

"জীবন-সংগ্রামক্ষেত্রে অর্থই একমাত্র বিজয়াস্ত্র।" -বলিংব্রোক।

"অর্থ মুখমণ্ডলকে প্রফুল্লতার রক্তিম আভায় রঞ্জিত করে। অর্থাভাব মুখমণ্ডলের রক্তশোষণ করিয়া পাণ্ডুবর্ণ করিয়া দেয়, কিন্তু তখনি হাতে টাকার তোড়া দিলে সেই রক্তিমাভা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আইসে।"

ধনী হইবার পূর্বে, ধন কি জানা চাই। ধনী হইবার সাধ প্রায় সকলেরই, কিন্তু ধন কি, তাহাই অনেকে জানে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রম এবং ধন উভয়ে কার্যকারণ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ধন বলিতেই তাহার মূলে শ্রম সূচিত হয়। এই ধন প্রকৃত পক্ষে যে কি, তৎসম্বন্ধে লোকের সুস্পষ্ট ধারণা হওয়া আবশ্যক। সাধারণে অর্থ বা "টাকা-কড়ি"কেই ধন বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে "যশোধন," "বিদ্যাধন," "জ্ঞানধন," "গোধন," "ধান্যধন" এবং চলিত কথায় "ধন-দৌলত-টাকাকড়ি," প্রভৃতি শব্দের প্রচলন প্রাচীন সাহিত্যে থাকিত না এবং লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যাইত না। আজিও যেরূপ আমরা অর্থের দ্বারা গো, অশ্ব, ধান্যাদি ক্রয়

করিতেছি, প্রাচীনকালে তদ্রূপ লোকে গো, অশ্ব, ধান্যাদি দ্বারা গোধূম শর্করা, ঘৃতলবণাদি ক্রয় করিত এবং গোধূম, শর্করা, ঘৃতলবণাদি দ্বারা গো, অশ্ব, ধান্যাদি ক্রয় করিত, অর্থের সহিত কোন সংস্রবই তখন ছিল না। কারণ, পূর্বে এক প্রকার ধন দিয়া লোকে অন্য প্রকার ধন সংগ্রহ করিত। লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মাত্রেই ধন বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে ধান্যের দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রীত হইয়া থাকে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দেখা গিয়াছে,—গৃহলক্ষ্মীরা পুরাতন বস্ত্রের বিনিময়ে ধাতুনির্মিত ও পাথরের বাসন, বেতের এবং বাঁশের দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। ধান্য বহুকাল হইতে অর্থের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। এখন লেখাপড়া শিক্ষা করিতে হইলে বিদ্যালয়ে বা পাঠশালার গুরুমহাশয়কে অথবা গৃহ-শিক্ষককে বেতন স্বরূপ অর্থ দিতে হয় কিন্তু পূর্বে ধান্যের দ্বারা ঐ কার্য সাধিত হইত। এজন্য আজি কালি "ধান দিয়া লেখাপড়া শিক্ষার" কথা শুনা যায়। রহস্যচ্ছলে লোকে বলিয়া থাকে "আমরা কি ধান দিয়া লেখাপড়া শিখেছি?" ইহার অর্থ আর যাহাই হউক, এতদ্দ্বারা "আমরা যে আধুনিক উন্নত শিক্ষা-সভ্যতার সময়ের লোক" এই অভিমান সূচিত করে এবং বুঝায় যে ধান্য দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করা সেকালের গ্রাম্য লোকের প্রথা ছিল। সুতরাং ধন বলিতে কেবল অর্থই বুঝায় না। যাহা কিছু শ্রমসাধ্য অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাই ধন। শ্রম না করিলে বিনিময় সাধ্য কোন বস্তুই পাওয়া যায় না। কারণ যাহার জন্য কাহাকেও কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, লোকে তাহার বিনিময়ে কিছুই দিতে চাহে না। নদীতীরে যাহার বাস তাহার পানীয় জলের প্রয়োজন হইলে, সে যদি নদীতে গিয়া জল তুলিয়া আনে তাহাকে কিছুই দিতে হয় না। কিন্তু সে যদি দুই ক্রোশ দূরে থাকে এবং নিকটে জলাশয় না থাকে তাহা হইলে, হয় তাহাকে স্বয়ং আয়াস স্বীকার করিয়া জল তুলিয়া আনিতে হইবে, না হয় তাহাকে জল যোগাইবার জন্য কোন মজুরকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে, অথবা পারিশ্রমিকের মূল্যে জল ক্রয় করিতে হইবে। যে বায়ু অনায়াসলভ্য সেই বায়ু যদি যন্ত্র-সাহায্যে বোতলে ধরিয়া রাখা হয় এবং রসায়নাগারে তাহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, বায়ুরও মূল্য হয় এবং তাহা অর্থের বা অন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর

বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় জল ও বায়ু উভয়ই ধন বলিয়া বিবেচিত হইবে। যাহার নিকট কাষ্ঠ বা কয়লা বা লৌহ আছে, যদি সে তাহার বিনিময়ে অর্থ কিম্বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ কাষ্ঠ, কয়লা ও লৌহ তাহার ধন বলিয়া গণ্য হয় ; কিন্তু যদি ঐ কাষ্ঠ,কয়লা বা লৌহ কেহ অন্য বস্তুর বিনিময়ে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ঐগুলি ধনের মধ্যে গণ্য হইবে না। কেহ যদি মনে করেন যে, কোন দেশের ধন বলিলে তথাকার সঞ্চিত মণিমাণিক্য এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির সমষ্টি বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত। স্বভাবজাত অর্থাৎ কাঁচা মালমসলা শ্রমনিয়োগ দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করিলে, তাহা ধনে পরিণত হয়। সুতরাং খনিজ বা মৃত্তিকাদি মিশ্রিত লৌহাদি ধাতু যখন ভূগর্ভে থাকে তখন তাহা ধন নহে, কিন্তু তাহা পরিষ্কৃত করিয়া যখন খাঁটি লৌহে পরিণত করা হয় এবং যখন তাহার বিনিময়ে অর্থ, আহারীয় দ্রব্য বা যে কোন আকারেই হউক কোন প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন সেই লৌহ প্রভৃতি ধনে পরিণত হয়।

কলকারখানা রেলগাড়ি, ষ্টীমার প্রভৃতি যখন ছিল না, যখন জঙ্গলের কাষ্ঠ দ্বারাই লোকের রন্ধনাদি হইত, তখনও দেশে কয়লার খনি ছিল, কিন্তু তাহার ব্যবহার ছিল না। প্রয়োজন ছিল না বলিয়া তাহা ধূলামাটির মত মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত ছিল। যদি তখন কেহ কিছু কয়লা, খনি হইতে তুলিয়া কাহারও বাড়ি দিয়া আসিতে চাহিত, হয়ত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি উহা জঞ্জাল বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিত। কিন্তু দেশে যখন কল-কারখানা রেল ষ্টীমার প্রভৃতির আমদানি হইল, এবং বাষ্প তৈয়ার করিতে ও লৌহাদি ধাতু গলাইবার উপযোগী বেশী আঁচের জন্য কয়লার প্রয়োজন হইল তখন সকলে কয়লার প্রয়োজন বুঝিল, এবং লোক খাটাইয়া রানীগঞ্জ, বরাকর গিরিডি প্রভৃতি স্থানের মাটি খুঁড়িয়া পাথুরে কয়লা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিল। পূর্বে যাহা জঞ্জাল ছিল তাহাই এখন ধনে পরিণত হইল। কিন্তু এই ধন উৎপন্ন করিবার পূর্বে অনেক মজুর খাটাইতে হইয়াছে এবং জমির ইজারা লইয়া, তাহার সংস্কার, মাল সরবরাহ এবং রক্ষণাবেক্ষণাদিতে বিলক্ষণ শ্রম করিতে হইয়াছে। গঙ্গার ধারে যাহাদের বাস, তাহাদের নিকট গঙ্গাজলের সহিত অর্থের বিনিময় চলে না। কারণ

তাহারা বিনামূল্যে গঙ্গাজল পাইতে পারে, কিন্তু গঙ্গাহীন প্রদেশে বা গঙ্গা হইতে দূরস্থ হিন্দুপল্লীতে ইহা পণ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রয়াগ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে দেখা গিয়াছে গঙ্গা যমুনার জল লোকে ঘড়ায় ভরিয়া ঠেলাগাড়ি করিয়া লইয়া গিয়া দূরস্থ হিন্দু সহরবাসীদিগকে বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ করে। এই বিনিময় হেতু তথায় গঙ্গা ও যমুনার জল ধন বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং মুদ্রাকেই ধন বলে না অথবা বস্তুবিশেষকেই ধন বলে না, কিন্তু যাহার বিনিময় চলে তাহাই ধন। এতদ্বারা বেশ জানা যাইতেছে যে ধন বলিতে কেবল অর্থ বা মুদ্রা বুঝায় না কিন্তু অর্থ বা মুদ্রা বলিলেই ধন বুঝায়। বর্তমান মুদ্রাই প্রধান ধন, কারণ ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক বিনিময়সাধ্য। সকল সভ্যদেশে রাজা বা রাজতন্ত্র কর্তৃক মুদ্রার বিনিময়শক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় সকল প্রকার ধনই মুদ্রা অপেক্ষা হীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মুদ্রার বিনিময়ে অন্নবস্ত্র সংগৃহীত হয়। মুদ্রার বিনিময়ে সকলপ্রকার পরিশ্রম ও শ্রমজাত দ্রব্য ক্রয় করা যায়। রাজস্ব মুদ্রায় প্রদান করিতে হয়। রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রার মূল্য নিরূপিত হওয়ায়, উহা সকল প্রকার পণ্য বিনিময়ের মধ্যস্থ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। রামের ধান্য, শ্যামের বস্ত্র ও যদুর কাষ্ঠ আছে। রামের বস্ত্র, শ্যামের কাষ্ঠ ও যদুর ধান্যের প্রয়োজন — কিন্তু রামের কাষ্ঠের, শ্যামের ধান্যের ও যদুর বস্ত্রের প্রয়োজন নাই সুতরাং রাম ধান্যের বিনিময়ে শ্যামের নিকট বস্ত্র লইতে গেলে শ্যাম বলিবে -"আমার ধান্যের প্রয়োজন নাই, যদি তোমার কাষ্ঠ থাকে তাহা হইলে বস্ত্র দিয়া কাষ্ঠ লইতে পারি।" শ্যাম কাষ্ঠের জন্য বস্ত্র লইয়া যদুর নিকট গেলে বলিবে -"আমার বস্ত্র চাই না কিন্তু যদি কাষ্ঠ লইয়া ধান্য দিতে পার তাহা হইলে চলে, অন্যথা আমাকে রামের নিকট যাইতে হইবে।" কিন্তু রামের কাষ্ঠের প্রয়োজন নাই বলিয়া সে যদুকে ধান্য দিতে পারিল না। অতএব প্রয়োজন অভাবে রাম, শ্যাম ও যদু তিনজনকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে - কে ধান্য লইয়া বস্ত্র দিতে, বস্ত্র লইয়া কাষ্ঠ দিতে ও এবং কাষ্ঠ লইয়া ধান্য দিতে পারে। সুতরাং তিনজনকেই অন্বেষণ কার্যে বিলক্ষণ সময় ব্যয় ও শ্রম করিতে হয়, এবং যে মূল্যপরিমাণ বস্ত্র রামের আবশ্যক রামকে সেই মূল্যপরিমাণ ধান্য , শ্যামকে প্রয়োজনীয়

পরিমাণ কাষ্ঠের মূল্যে তুল্য মূল্যের পরিমাণ বস্ত্র এবং যে পরিমাণ ধান্যের প্রয়োজন তাহার মূল্যপরিমাণ কাষ্ঠ যদুকে বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। এই যে বহনের অসুবিধা তাহা ত আছেই, তদ্ব্যতীত কি পরিমাণ এক দ্রব্য কি পরিমাণ অন্য দ্রব্যের তুল্য হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই জন্য যে দ্রব্য সকল সময়ে এবং সকল স্থানে মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত এবং লঘু অর্থাৎ সহজে বহনীয়, এবং যাহা ক্ষয়শীল নহে ও সর্বত্র সর্বকালে বিনিময়সাধ্য তাহাই সকলের বাঞ্ছনীয় অথবা বাসনার ধন। সেই কারণেই সকলে সকল বস্তুর বিনিময়ে আগ্রহের সহিত অর্থ বা রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা গ্রহণ করিতে চাহে। এই হেতু রামের কাষ্ঠের প্রয়োজন না হইলেও অর্থের প্রয়োজন আছে; কারণ সেই অর্থে শ্যামের নিকটে সে বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে, শ্যাম সেই অর্থদ্বারা যদুর নিকট হইতে কাষ্ঠ ক্রয় করিতে পারিবে, এবং সেই অর্থের বিনিময়ে শ্যামের নিকট ধান্য ক্রয় করিতে পারিবে। এস্থলে দেখা যাইতেছে রাম, শ্যাম যদু তিনজনেরই এই শ্রেষ্ঠ ধন অর্থের সমান প্রয়োজন, কারণ, কেবল এই অর্থের বিনিময়ে যাহার যে বস্তু প্রয়োজন সেই বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুদ্রা নানাপ্রকার - সুবর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা ও নিকেল মুদ্রা। ইহা ব্যতীত এক, আড়াই, পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ, শত, পাঁচ শত, সহস্র এবং পাঁচসহস্র টাকার নোট প্রচলিত আছে। নোট কাগজের অর্থ হইলেও রাজার অঙ্গীকারসম্বলিত বলিয়া উহার বিনিময়ে রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায় অথবা ঐ মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়। এই কারণে কাগজের নোট সুবর্ণাদি মুদ্রার সমতুল্য এবং ঠিক তদ্রূপই বিনিময়সাধ্য।

সংসারে অর্থ অপরিহার্য এবং সকল ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া ইহা সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে লোকে বাধ্য। এমন অন্য একটি দ্রব্য নাই যাহাদ্বারা জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ হয়, কিন্তু এক মুদ্রার বিনিময়ে সমস্তই প্রাপ্তব্য। এই জন্য ইহার এত শক্তি। এই মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। ইহা মূর্তিমতী স্বাধীনতা এবং শক্তি। বুলওয়ার বলিয়াছেন, "টাকা কড়ির বিষয় কখন লঘুভাবে দেখিবে না - অর্থই চরিত্র।" এই অর্থ কাহারও সুহৃদের কার্য করে, কাহারও শত্রুর কার্য করিয়া থাকে। অর্থের সদ্ব্যবহার অথবা অপব্যবহার অনুসারে ইহা শত্রু মিত্রের স্থান

অধিকার করে। - বদান্যতা, মহত্ত্ব, ন্যায়পরতা, সততা, পরিণামদৃষ্টি প্রভৃতি মানবের অনেকগুলি সদ্‌গুণ, অর্থের যথাযথ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে, অর্থের অযথা ব্যবহার, লোভ, কার্পণ্য, অবিচার, অতিব্যয়শীলতা, অপরিণামদর্শিতা, নীচ আমোদপ্রিয়তা, আলস্য এবং আরামপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক জঘন্য প্রবৃত্তি এবং নানা অপকৃষ্ট দোষের আকর স্বরূপ হয়। চরিত্রবল না থাকিলে কেবল অর্থ কোন মহৎকার্য সাধন করিতে সমর্থ হয় না। অর্থ নানা প্রকারে সহায়তা করে বটে, কিন্তু অর্থ একাকী কিছুই করিতে পারে না। অর্থ উপযুক্ত হস্তে পতিত হওয়া চাই। অর্থের শক্তি সম্বন্ধে অনেকে অতিশয়োক্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমাজের শীর্ষ স্থানের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন তাঁহারাই মনে করেন জগতে যদি কিছুর প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা একমাত্র অর্থ। এই শ্রেণীর অনেকের নিকট অর্থ দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া থাকে। প্রাকৃত জনের নিকট লোকের মূল্য তাহার আয় বা সঞ্চয়ের পরিমাণের উপর ধার্য হয়। তাহাদের মুখেই শুনা যায়-"অমুকের পুঁজি কত?" "অমুকের বিষয় সম্পত্তি কি?" কেহ যদি বলে "অমুক অতি মহাশয় ব্যক্তি" অতি "ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি"; তাহা হইলে কেহই তাহাতে কর্ণপাতও করিবে না। কিন্তু যদি সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে "অমুক লক্ষ টাকার মালিক" "অমুক কোটীপতি" "অমুক বিস্তর বিষয় আশয় করিয়া লইয়াছে" তাহা হইলে যতক্ষণ না সেই অর্থশালী দৃষ্টির বহির্ভূত হইবে ততক্ষণ সে ব্যক্তি সকলের লক্ষ্য হইবে। রেভারেণ্ড মিঃ গ্রীফিৎস্ বলিতেন, যদি টাকায় মানুষ মানুষকে বিস্মৃত না হইত, আর যদি কর্তাগণ কর্মচারীদিগের সহিত অধিক ঘনিষ্ট হইত, তাহা হইলে সংসারের অনেক অহিত এবং পাপ রহিত হইয়া যাইত।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে অর্থই শ্রেষ্ঠধন। এক্ষণে বুঝিতে হইবে ইহা বিনিময়সাধ্য বলিয়াই ধন বলিয়াই গণ্য, কিন্তু বিনিময় কার্য সাধন করিতে না পরিলে যে তাহার কোনই মূল্য নাই তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে। আমার নিকট টাকা আছে কিন্তু চাউল নাই। একজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল আছে। আমি কোন সময়ে শ্রম বিনিময়ে বা উদ্যানজাত ফলের বিনিময়ে কিছু টাকা উপার্জন করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই টাকা দিয়া

তাহার বিনিময়ে চাউল লইতে চাহি। এখন সে টাকা চলে না, সুতরাং সে ব্যক্তি চাউল দিয়া টাকা লইতে অস্বীকার করিতেছে। তাহার গোধূমের প্রয়োজন কিন্তু আমার তাহা নাই। এদিকে আমার টাকা আর কেহই লইতে চাহে না। এ ক্ষেত্রে টাকা আমার নিকট মুক্ত বায়ু বা নদীর জল অথবা মাঠের ধূলার মত। উহা আর আমার নিকট ধন নহে। একদা এক বৃদ্ধ বণিক বহুমূল্য মুক্তার থলি লইয়া এক মরুভূমির উপর দিয়া যাইতেছিলেন। দুই দিন অনাহারে গমন করিতে করিতে পথশ্রান্তি এবং রৌদ্রতাপে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি আর একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না, কিন্তু কোথাও কোন জলাশয় অথবা বৃক্ষ না থাকায় অতি কষ্টে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। বণিক অবশেষে অসহ্য যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন এবং অতি যত্নের সেই মুক্তার থলিটি ভারবোধ হওয়ায় মস্তক হইতে নামাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এবং থলি হইতে সেই বহুমূল্য মুক্তাগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়, এই এক একটি মুক্তা যদি এক একটি চণক হইত, তাহা হইলে আজ আমায় এই জনমানবহীন উত্তপ্ত বালুকাময় প্রদেশে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। যাহাকে বহুমূল্য বোধে এতদিন মাথায় করিয়া রাখিয়াছিলাম আজি দেখিতেছি তাহা এই মরুভূমির বালুকণা অপেক্ষা কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে!"

বর্তমান বা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনাভাবে অর্থ যে মরুভূমির বালুকণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু সংসারে অর্থের এতই প্রয়োজন হইয়াছে এবং দিন দিন ইহার আবশ্যকতা এরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এক্ষণে অর্থপূজাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিলেও প্রাচীন ভারতের সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসীর "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যং" বচনে আর আমরা সায় দিতে পারি না। অর্থোপার্জন ও অর্থব্যবহারে যাঁহারা জগতের সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়া ধনেশ্বর বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে জনৈক প্রতিভাশালী অর্থনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন-"এই জীবনসংগ্রাম-ক্ষেত্রে অর্থই আমাদের একমাত্র বিজয়াস্ত্র।"

মূলধন

যে ধন অন্য ধনোৎপাদনের ও ধনবৃদ্ধির মূল, তাহার নাম মূলধন। মূলধনকে চলিত কথায় "পুঁজি" বলে। ধন কাহাকে বলে, পূর্বে উক্ত হইয়াছে; স্বভাবজাত দ্রব্যসামগ্রী লোকে পরিশ্রম দ্বারা সংগ্রহ করিলে এবং প্রয়োজনসাধক করিয়া লইলে, তাহা ধনে পরিণত হয়। সর্বপ্রকার ধনই এইরূপ মানুষের পরিশ্রমের ফল। কিন্তু, যাহারা পরিশ্রম করিবে, তাহারা উদরে অন্ন না দিয়া, অঙ্গে বস্ত্র না দিয়া কিরূপে বাঁচিবে এবং না বাঁচিলে পরিশ্রম কে করিবে? অতএব শ্রমিকগণকে অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে এবং তজ্জন্য যে ব্যক্তি প্রতিপালন করিবে তাহাকে পূর্বশ্রমজাত উৎপন্ন বস্তুর সমুদয় ব্যয় না করিয়া কিয়দংশ সঞ্চয় করিতে হইবে। এই সঞ্চিত বস্তুর বিনিময়ে শ্রমিকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে। সুতরাং এই সঞ্চিত বস্তুই মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইবে। ধন উৎপাদন করিবার তিনটি উপকরণ আছে, যথা.,—শ্রম, স্বভাবজাত দ্রব্যসামগ্রী (যৎপ্রতি শ্রম নিয়োজিত হয়) এবং মূলধন (অর্থাৎ বর্তমান বা ভবিষ্যতে অন্য ধন উৎপন্ন করিবার জন্য যাহারা শ্রম করে তাহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত পূর্বশ্রমজাত সঞ্চিত ধন বা পুঁজি বা সংস্থান)। এই যে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে প্রায়ই দেখা যায় "অমুক ব্যাঙ্কের (৪০,০০,০০০) চল্লিশ লক্ষ টাকা মূলধন" বা অমুক কোম্পানী এক কোটী টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন," "অমুক যৌথ কারবার প্রথমে লক্ষ টাকা 'মূলধনে' আরম্ভ হয়, এক্ষণে সেই মূলধন বৃদ্ধি হইয়া এক কোটী তে দাঁড়াইয়াছে" ইত্যাদি। ইহার অর্থ কি? এ মূলধন কি? এখানে মূলধন বলিতে দশজনের সঞ্চিত অর্থ বা ধন যাহা লাভের আকারে নূতন অর্থ বা ধন উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যাঙ্কের কাজে বা

ব্যবসাবাণিজ্যে খাটান হয়। সুতরাং সাধারণতঃ সঞ্চিত ধনকেই মূলধন বলে।

একজন কৃষক বা জোতদার যদি তাহার শস্য বিক্রয় করে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধেক শ্রমিকদিগের বেতন দিতে ও হলকুদালাদি যন্ত্র বা কলকারখানা ক্রয় করিতে ব্যয় করে এবং অপর অর্ধেকে ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করে, তাহা হইলে প্রথম অর্ধেকই তাহার মূলধন বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ ঐ প্রথম অর্ধেক নূতন ধন উৎপাদন করিবার সহায়তা করে এবং দ্বিতীয় অর্ধেকের বিনিময়জাত ভোগ্য বস্তু নূতন ধন উৎপন্ন করেই না বরং উহাই ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। সঞ্চিত ধন যদি সঞ্চিতই থাকিয়া যায়, তাহা হইলেও তাহাকে মূলধন বলা যায় না। সঞ্চিত ধন খাটাইলে তবে তাহা মূলধনের কার্য করে। খাদ্য যদি অভক্ষিত থাকে, কলকারখানা যদি ব্যবহার করা না হয়—তাহা হইলে সে সমুদয় অন্য ধন কিরূপে উৎপন্ন করিবে? সে অবস্থায় উহাদিগকে মূলধনের মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কারণ উহা সঞ্চিত ধন হইলেও প্রয়োজনসাধন না করায় মূলধনের কার্য করে না। সঞ্চিত ধন যেরূপেই হউক খাটাইতে পারিলেই কোন না কোন ব্যক্তির উপকারে আইসে। রাজা কোম্পানীর কাগজের বিনিময়ে প্রজার নিকট হইতে যে নগদ টাকা গ্রহণ করেন, খরিদকারী একদিকে সেই টাকার সুদ পাইয়া লাভবান হন এবং অপরদিকে নগদ টাকায় রাজা কর্মচারী কুলী মজুর প্রভৃতিকে বেতন দিয়া রাজ্যের প্রয়োজনমত রাস্তাঘাট, সেতু, রেল প্রভৃতি নির্মাণ করান এবং তাহাতে বাণিজ্যের সুবিধা হয়, নানা স্থানের পণ্যদ্রব্য সকল স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হয় এবং শ্রমিকগণের অন্নসংস্থান হয়। ব্যাঙ্কের টাকাও এইরূপে দেশের ধনাগম এবং ব্যক্তিগত উপকারসাধনে সহায়তা করে। সুতরাং তাহাও মূলধন।

মূলধন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট নহে ; কারণ, সকল মূলধনের মূলে যে প্রকৃত মূলধন আছে তাহার কথা বলা হয় নাই। উহার নাম চরিত্র। কেহ বিজ্ঞাপন দিলেন, "দশকোটী টাকা মূলধন লইয়া আমরা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম।" ইহা শুনিতে বেশ। দশ কোটী টাকা! —এত মূলধনে কারবার কখনই নষ্ট হইবে না। কিছু কাল পরে শুনা গেল—"সেই

যে যাহারা দশকোটী টাকা মূলধনে একটি কারবার খুলিয়াছিল—অল্পদিন হইল তাহারা দেউলিয়া হইয়াছে।” “আহা কত লোকের যে সর্বনাশ হইল, কত বিধবা সম্বলহীন হইল তাহার সংখ্যা নাই!” —কেন এমন হইল? প্রথমে নানা লোক নানা প্রকার কারণ প্রদর্শন করিল। কেহ বলিল, “সেই যে উহাদের পণ্যভরা জাহাজগুলা জলমগ্ন হয়—ইহা তাহারই পরিণাম।” ক্রমে প্রকাশ পাইল, কর্তারা ত কেহ দেখিতেন না; কে কি ক্রয় করে, কে বিক্রয় করে, কে হিসাব রাখে, কেহ কোন লক্ষ্যই রাখিতেন না। পরে জানা গেল, জলমগ্ন বলিয়া প্রকাশ পাইলেও জাহাজগুলা প্রকৃত পক্ষে নষ্ট হয় নাই, কিন্তু কর্তাদিগের মধ্যেই কয়েকজন অসদুপায়ে সে সমুদয় বিক্রয় করিয়া আপনারা ধনেশ হইয়াছেন। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল, সকলের চক্ষু যতই উন্মীলিত হইতে লাগিল, ততই নানা অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে প্রতিপন্ন হইল যে, কতিপয় চরিত্রহীন ব্যক্তি এই বিপুল অর্থের সদ্ব্যবহারে অসমর্থ হইয়া, অর্থাৎ প্রকৃত মূলধন চরিত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া, ভীষণ সর্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস যাহার মূলধন নাই, চাকরীই তাহার একমাত্র উপজীবিকা। এ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। আর্থিক মূলধন নাই, শিক্ষা নাই, সুপারিশ নাই, ধনী আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহায়তা নাই, এমন অবস্থায় এই জীবন-সংগ্রামের দিনে জীবিকার্জনই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি কেহ কোটীপতি হইতে সমর্থ হন, জনসাধারণের দৃষ্টি কি তাঁহার উপর পতিত হয় না? অবশ্যই হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলে ঈর্ষা বা বিদ্বেষ দৃষ্টি এবং সন্দেহের কুটিল কটাক্ষ তৎপ্রতি পতিত হয়! ব্যবসায়বুদ্ধিশূন্য, অনভিজ্ঞ এবং গুণগ্রহণে অশক্ত ব্যক্তিগণ মনে করিয়া থাকে, অন্যের অপরিজ্ঞাত অসদুপায় অবলম্বনে কিম্বা, শুদ্ধ অদৃষ্ট বলেই তাহার সমূহ উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। সত্যনিষ্ঠা, অকপট ব্যবহার, অবিচলিত অধ্যবসায়, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং মিতব্যয়িতা অভ্যাস যাঁহাতে আছে, বালক হইলেও তিনি প্রবীণ, দরিদ্র হইলেও তিনি ধনী। সরস্বতীর কৃপা তাঁহার উপর না থাকিলেও, কমলার কৃপা হইতে তিনি

কখনই বঞ্চিত হয়েন না।আর্থিক মূলধন লইয়া জগতের কয়জন কোটীপতি মহাজনকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে শুনা গিয়াছে? স্বাবলম্বন আত্মত্যাগ এবং উচ্চাভিলাষের সহিত যদি দৃঢ়চিত্ততা এবং শ্রমশীলতা সংযোগ হয়, তাহা হইলে কি বাণিজ্যক্ষেত্র, কি শিল্পসাহিত্য-বিজ্ঞান এমন কি জীবনের যে কোন কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়,--তাঁহারাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা দরিদ্রের গৃহে বা সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহাদের প্রায় কাহারও আর্থিক মূলধন ছিল না ; কিন্তু যাঁহাদের সকলেরই প্রকৃত মূলধন চরিত্রবল ছিল। এই চরিত্রই মূলধন, ইহাই উৎকৃষ্ট সুপারিশ, ইহাই অদৃষ্ট।

মহাজনি

যাহারা নিয়মিত সুদে টাকা ধার দেয় তাহাদিগকে মহাজন বলে। মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থ অপরকে ধার দিয়া সুদ আদায় করে এবং সুদে ও আসলে মূলধন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে থাকে ও সেই বর্দ্ধিত মূলধন পুনরায় সুদে খাটায়। এই ব্যবসায়কে মহাজনি বলে। মহাজনের ব্যবসার স্থানকে কুঠি বা গদি বলে। পূর্ব্বে এদেশে যৌথকারবারের প্রথা না থাকায় পাঁচ জনের মিলিত মূলধন লইয়া এরূপে খাটান হইত না, সুতরাং যে মহাজন, সে নিজেরই টাকায় কুঠি চালাইত। অপর কেহ অংশীদার থাকিত না। সেইজন্য মহাজনসমিতি বা সম্প্রদায়ের বা যৌথমহাজনির সৃষ্টি হয় নাই। য়ুরোপীয়

মহাজনি প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এদেশে "যৌথমহাজনি" বা "ব্যাঙ্কিং"এর সৃষ্টি হয়। ইহাদের কুঠি বা গদির নাম "ব্যাঙ্ক।" সকল দেশেই সংগ্রাম বহুদিনব্যাপী হইলে লোকজনের প্রাণনাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায় ; বাড়ি, ঘর, পথ, ঘাট, উদ্যান, শস্য-ক্ষেত্র, ক্ষেত্রকর্মোপযোগী এবং ভারবাহী পশুসকল সমস্ত নষ্টপ্রায় হইয়া যায়, এবং যাহা কিছু অনিষ্ট হইতে অবশিষ্ট থাকে, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে তাহা সম্পন্ন হয়। দেশের নষ্টশ্রী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে ও বিপদগ্রস্ত প্রজাবর্গের রক্ষা বিধান করিতে তখন রাজার চেষ্টা হয়। কিন্তু তজ্জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, অথচ, রাজকোষে যদি যথেষ্ট অর্থ না থাকে তাহা হইলে রাজ্যকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এবং রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, ঋণ গ্রহণ করিলেই নির্দিষ্ট হারে উত্তমর্ণকে সুদ দিতে হয়। পাঁচশত সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে একবার ভেনিসরাজের এইরূপ অবস্থা হয়। তখন মন্ত্রিগণের পরামর্শে তিনি প্রজার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভা স্থির করেন যে, যাঁহার আয় একশত টাকা, তিনি একটাকা রাজাকে ধার দিবেন ; এবং যদি তিনি একশত টাকা ধার দেন তাহা হইলে একশত পাঁচ টাকা পাইবেন। এইরূপে রাজাজ্ঞায় প্রত্যেক প্রজা আয়ের উপর শতকরা একটাকা হিসাবে ধার দিয়া শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ প্রাপ্ত হন। ভেনিসাধিপতি প্রজাদের টাকা যেমন ঋণস্বরূপ লইয়া রাজকার্যে ব্যয় করেন, তেমনি তাঁহাদিগকে ঐ টাকা দাবী করিবার স্বত্ব প্রদান করেন এবং সেই স্বত্ব ইচ্ছামত হস্তান্তর করিবারও অধিকার দেন। এই অধিকারসূত্রে কোন ব্যক্তি রাজাকে পাঁচশত টাকা ঋণ দান করিলে, তিনি রাজার নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ে ৫২৫ টাকা পাইবার অধিকারী হয়েন। তাঁহার যদি ঐ পাঁচশত পঁচিশ টাকার প্রয়োজন হয় এবং রাজা তখনই তাহা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ঐ টাকা দিতে প্রস্তুত তাঁহার নিকট হইতে নগদ ৫২৫ টাকা লইয়া তাঁহাকে রাজার নিকট হইতে তিনি উক্ত টাকা আদায়ের স্বত্ব বা অধিকার বিক্রয় করিতে পারেন। এই অর্থ ব্যবহার ক্রমে 'ব্যাঙ্ক' নামে অভিহিত হইতে থাকে এবং ইহা সমগ্র য়ুরোপে বিস্তার লাভ করে। ক্রমে এই প্রথা অবলম্বন করিয়া কোন কোন বেসরকারী ব্যক্তি দাবী করিবার স্বত্ব এবং সেই স্বত্ব হস্তান্তর করিবার অধিকারের

বিনিময়ে অর্থ লইয়া অপরকে ঋণদান করিতে থাকেন। ইহাদের মহাজন বা ব্যাঙ্কার বা বণিক বলে। যুরোপীয় প্রথায় এইরূপ কতিপয় মহাজন মিলিত হন এবং যাঁহাদের নগদ টাকা আছে, কিন্তু তাহার উপস্থিত ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, অথচ, তাহা ধার দিয়া সুদে বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের নিকট হইতে অল্প সুদে কর্জ লইয়া, যাঁহাদের এখনই নগদ টাকা খাটাইবার প্রয়োজন, অথচ টাকা হাতে নাই, তাঁহাদিগকে অধিকতর সুদের হিসাবে ঋণদান করেন। মহাজন কেবল ঋণদান করিয়াই সুদের দ্বারা লাভবান্ হন ; কিন্তু মহাজন সম্প্রদায় ঋণ গ্রহণ করিয়া, ঋণদান করেন এবং উত্তমর্ণকে অল্প সুদ দিয়া ও অধমর্ণের নিকট হইতে অধিক সুদ লইয়া লাভবান হন ; "দাবীর স্বত্ব" বিক্রয় করিয়া সস্তাদরে অর্থ ক্রয় করেন এবং সেই অর্থ অধিক দরে বিক্রয় করিয়া লাভ করেন। সুতরাং এই মহাজনি একটি অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার নাম "ব্যাঙ্কিং"। যৌথ মহাজনি বা ব্যাঙ্কিং দ্বারা মহাজনগণ ধনী হন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং অর্থহীন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণ, শিল্পী এবং বণিক সম্প্রদায় বিলক্ষণ সাহায্য প্রাপ্ত হন। সকল ব্যাঙ্কেরই প্রায় একইরূপ কাজ হইয়া থাকে, কিন্তু সকল ব্যাঙ্কের নিয়ম সমান নহে। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক পরের টাকা চারি প্রকারে ব্যবহার করে।

প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ক অন্যের নিকট হইতে যে টাকা গচ্ছিত স্বরূপ গ্রহণ করে, তাহা আর ফিরাইয়া দেয় না ; অর্থাৎ দাবীর স্বত্ব বিক্রয় করিয়া নিজস্ব করিয়া লয় ও গচ্ছিতকারীকে একদিকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে থাকে এবং অপর দিকে সেই টাকা উক্ত সুদের অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হারে লাভদায়ক বা আয়প্রদ ব্যবসায়ে খাটাইতে থাকে। ইহাতে উভয় গচ্ছিতকারী এবং মহাজন লাভবান্ হইতে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক স্বীয় দেনা পরিশোধ করিবার জন্য দাবীর স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ষ্ট্যাম্প কাগজে রীতিমত ভাবে লিখাইয়া "হুণ্ডী"* ক্রয় করে। হুণ্ডী খরিদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাঙ্ক নগদ টাকায় স্বীয় ঋণ শোধ না করিয়া

** হুণ্ডী-টাকার বরাতী চিঠি। একপ্রকার "মনি-অর্ডার" a bill of exchange*

উহা সুদে বা অন্য লাভবান্ ব্যবসায়ে খাটাইতে থাকে এবং তৎপরিবর্তে পাওনাদারকে বরাতী চিঠি বা হুণ্ডী দিয়া থাকে। "পসার" বা বাজার সম্ভ্রম সম্পন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তি বা বণিকসম্প্রদায় ব্যতীত "হুণ্ডী" বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ হুণ্ডীর ক্রয়বিক্রয় কার্য, কারবারী লোক ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে নাই।

তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক চল্‌তি হিসাবে পরের টাকা জমা বা আমানত রাখিয়া গচ্ছিতকারীকে একখানি চেক বহি দিয়া থাকে। ঐ বহি হইতে এক একখানি পৃষ্ঠা কাটিয়া তাহাতে প্রয়োজনমত টাকা লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যাঙ্ক সেই পরিমাণ নগদ টাকা আমানতকারীকে প্রদান করেন। এই হিসাবে লোকে টাকা জমা দিয়া ইচ্ছানুসারে যে কোন সময়ে সমস্ত বা কিয়দংশ উঠাইয়া লইতে পারেন এবং পুনঃপুনঃ জমা রাখিতে পারেন। চলতি হিসাবের জন্য অধিকাংশ ব্যাঙ্কই নামমাত্র সুদ দিয়া থাকে। এই হিসাব আমানতকারী আপনার সুবিধার জন্য অর্থ গচ্ছিত রাখেন। গৃহে রাখিলে সহজে খরচ হইয়া যায়, চুরির ভয় থাকে এবং ভাবনার কারণ হয়। ব্যাঙ্ক ঐ টাকা লইয়া আমানতকারীকে নির্ভাবনা করে এবং ধনাধ্যক্ষের মত, প্রয়োজন হইলেই, যোগাইয়া থাকে। কোন কোন ব্যাঙ্ক চলতি হিসাব রাখার জন্য কিছুমাত্র সুদ দেয় না কিন্তু, আমানতী টাকা সুবিধামত লাভজনক ব্যবসায়ে খাটায়।—চতুর্থতঃ, ব্যাঙ্ক ব্যক্তিবিশেষ বা বেসরকারী বণিকসভাসম্প্রদায় ও রেজেষ্ট্রী করা কোম্পানীবিশেষকে পাওনাদারদিগকে ব্যাঙ্কের দেয় সুদের অধিক সুদ লইয়া ঋণ দান করিয়া থাকে। এইরূপ যৌথ-মহাজনীতে জাতীয় উন্নতি এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইহার অংশীদারগণের দায়িত্বও বড় অল্প নহে। কারণ অংশীদার এবং কর্মকর্তাদিগের অনবধানতা, অদূরদর্শিতা এবং অসদভিপ্রায়বশতঃ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে, আমানতকারীদিগের অর্থনাশ, জাতীয় দুর্নাম এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাধারণের ক্ষতি হইয়া থাকে।

মহামতি বার্টন ভারতের অর্থনীতি আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় আমাদের দেশে দারিদ্র্য যে এত অধিক তাহার একটি প্রধান কারণ, অর্থ-ব্যবহারে আমাদের অনভিজ্ঞতা। আমাদের দেশে ভূম্যধিকারিগণের টাকা আছে কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের অর্থ, ব্যবসায়

বাণিজ্যে খাটাইতে চাহেন না। তাঁহারা যদি নানা স্থানে ব্যাঙ্কের সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্কের হাত দিয়া সেই টাকা নানা অর্থকরী শিল্প ও ব্যবসায়ে খাটান, তাহা হইলে অতি অল্পদিনেই দেশের ধন বৃদ্ধি হয় এবং দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস হয়। ইংলণ্ড যে ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছে ইহাই তাহার মূল।অর্থ-ব্যবহারের অভিজ্ঞতাই তাঁহাদের সিদ্ধির গুপ্তমন্ত্র। ইংলণ্ডে পাঁচ কোটী লোকের বাস। এই পাঁচ কোটীর মধ্যে কাহারও দশকোটী টাকা আছে, আবার কাহারও দশটাকা ব্যয় করিবারও সাধ্য নাই। এ অবস্থায় কেহ ব্যাঙ্কে এক পয়সাও রাখিতে পারে নাই, আবার কাহারও কোটী কোটী টাকা খাটিতেছে। এই হিসাবে গড়ে প্রত্যেকের ৩০০ টাকা মজুত আছে। এই অর্থরাশি তথায় ৬০২৫ টি ব্যাঙ্কে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে খাটিতেছে। অর্থাৎ ইংলণ্ডের প্রজাগণ ১,৫০০,০০,০০,০০০ এক সহস্র পাঁচ শত কোটী টাকা বাণিজ্যের পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়াছে! কিন্তু ভারতে ৩০ কোটী লোকের বাস। ইংলণ্ড অপেক্ষা ৬ গুণ অধিক, কিন্তু এখানে ১২৭ টি মাত্র ব্যাঙ্ক! এই কয়টি ব্যাঙ্কে এখন গড়ে প্রত্যেকে এক টাকা আট আনা মাত্র গচ্ছিত রাখিয়াছে। অর্থাৎ ৩০ কোটী লোক কেবলমাত্র ৪৫,০০,০০,০০০ পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকা বাণিজ্যে খাটাইতেছে, সুতরাং দেখা যাইতেছে ইংরাজ ভারতবাসী অপেক্ষা সংখ্যায় ৬ গুণ কম হইলেও ৪৬ গুণ অধিকসংখ্যক ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ৩৩ গুণ অধিক টাকা খাটাইতেছে! অথবা যখন ভারতের ৩০ কোটী লোক ৪৫ কোটী টাকা খাটাইতেছে তখন ইংলণ্ডের ৫ কোটী মাত্র লোক এক হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ কোটী অধিক টাকা বাণিজ্যে খাটাইতেছে। এ জাতির শ্রীবৃদ্ধি হইবেনা ত কাহার হইবে? এ দেশের ধনী, মধ্যবিত্ত, সকল শ্রেণীর লোক স্থানে স্থানে যদি স্ব স্ব শক্তি সম্মিলিত করিয়া, যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন এবং এক একটি মূল ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে শাখাব্যাঙ্ক খুলিয়া, তাহার মূলধন অর্থকরী শিল্প ব্যবসায়াদিতে খাটান, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষেই দেশকে উদ্ধার করা হয়। দেশের দারিদ্র্য এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সকলে মিলিয়া ধন বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলে আর আশা নাই। সম্মিলিত শক্তি নিয়োগ না করিলে, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। দশ জনের ক্ষুদ্র শক্তি এবং সমবেত অর্থ ও চেষ্টায় বৃহৎ ব্যবসায় পরিচালিত হয়।

ভারতবাসী উন্নতচরিত্র, অধ্যবসায়ী এবং হিসাবী হউন। তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তিতে দেশের স্থানে স্থানে কৃষি-ব্যাঙ্ক, শিল্প-ব্যাঙ্ক, বিবাহ-ব্যাঙ্ক, মৃতসৎকার-ব্যাঙ্ক, দুর্ভিক্ষ-ব্যাঙ্ক, সঞ্চয়ী-ব্যাঙ্ক, বিধবা-অনাথ-আতুরব্যাঙ্ক, চিকিৎসা-ব্যাঙ্ক প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহারা আপনাদিগের ও প্রতিবেশীর হিতসাধন ও সমৃদ্ধি বিধান করিয়া ধন্য হউন।

মহাজনি কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেই যে শ্রীমন্ত হওয়া যায়, এরূপ কোন কথা নাই। শিক্ষা ও অভ্যাস ব্যতীত কাহারও কোন কার্যে হাত দিতে নাই। যে মহাজনির দ্বারা উন্নতি করিতে চাহে তাহার কিছুকাল কোন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ মহাজনের নিকট শিক্ষানবিশী করা কর্তব্য। "হাতে-কলমে" কাজ করিতে করিতে মহাজনি কার্যে কোথায় কিরূপে লাভ হয়, কোন্ কোন্ ক্রটির জন্য ক্ষতি হয়, তাহার সকল সুবিধা ও অসুবিধা ধীরতা এবং তীক্ষ্ণদর্শিতার সহিত লক্ষ্য করিয়া তবে, তাহার স্বাধীনভাবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। মহাজনি করিবার পূর্বে মহাজন বা মহাজনসম্প্রদায়কে সাধারণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী প্রণয়ন করা উচিত।

সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক

দেশের স্থানে স্থানে ডাকঘর আছে এবং ডাকঘরসংশ্লিষ্ট "পোষ্টঅফিস

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক" নামে সরকারী সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী সরল ; এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ইহাতে টাকা জমা রাখিতে পারে। কিন্তু প্রথমে ইহার নিয়মাবলী ভাল করিয়া বুঝিয়া পাঠ করা উচিত। নিয়মাবলীর পুস্তিকা ডাকঘর হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ইহাতে কি প্রকারে প্রথমে জমা দিতে হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে কি নিয়মে টাকা রাখিতে হয়, কিরূপে প্রয়োজনমত টাকা উঠাইয়া লওয়া যায়, কত টাকায় কত সুদ পাওয়া যায়–ইত্যাদি অতি সরলভাবে বিবৃত আছে। এই ব্যাঙ্কের সর্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে,–

(১) "চল্তি হিসাবে" টাকা গচ্ছিত রাখা যায়।

(২) চল্তি হিসাবেও শতকরা ৩ টাকা সুদ পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যাঙ্কে এরূপ হিসাবে সুদ পাওয়াই যায় না।

(৩) চার আনা পর্যন্ত জমা হয়।

(৪) যে কোন ব্যক্তি জমা রাখিতে পারে।

(৫) অভিভাবকের মারফত নাবালকও টাকা জমা করিতে পারে।

(৬) রবিবার ও বিশেষ বিশেষ পর্বদিন ব্যতীত প্রতিদিন টাকা জমা রাখা যায়।

(৭) প্রতি সপ্তাহে টাকা প্রয়োজনমত উঠাইয়া লইতে পারা যায়।

(৮) সুদ গচ্ছিত টাকায় যোগ করিয়া মূলে (Capital) পরিণত হয় এবং তাহার উপর সুদ গণনা করা হয়।

(৯) ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার বা অন্য প্রকারে টাকা নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

পোষ্ট-অফিসের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে বৎসরে এক শত টাকার ৩ টাকা সুদ হিসাবে হাজার টাকার ৩০ টাকা সুদ হয়। প্রতিদিন যদি পাঁচ পয়সা করিয়া কেহ জমা করে, তাহা হইলে তাহার বৎসরে ৩০ টাকা জমা হয়। প্রতিবৎসর তাহার এই ৩০ টাকা জমা হওয়াও যাহা, তাহার এক সহস্র টাকা ব্যাঙ্কে রাখা তাহাই। যে গৃহস্থের মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা, তাহার দৈনিক আয় ১ টাকা ১০ আনা। প্রত্যহ ইহার এক চতুর্থাংশ ৬ আনা ১০ পাই রাখিলে মাসিক ১২ টাকা বা বাৎসরিক ১৪৪ টাকা জমা হয়। তুমি যদি উক্ত

ব্যাঙ্কে ৪৮০০ টাকা জমা রাখিতে পার, তাহা হইলে প্রতি বৎসর তাহার সুদ স্বরূপ ১৪৪ টাকা পাইবে। যদি তুমি প্রতিদিন তোমার মাসিক ৫০ টাকা হইতে ৬ আনা ১০ পাই সঞ্চয় করিতে পার তাহা হইলে ৪৮০০ টাকা জমা না রাখিতে পারিলেও তাহার জীবন-স্বত্ব ভোগ করিতে পার। সুতরাং যদি কেহ ২৫ বৎসর বয়স হইতে মাসিক ৫০ টাকা উপার্জন করিতে থাকে এবং পূর্বোক্ত নিয়মে প্রতি বৎসর ১৪৪ টাকা জমা করে, তাহা হইলে শতকরা ৩ টাকা হিসাবে দশ বৎসরে চক্রবৃদ্ধি সুদের নিয়মে তাহার ১৭০০ টাকা জমা হয় ; যথা–

প্রথম বৎসরের	জমা . . .	১১৪	টাকা		
ঐ	সুদ . . .	৪	টাকা	৫	আনা
২য়	জমা . . .	১১৪	টাকা		
		২৯২	টাকা	৫	আনা
					১ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ . . .	৮	টাকা	১২	আনা
৩য়	জমা . . .	১১৪	টাকা		
		৪৪৫	টাকা		
					২ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ . . .	১৩	টাকা	৫	আনা
৪র্থ	জমা . . .	১১৪	টাকা		
		৬০২	টাকা	৭	আনা
					৩ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ . . .	১৮	টাকা		
৫ম	জমা . . .	১১৪	টাকা		
		৭৬৪	টাকা	৭	আনা
					৪ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ . . .	২৩	টাকা		

৬ষ্ঠ	জমা...	১১৪	টাকা			
		৯৩১	টাকা	৭	আনা	
						৫ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ...	২৭	টাকা	১৫	আনা	
৭ম	জমা...	১১৪	টাকা			
		১১০৩	টাকা	৫	আনা	
						৬ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ...	৩৩	টাকা	১	আনা	
৮ম	জমা...	১১৪	টাকা			
		১২৮০	টাকা	৬	আনা	
						৭ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ...	৩৮	টাকা	৬	আনা	
৯ম	জমা...	১১৪	টাকা			
		১৪৬২	টাকা	১২	আনা	
						৮ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ...	৪৪	টাকা			
১০ম	জমা...	১১৪	টাকা			
		১৬৫০	টাকা	১২	আনা	
						৯ বৎসরের সঞ্চয়
	সুদ...	৪৯	টাকা	৮	আনা	
		১৭০০	টাকা	১	আনা	
						১০ বৎসরের সঞ্চয়

অতএব সে ৩৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া ১৭০০ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে

** শেষের পাই ও স্থলবিশেষে আনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।*

উঠাইয়া পর দশ বৎসরের প্রথম জমা স্বরূপ ১৪৪ টাকা ব্যাঙ্কে পুনরায় রাখিতে পারে। এই ১৭০০ টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া যদি সে শতকরা ৫ টাকা সুদে অন্য ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে পারে, তাহা হইলে দশ বৎসরে তাহার ২৯০৬ টাকা হয়। যদি সে ব্যক্তি কোন ব্যাঙ্কের অংশীদার হইয়া শতকরা ১২ টাকা সুদে খাটাইতে পারে, তাহা হইলে সে ৪৫ বৎসর বয়সে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের ১৭০০ এবং ৫২৭৩ অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ টাকার অধিকারী হইতে পারে। এই বয়সে যদি সকল আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে ঐ ৭০০০ সাত হাজার টাকা মূলধন লইয়া লাভজনক ব্যবসা করিতে পারে। যদি তাহার ব্যবসায়-বুদ্ধি বা শিক্ষা না থাকে, এমন কি দৈবক্রমে সে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে তাহা হইলেও, ঐ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া দিলে, সে যাবজ্জীবন মাসিক অন্যূন ২৫ টাকা সুদ পাইতে পারে এবং তাহার নিজের ভরণপোষণের ত কথাই নাই তাহাতেই তাহার সংসারযাত্রা কোন প্রকারে চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেরূপেই হউক, টাকা গৃহে আটক করিয়া রাখিলে ও তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে ধনবৃদ্ধি হয় না। আবার, সঞ্চয় ধনবৃদ্ধির মূল। মিতব্যয় সঞ্চয়ের ভিত্তিভূমি। সঞ্চয় এবং মিতব্যয়—এই দুই গুণ পরস্পর এমনই অন্বিত যে একটি সহায়স্বরূপ। যে সঞ্চয়শীল হইতে অভ্যাস করে সে অজ্ঞাতসারে মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা করে। এবং যে মিতব্যয় করিতে শিক্ষা করে সে সঞ্চয়শীল হইয়া পড়ে। পিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতুল প্রভৃতি অভিভাবকগণ গৃহের বালক-বালিকাগণকে মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়শীল হইতে শিক্ষা দিবেন।

কেবল উপদেশে কিছু হয় না। শিক্ষা হাতে কলমে দিতে হয়, নতুবা এ সকল বিষয়ে শিক্ষা হয় না। সঞ্চয় ও মিতব্যয় কি তাহা জানিলে চলিবে না, সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হইতে হইবে। গৃহস্থ স্বীয় পরিবারের মধ্যে স্বয়ং দৃষ্টান্ত দেখাইবেন এবং শিশুদিগকে প্রত্যহ বা সময়ে সময়ে, জলখাবার বা খেলনার জন্য বা পুরস্কার বলিয়া যাহা কিছু অর্থ দেন, তাহার মধ্য হইতে কিয়দংশ সঞ্চয় করিতে শিক্ষা দিবেন এবং সঞ্চয় করিল কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। যদি এক পয়সা মাত্র হয়, তাহাই আরম্ভের পক্ষে যথেষ্ট। এক

পয়সা চার দিনে এক আনা, আট দিনে দু আনা, ১৬ দিনে সিকি এবং মাসে আধুলিতে পরিণত হয়। এই আধুলির শক্তি সামান্য নহে। আমাদের মধ্যে অনেকে "এক আধুলির বড় লোকের" কথা শুনেন নাই। তিনি বঙ্গের ধনকুবেরদিগের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অতুল ঐশ্বর্য ও প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ পাল চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি দীনদুঃখী অনাথগণকে মুক্ত হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে তাঁহার এক কপর্দকও ছিল না।

তাঁহার পিতা সহস্ররাম পাল পান বিক্রয় করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'পান্তি' বলিত। তিনি প্রত্যহ হাটে পান বেচিয়া কষ্টেসৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। এই কষ্টের সংসারে মানুষ হইয়া পুত্র কৃষ্ণপান্তি সঞ্চয়ের মূল্য বুঝিয়াছিলেন। এবং পান বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা হইতেও দুই এক পয়সা সঞ্চয় করিতে অভ্যাস, করেন। একদিন তিনি হাটে পান বিক্রয় করিয়া একটি আধুলি প্রাপ্ত হন। ইহাকেই মূলধন করিয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এবং ধীরে ধীরে ব্যবসায়বুদ্ধি, মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার হইতে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া প্রভূত ধনের এবং যশোমানের অধিকারী হন। তিনি এক আধুলি অবলম্বন করিয়া লক্ষপতি হইয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "এক আধুলির বড় মানুষ" বলিত। এই এক আধুলির ব্যবসাদার যে প্রকারে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হন তাহা অনন্যসাধারণ, সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। ইঁহারই জীবনী হইতে দেখা যায় একটি আধুলির শক্তিও সামান্য নহে; এবং যে পয়সা একটি একটি করিয়া আধুলিতে পরিণত হয় তাহারও শক্তি অল্প নহে। এক এক পয়সা সঞ্চয় করিতে করিতে যে আধুলি করিতে পারে সে সঞ্চয়ের শিক্ষা অর্ধেক লাভ করে। সঞ্চয়ীর পক্ষে, ধনবৃদ্ধি করিবার সর্বপ্রথম শিক্ষাস্থল—"সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক।"

যৌথ সভা-সমিতি

"কর্ম কর, অন্যের সৎকর্মসাধনে,
সহকারী হও সদা সাহায্য প্রদানে।" হিন্দুপত্রিকা, যশোহর।

আমাদের দেশে এখন পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে, দেশী তেজারত, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ড, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ট্রেডিং কোম্পানী, বঙ্গলক্ষ্মী মিলস্ প্রভৃতি যৌথকারবার, এক একটি করিয়া স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এরূপ যৌথ অনুষ্ঠান যত বৃদ্ধি পায় ততই সমাজের ও দেশের মঙ্গল। অনুষ্ঠানকারিগণ সকলেরই প্রশংসাভাজন এবং সাধারণের উৎসাহ ও সহায়তা পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। কিন্তু আমরা এ স্থলে আর এক শ্রেণীর যৌথ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিব। স্বার্থের সহিত সে সকলের সংস্রব অতি অল্প। তাহাদের মূলে দয়ার হস্তই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সেবক সমিতি, বিধবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, অনাথাশ্রম, অন্ধাশ্রম, আতুরালয় প্রভৃতি এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান। ইহা দশজনের মিলিত শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয় এবং জনসাধারণের দানশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল সমিতি ও আশ্রমে যে কত ভাল কাজ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কনখল, বারাণসী মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণ, কত ব্যাধিগ্রস্ত, এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত নিরাশ্রয় নরনারীকে রাজপথ হইতে তুলিয়া আনিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতেছেন এবং আরোগ্যলাভ করিলে পর তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া আপনাপন আলয়ে প্রেরণ করিতেছেন। এ দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ। ইহা প্রাণস্পর্শী, এতদ্বারা জাতীয় অবনতির গতি অনেকটা রোধ

করিতেছে। কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর যৌথসভাসমিতির কথা বলিতেছি তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তাহাতে একাধারে দেশহিতকর কার্য এবং অর্থাগম উভয়ই সিদ্ধ হইবে। পূর্বোক্ত সেবাশ্রম, অনাথালয়, যেমন নিরাশ্রয় নিঃসম্বল নরনারীর উদ্ধার এবং সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তদ্রূপ স্বল্প-উপার্জনশীল এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ যাহাতে পরস্পরের সাহায্য এবং সম্মিলিত শক্তি দ্বারা সভাসমিতি স্থাপিত করিয়া অল্পব্যয়ে অধিক সুখস্বচ্ছন্দে, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এ দেশে জীবনের প্রথম বিশ পঁচিশ বৎসর লোকে অতি অল্পই অসুস্থ থাকে, কিন্তু তাহার পরবর্তী ২০/২৫ বৎসর অধিকবার অসুস্থ হয় এবং জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অধিক দিনই অসুখে কাটে। অর্থাৎ উপার্জন এবং সঞ্চয়ের দিন যত হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অসুখ ও ভিষকের ব্যয় তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জীবনের শেষ অবস্থায় যাহাতে রীতিমত সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হয় এবং সুখে ও নির্ভাবনায় কাটে, পূর্ব হইতেই তাহার সংস্থান করা একান্ত প্রয়োজন। য়ুরোপে লোকে এ বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক। তথা 'সুহৃদ্‌সমিতি', 'বার্দ্ধক্যের সংস্থান সভা', 'বান্ধব সমিতি' প্রভৃতি নামে অনেক যৌথসভা আছে এবং দিন দিন নূতন নূতন সভাসমিতির সৃষ্টি হইতেছে। তথাকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ স্ব স্ব সুবিধা বুঝিয়া এরূপ এক একটি সমিতিতে যোগদান করিয়া থাকেন। সে সকল 'সমিতি', 'লজ', 'কোর্ট', 'সেনেট', 'স্যাংচুঅ্যারি', 'টেণ্ট' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। কিন্তু অধিকাংশই 'লজ' নাম গ্রহণ করে। এই লজে প্রবেশলাভ করিতে হইলে, প্রত্যেক সভ্যের কতকগুলি গুণ থাকা চাই। যাহা কয়েকটি লজের সাধারণ নিয়ম তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। সভ্যের বয়স ১৮ বৎসরের অধিক হইলে, তাঁহাকে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বা মাসিক চাঁদা দিতে হইবে। অধিক বয়সে প্রবেশ করিলে অধিক চাঁদা দিতে হইবে। বয়সের প্রমাণস্বরূপ জন্মদিনের নিদর্শনপত্র দাখিল করিতে হইবে। তৎপরে ডাক্তারের নিকট স্বাস্থ্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে একখানি প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে, যাহাতে এরূপ উল্লেখ থাকে যে, পরীক্ষিত ব্যক্তির কখনও এমন কোন রোগ হয় নাই যাহাতে দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ বা অকালমৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে। এই

সকল অনুষ্ঠানের পর সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলে সকল সভ্যই পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ হন। অবশ্য প্রত্যেক 'লজ' বা 'সমিতির' স্বতন্ত্র এবং বিস্তারিত নিয়মাবলী আছে। প্রায় সকল সমিতির বিশেষ নিয়মাবলী গুপ্ত রাখা হয় কিন্তু সকলগুলিরই উদ্দেশ্য সৎ এবং মহৎ। য়ুরোপের এই শ্রেণীর সমিতিতে উভয়-স্ত্রী এবং পুরুষ, যোগ দিতে পারেন। সাধারণতঃ সমিতির প্রতি অধিবেশনে গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণী এবং হিসাবপত্র সমর্থিত হইবার পর একটি বিবরণী পঠিত হয়। উহা রোগী-পরিচর্যার, অর্থাৎ সমিতিভ্রাতৃগণ রুগ্ন হইলে, যে সকল সভ্য তাঁহাদের দেখাশুনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সাপ্তাহিক বৃত্তি পৌঁছাইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের কর্মের বিস্তারিত কাহিনী। তাঁহারা সমিতি-ভ্রাতৃগণের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। রোগী এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে সাহস ও ভরসা দান করেন, সহানুভূতি দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্ল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমিতির নিয়ম ভঙ্গ না হয় তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা সমিতির তহবিল সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত দেখিলে তাহার অভিযোগ করেন। ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কোন সভ্য সমিতির নিয়মভঙ্গ করিয়া রোগগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত না হন। কেহ্ অপরাধ করিলে, সমিতির নিকট অভিযুক্ত হন এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে, তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অর্থদণ্ড অবশ্য প্রথমবারে অতি সামান্যই হয়, কিন্তু পুনঃকৃত অপরাধের দণ্ড বৃদ্ধি হয়। গুরুতর অপরাধ করিলে, সমিতি হইতে অপরাধীকে বিতাড়িত করা হয়। যদি কোন ভ্রাতার অর্থকষ্ট হয়, বা কর্ম যায়, কিম্বা অন্য কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে সমিতি-ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কোন সভ্যের কর্ম গেলে সমিতি-ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে নূতন কর্মের সন্ধান আনিয়া দেন। তৎপরে নূতন খরচপত্রের হিসাব সমিতি কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয় এবং নূতন নূতন সভ্য যথানিয়মে ভ্রাতৃত্বে গৃহীত হন। পরে কিয়ৎক্ষণ নির্দোষ আমোদ প্রামোদে অতিবাহিত হয়, এই আমোদ কেবল সঙ্গীত ও আবৃত্তিতেই সমাপ্ত হয় এবং কখন কখন বক্তৃতা তর্ক অথবা লণ্ঠনের সাহায্যে শিক্ষাদান প্রভৃতি হইয়া থাকে। এরূপ অনেক সমিতির

দর্শকগণ স্বদেশে এবং দেশান্তরে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য সম্বন্ধে প্রচার করেন, কারণ বড় বড় সমিতির শাখাসভা সকল উপনিবেশগুলিতেই আছে। আবার এমন অনেক সমিতি আছে, যথায় ক্রীড়াকৌতুক আমোদ প্রমোদের প্রতিই সভ্যগণের লক্ষ্য অধিক থাকে। সাধারণতঃ এই সকলের দ্বারা অধিক উন্নতি সাধিত হয় না, কিন্তু আদর্শ সমিতিগুলির দ্বারা পরস্পরের ও সমাজের এবং দেশের প্রভূত উন্নতি হইয়া থাকে। আদর্শ সমিতির নিয়মের গুণে সভ্যগণ যৎসামান্য চাঁদা দিয়া প্রভূত উপকার লাভ করেন। তাঁহাদের একতা, সহানুভূতি, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, পরোপকার, উদ্যম-অধ্যবসায় প্রভৃতি হৃদয়ের সদ্ভাব সমূহ জাগরিত এবং পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; নৌকাবাহন, অশ্বারোহণ, ক্রিকেট, ফুটবল, কসরৎ, প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়াম দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি ও শারীরিক সৌন্দর্য এবং শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বক্তৃতা, উপদেশ, পাঠ, আবৃত্তি তর্ক প্রভৃতি দ্বারা মানসিক স্ফূর্তি ও উন্নতি লাভ হয়। একাধারে এত অল্প ব্যয়ে এতটা সুযোগ, যৌথ সভাসমিতি ব্যতীত সম্ভব হয় না। এদেশেও যদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ স্থানে স্থানে দশজনে মিলিত হইয়া, এইরূপ পরস্পর সাহায্যসমিতি গঠন করেন, তাহা হইলে, দেশের দারিদ্র্য অনেকটা ঘুচিয়া যায়; জনসাধারণের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায় এবং বার্ধক্যে ও অসময়ে দুর্ভাবনা অনেকটা দূর হয়। এই সকল সভাসমিতির নিয়মাবলী সংগ্রহ করিয়া এবং কি প্রণালীতে সভ্যগণ চাঁদা সংগ্রহ করেন, মূলধন খাটান, লাভ বণ্টন করেন এবং অন্যান্য কার্য নির্বাহ করেন, তাহা অবগত হইয়া সেই সমুদয় এদেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া পরস্পর একযোগে কার্য করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবিকার্জন

"উত্তম ক্ষেতি, মধ্যম বেওয়ার।
অধম চাকরি, নিদান ভিক্।।" -হিন্দী প্রবচন।

"কর্ম নীচ নির্বোধেরা কয়।
কর্ম ধন্য ঘৃণ্য কভু নয়।"
"কর্ম কর, অকর্মই অলস অধম।
রাজপথ-সম্মার্জক কর্মীও উত্তম।।" -হিন্দুপত্রিকা, যশোহর।

জীবনধারণ করিতে হইলে, প্রথম অশন, পরে বসন এবং তৎপরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংস্থানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। নিজ জীবনধারণের জন্য যত সামগ্রীর প্রয়োজন, সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় ; এবং আশ্রিতজনের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে প্রয়োজনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পায়। এক ব্যক্তি সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। শুদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইলে দেখা যায়, শস্যের জন্য ক্ষেত্রে, মৎস্যের জন্য জলাশয়ে, লবণের জন্য সমুদ্রে, ইন্ধনের জন্য বনজঙ্গলে এবং শত দ্রব্যের জন্য শত স্থানে দৌড়িলে, তবে একজন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী একত্র করিতে পারে। কিন্তু ইহা কার্যতঃ অসম্ভব। পূর্বে বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহাতে যাহার যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহার বিনিময়ে সে অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু ক্রয় করিত, কিন্তু ইহাও নানা অসুবিধাজনক বোধে, কালে পরিত্যক্ত হয়, এবং এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য সকল বস্তু যাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপায়

উদ্ভাবিত হয়। সেই দ্রব্য মুদ্রা বা অর্থ; সেই দ্রব্য সকল ধনের সহিত বিনিময়সাধ্য এবং সর্বধনের প্রতিনিধি। সুতরাং একমাত্র অর্থ সংগ্রহ্ করিতে পারিলেই, আর কোন চিন্তা থাকে না। যখন যাহা আবশ্যক তদ্বিনিময়ে তখনি তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন সাধারণ কোন গৃহস্থের ভাণ্ডারে দেড় সহস্র মণ চাউল এবং সেই পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য মজুদ থাকিলে ৫৫ বৎসরের জন্য আর অন্ন সংস্থান করিতে হয় না—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ভাণ্ডার-গৃহ্ এত বড় নহে যাহাতে অত দ্রব্যের স্থান সঙ্কুলান হয়। পক্ষান্তরে গৃহস্থের ঐ পরিমাণ দ্রব্য এককালে সংগ্রহ্ করিবার সামর্থ্যও নাই পাছে অগ্নি লাগে, বা অন্য কোন দুর্যোগে নষ্ট হয়, তাহার ভয়ও আছে; সুতরাং প্রতিমাসে অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনমত দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তিনি সংসারের উপস্থিত ও স্বল্পকালের মত অভাব মোচন করেন ও পুনরায় প্রয়োজন হইলে পূর্ব্ববৎ সংগ্রহ্ করেন। এই সংগ্রহের মূলে অর্থ চাই। এ অর্থ কোথা হইতে আইসে? অর্থ শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে "ক্রয়" করিতে হয়। যাহার নিকট অর্থ আছে তাহার অর্থের সহিত, যাহার অর্থের প্রয়োজন তাহার পরিশ্রমের সহিত বা শ্রমজাত অথবা সংগৃহীত বস্তুর সহিত বিনিময় কার্য চলে। এইরূপ অর্থক্রয় করাকে 'অর্থোপার্জন' 'জীবিকার্জন' বা 'রোজগার' বলে। প্রকৃতির উন্মুক্তক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্যই রোজগারের পথ খোলা আছে; কেবল শ্রম, সহজবুদ্ধি, উদ্যোগ এবং শিক্ষা চাই। আদিম অবস্থায় মানব যেরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাহার বহুল পরিবর্তন হইয়াছিল। এক্ষণে জীবন সংগ্রামক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে এবং দিন দিন যেরূপ ভীষণতর হইতেছে, তাহাতে রোজগারের পথও অনেকের পক্ষে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে স্বল্পশিক্ষা স্বল্পচেষ্টা ও স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির ঈপ্সিত উপায়ে জীবিকার্জন করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং যাহার যেরূপ শক্তি, সে সেইরূপ রোজগারের স্থান খুঁজিয়া লইতেছে। এই কারণেই কৃষক, শিল্পী, চিকিৎসক, ব্যবহারাজীবী, বণিক, মহাজন, কেরানী, ভৃত্য, কুলীমজুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্ব স্ব শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি এবং শক্তি অনুযায়ী "রোজগার" দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতেছে।

"জীবনধারণ করা" "সংসার চালান" এক কথা ; আর "জীবন সফল করা", সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা, সমাজের উন্নতিবিধান করা, স্বদেশ ও স্বজাতিকে সমুন্নত, গৌরবান্বিত এবং সমৃদ্ধিশালী করা, স্বতন্ত্র কথা। লক্ষ্মীলাভ করিতে হইলে, বাণিজ্যই সর্বপ্রধান। কারণ "লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে।" কৃষিকর্মদ্বারা অর্থোপার্জন করা বাণিজ্যের সমতুল্য। কারণ ইহাতে বাণিজ্য অপেক্ষা অল্প উপার্জন হইলেও ইহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা স্বাধীন এবং জীবনধারণের মূল। শিল্প ও কৃষি, বাণিজ্যের জীবন। কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যই বাণিজ্যের প্রধান পণ্য। শিল্পীগণ স্বাধীন এবং সমাজের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রধান সহায়। অতঃপর, যে সকল রোজগার, জ্ঞানবিজ্ঞান এবং উচ্চশিক্ষাসাধ্য, যেমন ওকালতি, চিকিৎসা, সংবাদ ও সাময়িক পত্র পরিচালনা, গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রচার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়, তদ্বারাও লোকে শ্রীমন্ত হইতে পারেন, কিন্তু চাকরি যাহা এক্ষণে রোজগারের প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং সহজে প্রবেশসাধ্য তাহা সর্বাপেক্ষা অধম বলিয়া বিবেচিত। কারণ ইহা একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা অনুসারে, গুরুত্ব এবং লঘুত্ব অনুসারে, দায়িত্বের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে, চাকরির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে এবং তদনুযায়ী পদমর্যাদা ক্ষমতা ও বেতন নির্ধারিত হইয়াছে। রাস্তার মুটেমজুরও চাকরি করিয়া জীবন ধারণ করে। কারণ তাহারা যতক্ষণ অন্যের অর্থ লইয়া তাহার কাজ করে, ততক্ষণের জন্য তাহারা তাহার চাকর। কাজ শেষ হইলে যখন বেতন লইয়া গৃহে যায় তখন তাহারা কাহারও চাকর নহে। কিন্তু উচ্চতম হইতে নিম্নতম কেরানীও চিরজীবনের জন্য স্বীয় স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া বসে। কোন কবি তাই গাহিয়াছিলেন ঃ

> "এ বড় ভীষণ জীবিকার রণ
> চাকরি বিষম দায়,
> নিশি দিনমান চাপা যে পাষাণ,
> পেষণে পরাণ যায়।" —(প্রদীপ ১৩০৫)।

এমন পরাধীন বৃত্তি, রোজগারের এমন সংকীর্ণ পথ আর নাই। কিন্তু একটা কথা আছে; ভিক্ষাবৃত্তির অপেক্ষা, চৌর্যবৃত্তির অপেক্ষা, অকর্মণ্য

জীবন যাপনের অপেক্ষা, চাকরি শতগুণে শ্রেয়ঃ। কর্ম কখন হীন হইতে পারে না, কিন্তু কি প্রকারে তাহা সম্পাদিত হয় তাহাই বিবেচ্য। যিনি দশটাকার কেরানীগিরি করিয়া স্বীয় শ্রমলব্ধ উপার্জনে 'কষ্টেসৃষ্টে' সংসারযাত্রা নির্বাহ্ করেন তিনিও প্রশংসাভাজন এবং সমাজের বরণীয়। কিন্তু অসদুপায়ে লব্ধ ধনের অধিকারী গাড়িঘোড়া চড়িয়া বেড়াইলেও, সকলের হেয় এবং ভদ্র সমাজের অযোগ্য। স্বাবলম্বী, তেজস্বী এবং স্বাধীনচিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ও চাকরি করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, হীন হইয়া যান নাই। কারণ তিনি পরের অধীনতা স্বীকার করিলেও, পরের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই। তিনি উপরিতন কর্মচারীর আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিলেও অযথা আজ্ঞাপালনতৎপর হইয়া আত্মমর্যাদায় জলাঞ্জলি দেন নাই। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন, তখন একবার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষের সহিত মতের অনৈক্য হওয়ায় অবলীলাক্রমে পাঁচ শত টাকা বেতনের চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জীবিকার্জনের আর সকল পথ রুদ্ধ থাকিলে, চাকরি গ্রহণে লজ্জা নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, শুদ্ধ চাকরি করিয়া কেহ শ্রীমন্ত হইতে পারেন না, এবং যদি দৈবাৎ কেহ হন, তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে লোকে সন্দেহ করিয়া থাকে। তাহার কারণও আছে। এদেশে যাঁহারা চাকরি করিয়া অর্থোপার্জন করেন তাঁহারা উচ্চ রাজকার্যই করুন অথবা নিম্নতম কেরানীর বেতন লাভই করুন, তাঁহারা ব্যবসায়ীদিগের মত সঞ্চয় করিতে পারেন না। প্রায়ই দেখা যায় উচ্চতম বেতনভূক বিচারপতি অপেক্ষা উকীল ব্যারিষ্টারগণ অধিক ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ইহার কারণ যাঁহাদের আয় অনিশ্চিত, তাঁহারা বাধ্য হইয়া সঞ্চয়শিক্ষা করেন। নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত অর্থ লাভের নিশ্চয়তা লোককে অসাবধান, অদূরদর্শী এবং অমিতব্যয়ী করিয়া দেয়। যাঁহাদের আজ শতমুদ্রা আমদানী হয় এবং কাল সহস্র অথবা এক কপর্দকও না হইতে পারে, তাঁহাদের পাছে উপর্যুপরি অর্থাগম না হয়, এই ভয়ে লব্ধ অর্থ হইতে যতদূর সম্ভব সঞ্চয় করিবার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি জন্মে। এ ক্ষেত্রে তাঁহারা মিতব্যয়ী না হইয়া পারেন না। উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী অবশ্য সাবধানে ব্যয় করিয়া সংসারে সচ্ছলতা সম্পাদন এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থান

করিতে পারেন, কিন্তু ধনী হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন। সাধারণতঃ লোকে বলে তাঁহাদের হাতে "বেশ দু পয়সা আছে"। তাঁহারা যে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি বা ধনকুবের এরূপ কখন শুনা যায় না। কেরানীগিরি করিয়া বা উচ্চ চাকরি করিয়া কে কবে লক্ষ লক্ষ টাকা দেশহিতের জন্য দান করিয়াছেন? উচ্চবেতনভুক কর্মচারীর পক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা দানই অতুলনীয়!

যে ব্যবসায়ে অধিক ধন উৎপন্ন এবং সঞ্চয় হইতে পারে, তাহা ত্যাগ করিয়া চাকরি করিতে ধাবিত হয় বলিয়াই দেশের লোক এত নির্ধন হইয়া পড়িতেছে। যে জাতির ভিতর যৌথকারবার, যৌথমহাজনী, শিল্প-বাণিজ্যব্যাপার অধিক তাহারাই অধিক ধনী। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে, চাকরির পথ ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। বরাকর অঞ্চলে কয়লার খনি হইতে যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, সেই বীরভূমনিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে রানীগঞ্জ "বেঙ্গল কোল কোম্পানীর" দেওয়ানের অধীনে মাসিক ৫ টাকা বেতনের মুহুরি ছিলেন। তিনি ৫ টাকা হইতে ক্রমে ক্রমে ১০০ টাকা এবং পরে দেওয়ানীপদ পর্যন্তও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ৫ টাকাই হউক আর ৫০০ টাকাই হউক, চাকরিতে শ্রীবৃদ্ধি নাই দেখিয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া চাকরি ত্যাগ করেন। যাদব বাবু যদি ৫ টাকার স্থলে প্রথম হইতেই ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম লইয়া অদ্যাপি তাহা কেবলই সঞ্চয় করিতেন তাহা হইলে, এই ৪২ বৎসরে মাসিক ৫০০ টাকার হিসাবে ২,৫২,০০০ দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা মাত্র-না হয় সুদ প্রভৃতিতে খাটাইয়া তিন লক্ষই সঞ্চয় করিতেন। কিন্তু চাকরি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীলাভের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই "রাজার হালে" সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া শত শত টাকা দান করিয়া ও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া সর্বসাধারণের আদর্শস্থল হইয়াছেন।

জে. ডি. রকফেলার তৈলের কারখানায় কেরানীগিরি করিতেন। ১৮৫৬ সালে তাঁহার বেতন ছিল ৫০ টাকা। উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে জীবিকার্জনের অধম স্তর কেরানীগিরির চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে

দিল না। তিনি তৈলের কারখানায় কেরানীগিরি করিয়া তৈলব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বাধীনভাবে সেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে, তিনি ৪৩ বৎসরের মধ্যে নব্বই কোটী টাকার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যদি মাসিক শতগুণ ৫০ টাকার কেরানীগিরি করিয়া এবং এক কপর্দক ব্যয় না করিয়া কেবল সঞ্চয়ই করিতেন তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যে ২৫,৮০,০০০ পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে তাহার তিন শত আটচল্লিশ গুণেরও অধিক দিয়াছিলেন! এইরূপে স্বদেশ এবং বিদেশের কত অলব্ধপ্রতিষ্ঠ অজ্ঞাতনামা যুবা যে ঋদ্ধির পথ ধরিয়া শ্রীমন্ত এবং প্রখ্যাত হইয়াছেন কে তাহার সংখ্যা করিবে? কিন্তু লোকের ধারণা অন্যরূপ। লোকে বাণিজ্যের কুঠি হইতে দোকানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা ভদ্র ও ইতরে যে প্রভেদ স্বীকার করে, বাণিজ্যব্যবসায়ী ও দোকানীর মধ্যে সেই প্রভেদ দেখিতে পায়। সুতরাং তাহারা বণিককে সম্মান দিবে কিন্তু দোকানীর মান রাখিবে না। বাণিজ্যব্যবসায়ী মহাজনকে যে ব্যক্তি "আপনি মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিবে, সেই ব্যক্তিই দোকানীকে "ওহে তুমি" বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না ; স্থলবিশেষে "ওরে তুই" বলিতেও লজ্জা বোধ করিবে না! সমাজের ভ্রান্ত সংস্কারই ইহার মূল। সাধারণের ধারণা, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্রয় বিক্রয় না করিলে ব্যবসায় বাণিজ্য করা হয় না। অল্প মূলধনের ক্রয় বিক্রয়কে দোকানদারী বলে এবং দোকানদারিতে সম্মানের হানি হয়। সমাজে সেইজন্য "দোকানী"র তেমন মান নাই। এই সর্বনাশকারী ধারণা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার এমনই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, একজন সভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাধীনভাবে দোকান খুলিয়া স্বহস্তে ক্রয় বিক্রয় করিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু ভদ্রসন্তান হইয়া মাসিক দশটাকা বেতনের গোলামি করিতে তাঁহার লজ্জা হইবে না এবং লোকে তাঁহাকে লজ্জা দিবেও না। এদিকে সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ কোন ব্যক্তি ১৫ টাকা বেতনের কেরানীগিরি করিলে সমাজে যে সম্মানটুকু লাভ করিবেন, তিনি সহস্র টাকার মুদিখানা খুলিয়া মুদি হইয়া বসিলে সমাজ তাঁহার প্রাপ্য মানের শতাংশের একাংশ মানও রাখিবে না! সে যে দোকানী!

দেশের যখন এমনই অবস্থা যে, ক্ষুদ্রতম কেরানী হইলে যাহার সমাজে মান বাড়ে, ক্ষুদ্র দোকানী হইলে তাহার মান থাকে না, তখন সাধারণে যে কেরানীগিরিকেই বরণ করিয়া লইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ইহা ধন প্রাণ অপেক্ষা লোকের মান যে অধিক প্রিয় তাহাই প্রতিপন্ন করে। দেশবাসী যখন সামাজিকগণের মান রাখিতে শিখিবে, তখনই তাঁহার ললাট হইতে "গোলামের জাতি" বলিয়া কবিপ্রোক্ত কলঙ্কের কালি মুছিয়া যাইবে, অন্যথা নহে! সমাজকে বুঝিতে হইবে যে-পরিশ্রম, আত্মত্যাগ, বিনয়, বিলাসশূন্যতা, সময় ও নিয়মনিষ্ঠা এবং মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণে একজন সামান্য দোকানদার, একজন পণ্ডিত, একজন ধনী বা একজন সমাজপতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন বরং অধিকাংশস্থলে শ্রেষ্ঠ। এ সকল গুণ না থাকিলে, তাঁহাকে এতদিন "দোকানপাট" বন্ধ করিয়া জীবিকার উপায়ান্তর দেখিতে হইত!

বাণিজ্য

"লক্ষ্মীর্বসতিবাণিজ্যে।"
ক্রয় ও বিক্রয় করা মন্দ নয়।
বিক্রয় ও ক্রয় যুক্তিযুক্ত হয়।।
কিন্তু যেবা করে ক্রয় বিক্রয় না করে।
বিনাশের টীকা সেই ললাটেতে ধরে।। -অনুবাদ।

"স্বল্পতম শ্রম উচ্চতম বেতনে বিক্রয় করিবে।"
"নিম্নতম হারে মজুরি দিয়া উৎপন্ন দ্রব্য উচ্চতম দরে বিক্রয় করিবে।"
স্যামুএল সিলি।

"ব্যবসা বাণিজ্য ধর।
স্বদেশ সম্পন্ন কর।।
স্বজাতি-হীনতা হর." হিন্দু পত্রিকা, যশোহর।

"এক ধন দিয়া অন্য ধন আহরণ করা বাণিজ্যের কাজ।"

অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বা কম উপকারী ধনসামগ্রীর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক ও বেশী উপকারী ধন সংগ্রহ বাণিজ্যের কৃতিত্ব। লক্ষ্মীলাভ করিতে হইলে বাণিজ্যের আশ্রয় লইতে হয়। যাহাদের বাণিজ্য নাই তাহাদের শ্রীও নাই। সঞ্চিত অর্থ না থাকিলে, মূলধন হয় না। বাণিজ্যের উপাদনে ধরিত্রী, শ্রম ও মূলধন। কিন্তু মূলধন থাকিলে ধরিত্রী ও শ্রম উভয়ই আয়ত্ত হয়। ভূমি ও শ্রম অবস্থাবিশেষে মূলধনে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং মূলধনই সকল উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল। এই মূলধন কি তাহা বুঝিতে হইলে, ধন কি তাহা প্রথমে জানিতে হইবে।-ধন ও মূলধন কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব পাঠে বুঝান হইয়াছে।

কৃষি, শিল্প প্রভৃতি থাকিতে বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস একথা কেন বলা হয়? তাহার কারণ, ধনই লক্ষ্মী এবং ধন বিনিময়-সাপেক্ষ। বিনিময়ই বাণিজ্যের আদি, বিনিময়ই ইহার শেষ। কৃষিজাত শিল্পজাত, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক ও যাবতীয় সামগ্রী বিনিময়দ্বারা ধনে পরিণত হয় এবং বাণিজ্য দ্বারা এই বিনিময় কার্য বিস্তারিতভাবে সম্পাদিত হয়।

বাণিজ্য দুই প্রকার-অন্তর্বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বা বহির্বাণিজ্য। স্থানীয় অভাব দূর করিবার জন্য যে ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহাকে অন্তর্বাণিজ্য বলে। যদি কেহ কোন গ্রামে বা সহরে দেশের উৎপন্ন চাউলের দোকান খুলিয়া বসে, এবং পল্লীবাসিগণ ও ভিন্ন গ্রাম বা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের

খরিদদারগণ সেই দোকান হইতে চাউল খরিদ করিয়া স্বতন্ত্র দোকান খুলে বা কেবল স্ব স্ব অভাব মোচন করে মাত্র, তাহা হইলে তাহা অন্তর্বাণিজ্যের অন্তর্গত বলা যায়। এইরূপে চাউল, গোধূম, তূলা, পাট, ঊর্ণা প্রভৃতি কৃষিজাতদ্রব্য ; খনিজ পদার্থ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশের উৎপন্ন বস্তু দেশেই সরবরাহ করার নাম অন্তর্বাণিজ্য। অন্তর্বাণিজ্যে উৎপন্ন বস্তুর প্রাচুর্যবশতঃ দেশের অভাব হয় না বটে, কিন্তু এতদ্বারা জাতীয় ধন বৃদ্ধি হয় না। বহির্বাণিজ্যদ্বারা স্থানীয় অভাব মোচন করিয়া দেশের উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে যাহা উদ্বৃত্ত হয়, দেশের বণিক্‌গণ তাহা দেশান্তরে বিক্রয় করিয়া তদ্বিনিময়ে বিদেশের ধন গৃহে আনয়ন করেন।

কোন্ পণ্যের কোথায় চাহিদা ও কোন্ সময়ে কি কৌশলে বিক্রয় করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য পাওয়া যাইবে এবং দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কোথায় কোন্ সুযোগে ক্রয় করিলে স্বল্পতম মূল্যে পাওয়া যাইবে তাহা নির্ধারিত করিয়া কার্য করা বাণিজ্যের প্রধান লক্ষ্য। দ্রব্যকে মূল্যযুক্ত করা এবং জগতের পণ্যালয়ে উপস্থিত করিয়া তাহার বিনিময়ে জাতীয় ধনের বৃদ্ধি করাই বাণিজ্যের সার্থকতা। অবশ্য স্মরণ করিতে হইবে, জগতের পণ্যালয়ে যে দ্রব্য মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা যতই উৎপন্ন বা নির্মিত হউক না কেন, তাহার চাহিদা হইবে না। সুতরাং তাহার বিনিময়ও চলিবে না। কিন্তু এক দেশে যাহার চাহিদা নাই অন্যদেশে তাহার প্রয়োজন থাকিলে, সেই দেশে সেই দ্রব্যের মূল্য হয়। সুতরাং সেই দেশে সেই পণ্যের বিনিময়ে স্বদেশের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করা অথবা পণ্যের অভাবে বিনিময়-স্বত্ব লইয়া তাহার বিনিময়ে অন্য দেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা বাণিজ্যেরই কার্য। যে দেশের বাণিজ্য যত সংকীর্ণ, তথায় দরিদ্রের সংখ্যাও তত বেশী। কারণ বাণিজ্যই কর্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি করে। যাহারা কর্মহীন, দেশে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যকুঠি খোলা হইলে, তাহাদের অনেকেই কর্ম পায়। বাণিজ্যের কল্যাণে অনেক পতিত জমির আবাদ হয়, অনেক বন জঙ্গল কাটিয়া সহর হয়।

এদেশে পূর্বে বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। উভয়-অন্তর্বাণিজ্যে এবং বহির্বাণিজ্যে দেশ ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। তখন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যে তরণী সাজাইয়া চাঁদ,

শ্রীমন্ত, ধনপতি প্রভৃতি সওদাগরগণ সমুদ্র-পারে গিয়া দেশের উৎপন্ন বস্ত্র দিয়া বিদেশের ধনে তরণী ভরিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহারা প্রধানতঃ সিংহলদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া যাইতেন ; অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য তখন উভয়ই বিলক্ষণ উন্নত ছিল। দেশে ধনীর সংখ্যা অনেক ছিল। রাজা বল্লাল সেনের সময় বণিক বল্লভানন্দ বঙ্গের রথস্চাইল্ড ছিলেন। তাম্রলিপ্ত, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল। সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্র ছিল। তখন দেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী যুরোপের পশ্চিমপ্রান্তবাসিগণের নিকটও পঁহুছিত। জলে স্থলে সর্বত্রই দেশের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। এখন সে সকল যেন গল্পে পরিণত হইয়াছে!!

বঙ্গের কার্পাস এবং মসলিন্, জগতে অতুলনীয় ছিল। তূলা এবং বস্ত্রের বাণিজ্যের বঙ্গ ধনৈশ্বর্যে "জগৎশেঠের" আবাস-ভূমি ছিল। বৈদেশিক বণিকগণ যেমন বঙ্গের তূলা ক্রয় করিয়া বহির্বাণিজ্য সজাগ রাখিয়াছিলেন, বোম্বাই প্রভৃতির তূলাব্যবসায়িগণ তদ্রূপ বাঙ্গালার তূলা খরিদ করায় অন্তর্বাণিজ্যেও বঙ্গদেশ বেশ শ্রীমন্ত হইয়াছিল। অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৫৯-৬০ অব্দে, ভারতে তূলার বাণিজ্যে ১২ কোটী টাকা আয় হয়। সে বৎসর পৃথিবীর সমুদয় খনি হইতে ১০ কোটী টাকার রৌপ্য উত্থিত হয়, এবং এই একমাত্র ঘটনা যুরোপের বণিক-সমাজের ভীতি সঞ্চার করে। সেই সময় হইতে ভারতীয় তূলার বীজ লইয়া তাঁহারা মিশর ও মার্কিন প্রভৃতি স্থানে তূলার চাষ আরম্ভ করেন। পরিণামে ভারতের তূলার বাণিজ্য, প্রতিযোগিতায় পরাস্ত এবং শেষে লোপপ্রাপ্ত হয়। এক্ষণে ভারতীয় চিনির দশাও প্রায় এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। যে বস্ত্রের গৌরবে ভারত স্ফীত ছিল সেই ভারতীয় বস্ত্রের নমুনা পাইবার ২৪ বৎসর পরে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় ভারতে দেখা দেয় ; এবং ভারতে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে ১৭৯৪ অব্দে ১৫৬০ টাকা, ১৮০৪ অব্দে ২৯৩৬৭০ টাকা, ১৮০৭ অব্দে ৪৬৫৪৯০ টাকা মূল্যের কাপড় আমদানি হয়। আমদানির পরিমাণ এইরূপে ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। কি প্রকারে এরূপ হইল তাহার বিবরণ দিবার প্রয়োজন

নাই, কিন্তু বাণিজ্যে যে লক্ষ্মীলাভ হয় এবং বাণিজ্যের অভাবে যে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয় ইহাই বক্তব্য। বঙ্গের বাণিজ্য অভাবে কি দশা হইয়াছে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের বাণিজ্য প্রভাবে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে ইহাই বিচার্য। এই যে ভেনিস্ এককালে লক্ষ্মীর বরপুত্রী ছিল-তাহার কারণ কি? ভেনিসের নাম পূর্বে কে জানিত? ভেনিস ভূমধ্যসাগরের বক্ষে তৃণশস্পহীন বালুকাময় উষর দ্বীপপুঞ্জমাত্র ও তাহার স্থানে স্থানে মুষ্টিমেয় কর্ষণোপযোগী ভূভাগ ছিল। কিন্তু অবশিষ্ট ভাগ জনমানবহীন জলাভূমিতেই পূর্ণ ছিল ; পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্বর হূণদিগের আক্রমণভীত, এ্যাটিলার অত্যাচারপীড়িত কতিপয় প্রজা, এ্যাকুইবিয়া, পদুয়া ও এ্যাড্রিয়াটিক উপকূলস্থ অন্যান্য নগর হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এই জনশূন্য জলাভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কে জানিত, এই উষর ক্ষেত্রে সুবর্ণ বর্ষণ করিবে--ইহাই মহালক্ষ্মীর আলয় হইবে? সামুদ্রিক লবণ ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যতীত ভেনিসের আর কোন সম্পত্তিই ছিল না। মধ্য যুগে য়ুরোপের সর্বত্রই উপবাসের দিনে এবং অন্যান্য পার্বণে মৎস্যের অতিপ্রচলন ছিল। মৎস্য ও মাংস শীতকালের ব্যবহারের জন্য তথায় লবণে জরাইয়া রাখা হইত। সুতরাং এই নূতন ঔপনিবেশিকগণ এই দুই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল। ভেনিসের বণিকগণ তখন বিদেশের ধন দেশে আনিয়া দ্বীপবাসিগণকে ঐশ্বর্যশালী, ক্ষমতাশালী এবং সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিল। ভূমধ্য সাগরের বাণিজ্যব্যাপারে ভেনিসের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভেনিসের ৩০০০ বাণিজ্য পোত এবং সেই সকলের রক্ষার্থ ১১,০০০ সৈন্যপূর্ণ ৪০ টি রণতরী সজ্জিত হইয়া পশ্চিমে স্পেন, পর্তুগীল, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এবং পূর্বে মিশর, আরব, ভারত প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য বিস্তার করিল। লবণ ও মৎস্যের ব্যাপারী তখন শনৈঃ শনৈঃ রেশম, কার্পাস, মসলা, মেওয়া, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, রোপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসক, তৈল, বাহাদুরী কাষ্ঠ, শস্য, খর্জুর, উর্ণা, কাচ, ছিট, কাগজ, সাবান, মসৃণ চর্ম প্রভৃতির ব্যবসায়ে এমন কি দাসব্যবসায়ে পর্যন্ত প্রবৃত্ত হইল। ভেনিসে লৌহ পিতল এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির কারখানা স্থাপিত হইল। কথিত আছে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভেনিস নগরে প্রায় সহস্র সম্ভ্রান্ত ধনী ও দুই

লক্ষাধিক প্রজার বাস ছিল। ১৩৭১ অব্দে ভেনিস্-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহাই জগতে প্রথম ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। প্রত্যেক জাতির বাণিজ্যপোত ভেনিসের বন্দরে আসিয়া লাগিত ; পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির পরিব্রাজকগণ ভেনিসের রাজপথ জনাকীর্ণ করিত। ভেনিসের প্রতাপ, ভেনিসের নাম জগৎময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। সেই জনমানবহীন জলাভূমি কেমন করিয়া এমন লক্ষ্মীর আলয়ে পরিণত হইল? —বাণিজ্য—এবং কেবল বাণিজ্যই তাহার মূল! ইংলণ্ডের সম্মুখে ভেনিস্ আজি নগণ্য! হায় ভেনিসের সে বাণিজ্য নাই! লক্ষ্মীও তথা হইতে অন্তর্ধান করিয়া বাণিজ্যপ্রধান ইংলণ্ডে বিরাজ করিতেছেন! ইহা ত জাতীয় দৃষ্টান্ত ; ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তও এইরূপ। যাঁহারা পর্ণকুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদস্পর্দ্ধী অট্টালিকায় সুখশয্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা সমাজসমুদ্র মধ্যে জলবুদ্বুদের ন্যায় অথবা জনসিন্ধুতীরবর্তী বালুকণার ন্যায় অজ্ঞাত, নগণ্য অবস্থায় বর্ধিত হইয়া সমাজের শীর্ষে সম্মানের উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রিক্তহস্তে জীবন-সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা জনহিতার্থ ব্যয় করিয়াও সন্তানসন্ততিগণের জন্য অতুল ঐশ্বর্য রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন; তাঁহারাই দরিদ্র-প্রজা-বহুল দেশের আদর্শ। তাঁহারা সকলেই লক্ষ্মীলাভের রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছেন। সেই পথ অবলম্বন করিয়া বণিক রাজ লিপ্টন ও কার্ণেগী আদি বৈদেশিকগণ এবং আমাদের গৃহদ্বারে "পলনাইট" ও রামদুলাল সরকার প্রমুখ বহু মহাজন আমাদের আদর্শস্থানীয় হইয়া গিয়াছেন। জে. ডি. রকফেলার তৈলের কারখানায় কেরানীগিরি করিয়া ১৮৫৬ সালে মাসিক ৫০ টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে ঐ কার্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে দিল না। তিনি জীবনের কর্মক্ষেত্রে মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে তিনি ব্যবসায়ে কত শীঘ্র এবং কি পরিমাণ উন্নতি করিয়াছিলেন, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ১৮৬৫ অব্দে তৈলের ব্যবসায়ে ১০,০০০ টাকার অধিকারী হন।

তিনি	১৮৭০ অব্দে	...	১,০০,০০০ টাকার,
	১৮৭৫ অব্দে	...	২০,০০,০০০ টাকার,
	১৮৮৫ অব্দে	...	১০,০০,০০,০০০ টাকার,

১৮৯০ অব্দে ... ২০,০০,০০,০০০ টাকার,

১৮৯৯ অব্দে ... ৫০,০০,০০,০০০ টাকার,

এবং ১৯০৩ অব্দে ... ৯০,০০,০০,০০০ টাকার

অধিকারী হন। অর্থাৎ ৪৩ বৎসরের মধ্যে একজন মাসিক ৫০ টাকা বেতনভূক কেরানী চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া নব্বই কোটী টাকার অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন! এমন নহে যে, কোন যাদুমন্ত্র বলে বা দৈবাৎ একজন রকফেলারের ভাগ্য ফিরিয়া গিয়াছে। তাঁহার অনুসৃত পথে যিনি গিয়াছেন তিনিই শ্রীমন্ত হইয়াছেন। পী. মরগ্যান সাহেব সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া ৩০,০০,০০,০০০ টাকা, মিঃ ডবলু. কে. ভ্যাণ্ডারবিল্টও ত্রিশকোটী টাকা, চিনির কারবারে মিঃ হ্যাভমেয়ার একুশ কোটী টাকা এবং ডবলু. এস. রকফেলার তৈলব্যবসায়ে বার কোটী টাকার অধিকারী হন। কি হীনাবস্থা হইতেই না মহাত্মা কার্ণেগী কিরূপ ধনৈশ্বর্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন। রাজপথসম্মার্জক এবং পরে সপ্তাহে ২.৫০ টাকা বেতনের কর্মচারী এন্ড্রু কার্ণেগী বাণিজ্য দ্বারা প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিতে না করিতেই ১২০,০০,০০,০০০ একশত বিশ কোটী টাকার মালিক হন।

জাতীয় ধনাগম ও ধনবৃদ্ধি

. . .

প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, ধনাগম অর্থে অন্যত্র হইতে ধন আসা এবং

ধনবৃদ্ধি অর্থে পূর্বাগত ধনের সহিত তাহার রক্ষা বা সঞ্চয়। কেহ প্রভূত ধন সঞ্চয় করিলে যেমন তাহাকে লোকে ধনী, ধনকুবের ইত্যাদি নাম দেয়, কোন দেশ বা জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক গৃহস্থ বা অধিকাংশ নরনারীর অধিকারে ধন থাকিলে, সেই জাতি বা দেশকে ধনসম্পন্ন বলে। দেশকে ধনী বলিতে পারিলেও তাহাতে দেশের ধনাগম বা ধনবৃদ্ধি বুঝায় না। মনে কর, এক দেশে পাঁচ কোটি লোকের বাস। এই দেশের ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলের আর্থিক অবস্থার হিসাব করিয়া দেখা গেল সমস্ত দেশের অর্থ ও পণ্য আদি লইয়া লক্ষকোটী টাকা মূল্যের মূলধন আছে। দেশের প্রয়োজন সিদ্ধি বা অভাব মোচনের উপযোগী, এমন কি, আরাম ও বিলাস চরিতার্থ করিবার মত উৎপন্ন বস্তুর বিনিময় এবং অর্থ বিনিময় হেতু বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্যও চলিতেছে, কিন্তু তাহা দ্বারা দেশে যে লক্ষ কোটি টাকা ছিল তাহার বৃদ্ধি হইতেছে কি? না, তাহা হইতেছে না। কারণ যদিও সে টাকার এক কপর্দকও দেশের বাহিরে গিয়া অন্য দেশের হস্তগত হইয়া হ্রাস পাইতেছে না, তথাপি বহির্বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অভাবে বিদেশ হইতেও এক কপর্দক আসিতেছে না। কেবল অন্তর্বাণিজ্যের ফলে দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই দেশীয় কৃষি, শিল্প বিজ্ঞানাদিজাত দ্রব্য বিনিময়ে একজনের অর্থ অন্যজনের হস্তগত হইতেছে মাত্র। ফলে দেখা যায়, কাল যে ভিখারী ছিল আজ সে দরিদ্রপালক হইয়াছে; যেখানে পর্ণকুটীর ও পতিত ভূমি ছিল তথায় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাশ্রেণী শোভা পাইতেছে; পতিত ভূমি কর্ষিত হইয়া শস্যের ভাণ্ডারস্বরূপ হইয়াছে। এই সৌধাবলী নির্মাণে যে রাশীকৃত অর্থ ব্যয় হইল, তাহা ভোগীর গৃহ হইতে শিল্পী ও শ্রমিকের গৃহে গিয়া পৌছিল—অর্থাৎ একজনের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া বহুলোকের ভাণ্ডার অল্পাধিক বৃদ্ধি করিল মাত্র। দশ বিশ বৎসর পরে দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখা গেল যে, দেশের শ্রী ফিরিয়াছে, সমগ্র জাতির জীবনযাত্রার ধারা বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় ধনবৃদ্ধির পরিচয় কি কিছু পাওয়া গেল? হিসাবে দেখা গেল অনেক দরিদ্র সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অনেক পুরাতন ধনী ভিখারী হইয়াছে। যে লক্ষ কোটী টাকা ছিল, তত টাকাই আছে। দেশে নূতন ধনাগম বা জাতীয়ধনের বৃদ্ধি হয় নাই। দেশীয়

ধনবৃদ্ধি ও ধনাগম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারাই সম্ভব। তাহার যে সকল উপায় আছে এবং নিত্য উদ্ভাবিত হইতেছে, তন্মধ্যে দেশের বিস্তৃততরভাবে আধুনিক প্রণালীতে ঋদ্ধিতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতির শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের সুবিধাজনক পূর্তকার্য-চতুর্দিকে খাল, রেল প্রভৃতির বিস্তার, অবাধ বাণিজ্যের ক্ষমতা লাভ, পণ্য সরবরাহের পথখরচ, শুল্কাদির হ্রাসকরণ বা নিম্নতমহার নির্ধারণ এবং পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে যাহা ব্যক্তিগত সমুন্নতির উপায়স্বরূপ বলা হইয়াছে তৎসমূহ অন্যতম।

দেশে কাঁচা মাল এত অধিক পরিমাণে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকা আবশ্যক যে, সমগ্র দেশের অভাব মোচন করিবার পর, উদ্বৃত্ত সুতরাং অনাবশ্যক দ্রব্যজাত দেশের বাহিরে লইয়া গিয়া জগতের পণ্যালয়ে বিক্রয় করা যায় এবং তাহার বিনিময়ে দেশের প্রয়োজনীয় ও ধনোৎপাদক সামগ্রী দেশে আনা যায়। এই আদান প্রদানের হার এরূপ হওয়া চাই যে প্রত্যেক বিনিময়ের পর কিছু লভ্যাংশ দেশেই স্থায়িভাবে থাকিয়া যায়। জগতের বাণিজ্যে বিনিময়ের জন্য দেশে কোন দ্রব্য উৎপন্ন ও নির্মাণ করিবার পক্ষে অনুকূল তাহা জানা আবশ্যক। একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, দ্রব্য উৎপন্ন করিবার ব্যয় যে দেশে সর্বাপেক্ষা কম এবং লাভের সম্ভাবনা অধিক সেই দেশেই সে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। যেমন এদেশের কলে দেশী তূলা হইতে মোটা সূতা হয় ; তাহাতে মোটা কাপড় বুনিলে যত লাভ থাকে বিলাত হইতে মিহিসূতা আনাইয়া এদেশের কলে মিহি কাপড় বুনিতে বেশী খরচ পড়ায় লাভ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। তাহার ফলে দেখা যায় বোম্বাইওয়ালারা মিহি কাপড়ের পরিবর্তে মোটা কাপড়ই প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং মিহি কাপড় বিলাত হইতে আসে। এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উৎপাদন স্বল্পতর ব্যয়সাপেক্ষ হইলে অধিক লাভজনক হয় বলিয়া উৎপাদকদিগের লক্ষ্য তৎপ্রতি ধাবিত হয়। বিনিময় সম্বন্ধে সাধারণ রীতি এই যে, একই দ্রব্য যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে আর সকল দেশেই তাহার বিনিময় হয় তাহা নহে। যে দেশে কোন দ্রব্য সর্বাপেক্ষা অল্পব্যয়ে উৎপন্ন হইয়া অল্পতম মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে

তাহারই ক্রেতা হয়। এবং যে দেশ সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া লইতে চায়, প্রতিযোগিতায় সেই পণ্য তাহারই লব্ধ হয়।

আমাদের দেশে পাট, তূলা, ধান্য, গোধূম ইত্যাদি, রাশিয়ায় কেরোসিন তৈল ও গোধূম, স্পেনে মদ্য, জর্মনিতে উর্ণাবস্ত্র, ঔষধাদি, ইংলণ্ডে কার্পাস বস্ত্র, ছুরি কাঁচি, পোত, লৌহ-যন্ত্রাদি এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে অন্যান্য প্রধান বিনিময় দ্রব্য আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যদ্বারা পরস্পরের মধ্যে তৎসমুদয়ের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইহার ফলে দেখা যায়, আমাদের দেশ হইতে বিদেশীরা আট কোটী মণ তূলা লইয়া যায় এবং এদেশে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ লক্ষ মণ সূতা ও একশত পঁচিশ কোটী টাকার কাপড় আমদানি হয়। সুতরাং এক সূতা ও বস্ত্র খাতেই কত অল্প ধনাগম হয় এবং কত অধিক ধন দেশের বাহিরে যায়! যে সকল সামগ্রী এদেশে আমদানি হয়, তন্মধ্যে শতকরা ২ ভাগমাত্র রেলগাড়ির উপকরণ, ২ ভাগ খনিজ তৈল, ২ ভাগ বাসনাদি, ৩ ভাগ কলকব্জা, ৩ ভাগ রেশম, ৭ ভাগ লোহা-লক্কর, ৯ ভাগ চিনি, ৩৬ ভাগ মদ্য ও ঔষধাদি এবং ৩৬ ভাগ সূতা ও সূতার কাপড়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমদানির শতকরা ৭২ ভাগ এমন দ্রব্যে আমরা ধন ব্যয় করি যাহা চেষ্টা করিলে রহিত করা যাইতে পারে। যদি এমন হয় যে, তূলার চাষ বৃদ্ধি করিয়া গৃহে গৃহে চরকার প্রচলন দ্বারা সূতা নির্মাণ করা যায় এবং তাঁতের উন্নতি ও বৃদ্ধি করিয়া পূর্বের মত দেশী বস্ত্র নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে দেশের অভাব মোচন হইয়া সূত্র ও বস্ত্রের আমদানি রহিত করা সম্ভব হয়। যদি বৈদেশিক মদ্য ব্যবহার করা না যায়, এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ন্যায় কার্যালয় সমূহের বিস্তারের ফলে বিদেশের তুল্যগুণযুক্ত ঔষধ ও বিলাস-দ্রব্য দেশেই প্রস্তুত হইতে থাকে ও তাহার প্রাচুর্যবশতঃ সমান বা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে শতকরা আরও ৩৬ ভাগ ব্যয় রহিত করা যায়। কিন্তু কেবল দেশের অভাব দূর হইলেই ধনাগমন ও ধনবৃদ্ধি হয় না।

অন্নবস্ত্রাদি জগতের সর্বত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য, কিন্তু তাহা সঞ্চয়োপযোগী ধন নহে। উহা যে দেশে উৎপন্ন হয় সে দেশেই হউক আর বিনিময়ের পর বিদেশেই হউক ব্যবহারে ক্ষয় পায়,

তথাপি তাহা অপরিহার্য বলিয়া বিনিময়ের শ্রেষ্ঠপণ্য স্বরূপ বিবেচিত। পক্ষান্তরে বহুমূল্য বস্ত্র, সুগন্ধি তৈল, সাবান, এসেন্স, প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্য কেবল ব্যয়বর্ধক সুতরাং তৎসমুদয় প্রকৃতই ধননাশক। আমাদের কর্তব্য, এই সকল ভোগের বস্তু দেশেই প্রস্তুত করা এবং অপরিহার্য বিনিময়সাধ্য সামগ্রী প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া তাহার বিনিময়ে আয়বর্ধক বা ধনোৎপাদক দুর্লভ যন্ত্রাদি অধিক সংখ্যায় ক্রয় করা যাহাতে দেশে সেই সকল দ্রব্য সুলভ হয় এবং দেশের অধিক সংখ্যক ধনোৎপাদক ব্যক্তি যন্ত্রাদি অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারে। এই কৃষিপ্রধান দেশে যে ক্ষেত্রে হাল চালনা দ্বারা যত পরিমাণ শস্য উৎপাদন করা যায়, এবং যে ক্ষেত্রে বর্ষার অভাবে অনুৎপাদক হয়, তাহাতে উক্ত যন্ত্রাদি সাহায্যে বহুসংখ্যক কূপ খনন ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করিয়া ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র-দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ ভূমি গভীরতর ভাবে কর্ষণ করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। আমাদের কর্তব্য, আমাদের দেশোৎপন্ন কার্পাসের বিনিময়ে, কার্পাস-সূত্র ও কার্পাসবস্ত্র নির্মাণোপযোগী যন্ত্রপাতির আমদানি করা, তাহার পরিচালনার জন্য দেশের লোককেই শিক্ষিত করিয়া লইয়া চতুর্দিকে সাহায্যকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা এবং মূলধনী ও দক্ষ লোকের সহযোগে বিস্তৃত কারখানা ও বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করিয়া দেশে ধনাগমের পথ প্রস্তুত করা। কিন্তু তাহার আশা করিতে হইলে একস্বার্থবদ্ধ বহু লোকের মিলিত মূলধনে দেশের কোনো স্থানে যৌথ-কোম্পানী করিয়া অন্তর্বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিতে হয়। এজন্য দেশের প্রত্যেক নরনারীকে অর্থাৎ সকল সন্তানকে এমন শিক্ষা পাইতে হইবে যে তদ্বারা দেশের স্বার্থ কি এবং কোথায় তাহা প্রত্যেকেরই বোধগম্য হয়, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারে, বিলাসী ধনকুবের হইতে ক্ষেত্রকর্ষণকারী ও ভারবাহী পর্যন্ত সকলের ভোগে সংযম আসে, দেশের অধিকাংশ লোকের কৃষক, শিল্পী ও শ্রমকদিগের চরিত্রগঠনের সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব কার্য সহায়ক শিক্ষা লাভ হয় এবং প্রধানতঃ দেশনায়ক ও যৌথকোম্পানীর পরিচালকগণের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এবং জগতের বাণিজ্যে বণিকদিগের বাজারসম্ভ্রম

জন্মাইতে সমর্থ হয়। এইরূপে জাতীয় চরিত্র গঠিত হইলে তাহাই শ্রেষ্ঠ মূলধন হইয়া দাঁড়ায়।

দেখা যায় জগতে যে সকল দেশ দরিদ্র এবং জগতের পণ্যবিনিময় ক্ষেত্রে বাজারসম্ভ্রমশূন্য, সেই সকল দেশেই অশিক্ষিত অলস অকর্মণ্য এবং চরিত্রহীন লোকের সংখ্যা অধিক ; তথায় ধনোৎপাদক অপেক্ষা ধনভোগীর সংখ্যাই অধিক। ভিখারী পরের অন্নে ভাগ বসায় অর্থাৎ স্বয়ং ধন উৎপাদন না করিয়া অন্যের উৎপাদিত ধন ভোগ করিয়া ক্ষয় করে। এইরূপ রুগ্ন, বৃদ্ধ, অসমর্থ, সকল শিশু, উপার্জনক্ষম হইবার পূর্ব পর্যন্ত সকল পুরুষ এবং ধনোৎপাদক নরনারীর শ্রমের বা কর্মের সহায়ক ব্যতীত সকলনারী ধনভোগই করিতে থাকে। উৎপাদন করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় লোক-বৃদ্ধি দেশের দারিদ্র্যবর্ধক। য়ুরোপে ধনবৈজ্ঞানিক ম্যাল্‌থাস্ সাহেব এই লোকসংখ্যা হ্রাস করিবার যে উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য জগতের নানাস্থানে যাহার অনুসরণ করা হইতেছে তাহার আলোচনার এখানে স্থান নাই। আমরা লোকসংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা না করিয়া শিক্ষিত ও কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই প্রকৃষ্টতর উপায় বলিয়া মনে করি। দেশের সকল লোক কিছু একরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করে না। কিন্তু কি কৃষি; কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য যে কোন ক্ষেত্রে বিদেশের পণ্যের সহিত যাহার বিনিময় দ্বারা দেশে ধনাগম হইতে পারে, এমন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার প্রতি লক্ষ্য যদি দেশের প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তির হয়। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোকই যদি ধনোৎপাদক হয়, তবেই দেশ সম্পন্ন হয় এবং জাতীয় ধনের বৃদ্ধি সম্ভব হয়। তখন তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে দেশে কাঁচা মাল এত অধিক উৎপাদন করা যায় এবং কলকারখানার সাহায্যে এত-অধিক পরিমাণ ব্যবহার্য দ্রব্য এমন নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত করা যায়, যে তাহাতে অন্তর্বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা জাতীয় অভাব মোচন করিবার পর অনাবশ্যক বা উদ্বৃত্তাংশ জগতের পণ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় হয় এবং গুণে কাহারও অপেক্ষা হীন না হওয়ায় আদৃত হয়। অতঃপর দেশের আবশ্যক দ্রব্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ও অধিক মূল্যবান ধন দেশে আনিতে হয়। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা অর্থ যদি

দেশে প্রবেশ না করে তথাপি ক্রীত পণ্যের বিনিময় করিবার স্বত্ব মাত্র ক্রয় করিতে পারিলেই দেশে ধনাগম হয় বুঝিতে হইবে।

সাধুতাই সিদ্ধির মূল

"অর্থই সাধুতার কষ্টিপাথর।"
"সাধুতা আসলে কিছুই নহে, যদি তাহা প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়।"

সাধুতাই যে সিদ্ধির মূলমন্ত্র একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বাণিজ্যেও, সাধুতাই সিদ্ধির মূলমন্ত্র, একথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করেন না। কোন কোন নীতিতত্ত্বজ্ঞ এমনও বলিয়াছেন যে, "যাহারা দ্রব্যসামগ্রী অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, সাধুতার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই।" তাহাদের অভিপ্রায়ানুসারে চলিতে গেলে দোকানপাট তুলিয়া দিতে হয় এবং বড় বড় বাণিজ্যের কুঠী বন্ধ করিয়া বসিতে হয়। ক্রীত মূল্যের উপর যে লাভ রাখিয়া পণ্য বিক্রীত হয়, ইহা সকলের জ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। এই লাভ বণিকের পরিশ্রমের মূল্য। গ্রাহক দেশ-বিদেশের সামগ্রী ও স্বীয় প্রয়োজনীয় বস্তু ইচ্ছামত সময়ে গৃহদ্বারে প্রাপ্ত হইবার সুবিধা বণিকের নিকট তাহার লাভের পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে

অসাধুতার লক্ষণ নাই। কিন্তু অযথা মূল্য বৃদ্ধি করা, একই বস্তু একজনকে একদরে এবং অপরকে অন্য দরে বিক্রয় করা, দ্রব্যে কৃত্রিমতা করা এবং গ্রাহককে যে রূপেই হউক বঞ্চনা করা অসাধুতার নিদর্শন। সাধুতার অভাব হইলে ব্যবসায়ীর পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সততা বা সাধুতা যে সিদ্ধির মূলমন্ত্র, ইহা যেরূপ অন্য সকলের পক্ষে খাটে, ব্যবসায়ীর পক্ষেও ঠিক তদ্রূপই প্রযুক্ত হয়।

দোকানগুলা কেবল গ্রাহক ঠকাইবার স্থান এবং পণ্য যথার্থ মূল্যে অপ্রাপ্তব্য মনে করিয়া ক্রেতা যদি দোকানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং বিক্রেতার যদি ধারণা থাকে যে ক্রেতা দরস্তুর না করিয়া ও কথিত মূল্য হ্রাস না করিয়া কোন দ্রব্যই লইবে না, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পরস্পরে বিশ্বাস নাই। ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময়ক্ষেত্রে বিশ্বাসই সিদ্ধির মূল। বিশ্বাস হারাইলে ব্যবসায় চলে না। বিশ্বাস হারাইলে সাধুতার অভাব হয় এবং তাহাই পতনের পথে লইয়া যায় ; কারণ বিশ্বাসই ব্যবসায়ীর মূলধন। মূলধন হারাইয়া ব্যবসায়ী কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? এদেশে বাণিজ্যক্ষেত্রে এই মূলধনের তীব্র অভাব অনুভূত হয়। সেই জন্যই ঋদ্ধির পথ সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থাকায় দরদস্তুর করিতে করিতে ও দশ দোকানে ঘুরিতে ঘুরিতে যে অমূল্য সময় ও শক্তি নষ্ট হয়, সময়ের মূল্য না বুঝিলে তাহার প্রতিকার হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের পক্ষে ইহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষেই সত্যনিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠাই সাধুতার লক্ষণ।

কীর্ণাহারের প্রসিদ্ধ তূলা ব্যবসায়ী ৺রামানন্দ রায় দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তিনি মূলধনের অভাবে টাকা ধার করিয়া তূলার ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং মুর্শিদাবাদের জনৈক প্রসিদ্ধ মহাজনের গদিতে তূলা খরিদ করিতে থাকেন। একবার তাঁহার নিকট মহাজনের অনেক টাকা পাওনা হইলে, কয়েকজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি রামানন্দের অজ্ঞাতসারে রটনা করে যে, রামানন্দ ব্যবসায়ে ফেল হইয়াছেন। মহাজন এই সংবাদে রামানন্দের নিকট পাওনার সমস্ত টাকা এককালে চাহিয়া পাঠান। সত্যনিষ্ঠ ও সাধু রামানন্দ

অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে গিয়া মহাজনের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া আইসেন। মহাজন দুষ্ট লোকের অভিসন্ধি বুঝিয়া এবং রামানন্দের সাধুতা দর্শনে স্বয়ং লজ্জিত হইয়া গদিতে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করেন যে, অতঃপর রামানন্দকে পড়তার দরে তূলা দেওয়া হইবে এবং যত টাকা ইচ্ছা তিনি ধার রাখিতে পারিবেন। এই সুবিধা পাইয়া বিলক্ষণ লাভবান্ এবং ঐশ্বর্যশালী হন। ইনিই পরে স্বয়ংসিদ্ধ মহাজন মহেশ্বর দাসের সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে দুই সহস্র টাকা পুরস্কার দান করিয়াছিলেন। সেই টাকাই মহেশ্বর দাসের অতুল ঐশ্বর্যের মূল হইয়াছিল।

বহুদিন হইল, ফরিদপুর জেলার শিরুয়াইল গ্রামনিবাসী দরিদ্র মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস রিক্তহস্তে কলিকাতায় আসিয়া কর্মের চেষ্টা করেন। এই সূত্রে একজন চীনার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই চীনা বন্ধুর অর্থসাহায্যে ও পরামর্শে তিনি বড়বাজারে 'কান্তি' কড়ার দোকান খোলেন। লাভের অর্ধাংশ চীনার রহিবে ইহাই ধার্য হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতায় তাঁহার 'পসার' এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি স্বীয় লভ্যাংশ দ্বারা স্বাধীনভাবে কান্তিকড়া ও বিলাতী কড়ার আমদানী করিতে লাগিলেন। বিলাতের সওদাগর একবার মাল পাঠাইবার কালে ভুলক্রমে 'চালানে' ৩০০ টাকা কম দাবী করেন। সাধু মৃত্যুঞ্জয় হিসাবে এই ভুল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা সওদাগরকে ফেরত পাঠান। এই সাধুতায় তাঁহার প্রতি সওদাগরের এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি বিনা টাকায় মৃত্যুঞ্জয়কে মাল পাঠাইতে থাকেন। সাধুতা তাঁহাকে সাধারণেরও এরূপ বিশ্বাসভাজন করিয়াছিল যে, এক সময় মৃত্যুঞ্জয়ের কারবারে কলিকাতার বড়বাজার পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ক্রোরপতি রামদুলাল সরকার যখন দশটাকা বেতন পাইতেন, সেই সময় একদিন তাঁহার মনিব তাঁহাকে নীলামে একটি দ্রব্য খরিদ করিতে পাঠান। নীলাম অফিসে পৌঁছিয়া রামদুলাল শুনিলেন, সে দ্রব্য বিক্রীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু একখানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে উঠিয়াছে। জাহাজের কেনা-বেচা ও নীলামের কার্যে তাঁহার ইতিপূর্বেই যে অভিজ্ঞতা ছিল,

তাহার দ্বারা তিনি দেখিলেন, এই জাহাজ নীলামে খরিদ করিলে বিলক্ষণ লাভ থাকিতে পারে, সুতরাং তিনি মনিবের বিনানুমতিতেই তাহা ১৪ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। কিন্তু একজন সাহেব অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহা একলক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া লয়েন। মূল চৌদ্দ হাজার টাকা মনিবকে ফেরত দিয়া লাভের অংশ এক লক্ষ টাকা অনায়াসে তিনি আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি শ্রীমন্ত হইবেন, সাধুতাই যাঁহাকে বাণিজ্যক্ষেত্রে ঋদ্ধির পথে লইয়া যাইবে, দরিদ্র হইলেও তাঁহার এরূপ প্রবৃত্তি হইবে কেন? দশ টাকার সরকার লক্ষটাকার লোভ সম্বরণ করিয়া সমস্ত টাকা মনিবের সমক্ষে রাখিয়া দিলেন এবং বিনীতভাবে আদ্যোপান্ত জ্ঞাত করিলেন। সাধুতার পুরস্কার কোথায় যাইবে? সাধু মদনমোহন সত্যনিষ্ঠ রামদুলালকে ঐ সমস্ত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন। এই মূলধন লইয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সাধুতাকেই মূলমন্ত্র করিয়া অতুল ঐশ্বর্যলাভে সমর্থ হইলেন। এখানে ঐ টাকাই যে তাঁহার প্রকৃত মূলধন ছিল তাহা আমরা স্বীকার করি না। লক্ষ কেন, অনেক ধনীর সন্তান কোটী কোটী টাকার বিষয় দুই দিনেই উড়াইয়া দিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ধনকুবের রামদুলাল সরকারের যে মূলধন ছিল তাহার নাম **সাধুতা** তাহার অন্য নাম **চরিত্র**।

মহাত্মা শৈশা সিংহলদ্বীপের এক দরিদ্র কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুকালে ইনি পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৩৬ টি টাকা, ৪৭ টি বোতল, ২৯ টি শিশি, ১২ টি মৃৎপাত্র, ৩ জোড়া পরিধেয় বস্ত্র, ১ খানি কার্পেট, ৫ খানি মাদুর এবং ২ টি উপাধান ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। শৈশা পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতে তাঁহার বিস্তৃত সংসার চলে না দেখিয়া, প্রতিবেশীর ছিন্ন বস্ত্র সেলাই ও তাহাদের ভগ্ন টেবিল চেয়ার প্রভৃতি মেরামত করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছোট ছোট ভাইভগিনীগণ পাঠশালা হইতে আসিয়া অবকাশমত ফুলের সুন্দর সুন্দর মালা গাঁথিয়া বিক্রয় করিয়াও তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ আনিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া এবং জীবনের বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শৈশা ব্যবসায় অবলম্বন

করেন ; কিন্তু এক দিনের জন্যও তিনি সাধুপথ পরিত্যাগ করেন নাই। এই শৈশাই আজীবন সাধুপথে থাকিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে এত ঐশ্বর্যলাভ করিয়া ছিলেন যে তাঁহার বিষয়ের অবধি ছিল না। তিনি ধনে মানে বদান্যতা এবং মনুষ্যোচিত যাবতীয় সদ-গুণে ভূষিত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা কর্তৃক পূজিত হইয়া গিয়াছেন। সাধারণের নিকট তিনি "লক্ষেশ্বর" বলিয়া অভিহিত হইতেন। সাধুতাই যে ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র, ইহা শত শত দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে ; কিন্তু ব্যবসায়ে যাহারা অসদুপায় অবলম্বন করে, যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া ভীরুর ন্যায় গোপনে প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহারা হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ বিসর্জন দিয়া, যে কোনপ্রকারে অর্থোপার্জনকেই জীবনের সার করিয়া বসে, তাহারা অতি অল্প দিনেই পতিত হয়। তাহারা প্রভূত অর্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত কারবার হাতে পাইয়াও রক্ষা করিতে পারে না। স্বয়ংসিদ্ধ মহাজন স্বরূপচন্দ্র বসু, মৃত্যুকালে যে বিপুল সম্পত্তি ও সুবিস্তৃত কারবার রাখিয়া গিয়াছিলেন, শুনা যায়* তাঁহার উত্তরাধিকারী ও সরীকগণ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া দশ বৎসরের মধ্যেই সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলেন।

অসাধুতায় যে সিদ্ধিলাভ হয় না তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জ্যাবেজ ব্যালফোর এক জন মহামান্য অসাধারণ ধীশক্তিশালী, অতি উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভার সভ্য ছিলেন। ধর্মজগতেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চ ছিল। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মানুরাগ লোকবিশ্রুত ছিল। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই তাঁহার প্রতি অন্ধবিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি যখন "লাইবারেটর বিল্ডিং সোসাইটি" (Liberator Building Society)র জন্য জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ আমানত চাহিলেন, তখন লোকে মুক্তহস্তে তাঁহাকে টাকা দিতে লাগিল। ব্যালফোর একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন এবং অপরদিকে লোকের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃত্রিম হিসাব-পত্র প্রকাশ করিতে থাকিলেন। ক্রমেই সভায় ধনভাণ্ডারের অবস্থা যত শোচনীয়

**মহাজনবন্ধু ভাদ্র ১৩০৯, ১৫৬ পৃষ্ঠা।*

হইতে লাগিল, মহাসভায় এই সভ্য ততই লোকের চক্ষে আপনাকে সাধু প্রমাণ করিবার জন্য উচ্চ মাথা করিয়া অধিকতর নিষ্ঠার সহিত ভজনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন এবং মহাসভার কার্য ও অসংখ্য সভাসমিতির অধ্যক্ষ ও সত্বাধিকারীর কার্য তখন অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন! কিন্তু কথায় বলে, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে"; প্রবঞ্চনা অসাধুতা কত দিন ঢাকিয়া রাখা চলে? ব্যালফোরের ধর্মভাণ, সাধুতার ভাণ, তাঁহার শঠতা লোকের আর অগোচর রহিল না। ছলে বলে যখন আর মান রক্ষা হয় না, তখন একদিন ব্যালফোর যত টাকা হাত করিতে পারিল সমস্ত লইয়া আর্জেণ্টাইন রিপাবলিকে পলায়ন করিল ; কিন্তু সেখান হইতেও তাহাকে ধরিয়া লণ্ডনে আনিয়া তাহার বিচার হইল এবং বিচারে ব্যালফোরের ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হইল। ব্যালফোরের ধন, মান, ধর্মনিষ্ঠা, বিদ্যাবুদ্ধি, উচ্চপদ সমস্ত ভাসিয়া গেল! ব্যালফোরের অসাধুবুদ্ধি, তাহাকে কোনক্রমেই বাঁচাইতে পারিল না।

সুযোগ ছাড়িতে নাই

"সুযোগ সর্বদা আইসে না।"

"যে ব্যক্তি ধন গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে না তাহার আয়ত্তের মধ্যে ধন রাখা বৃথা।" ডাক্তার জন্‌সন্‌।

"যে সকল লোক নির্জনতাপ্রিয় ও "মুখচোরা", পদবৃদ্ধি ও উন্নতির সময় প্রায় তাহারা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কথায় বলে, যে কুকুর ডাকে সে সুপ্ত সিংহ অপেক্ষা অধিক হিতকারী।" রবার্ট হল।

সকলের জীবনেই মধ্যে মধ্যে সুযোগ আসিয়া থাকে। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে না জানিলে, পরে আক্ষেপ করিতে হয়। কারণ, সুযোগ সর্বদা আইসে না এবং যদি বা আইসে, তাহা সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী হয়। কথায় বলে-"চোর পলাইলে বুদ্ধি বাড়ে।" এককথায় বুঝিতে হইবে, চোর ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে পর, লোকে ভাবিতে থাকে-যদি এরূপ করিতাম, যদি এই প্রকারে সাবধান হইতাম, যদি অমুক স্থান দৃঢ় প্রাচীরে বদ্ধ করিতাম, যদি অর্থ ব্যাঙ্কে রাখিয়া আসিতাম, তাহা হইলে চোর কখনই চুরি করিতে পারিত না এবং করিলেও ধরা পড়িত ইত্যাদি। তখন চোর ধরিবার কত কৌশলই আবিষ্কৃত হয় এবং কত বুদ্ধিই তখন যোগায়। কিন্তু তাহা বৃথা—"চৌরেগতে বা কিমুসাবধানম্"? চোর পলাইয়া গেলে সাবধান হইলেই কি, আর না হইলেই বা কি? সেইরূপ, সুযোগ হস্তচ্যুত হইলে আর সহজে পাওয়া যায় না। অধ্যয়নাবস্থায় অনেক ছাত্র উন্নতির স্বর্ণ-সুযোগ ছাড়িয়া দিয়া হাস্য-কৌতুক এবং রঙ্গরসে কৈশোর অতিবাহিত করে এবং পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য ও ভগ্নমনোরথ হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কিন্তু যোগ্যতার নিদর্শনাভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া অলব্ধ-প্রতিষ্ঠ, সংসারভারগ্রস্ত এবং দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সারাটি জীবন তাহাদের নৈরাশ্যে, অসন্তোষে এবং পূর্ব সুযোগের প্রতি জ্ঞানকৃত উপেক্ষার দরুণ আক্ষেপোক্তিতেই কাটিয়া যায়। কর্মস্থলে পদোন্নতির সময় প্রধান কর্মচারী বা কর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিলে অনেকের মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সে সুযোগ ত্যাগ করায় তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমন কি, যদি দেখাও করেন, তথাপি কর্তার কোন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেওয়ায় বা কোন কোন কথা মনে আসিলেও ঠিক সেই সময়ে প্রকাশ না করায়, হয়ত, তাঁহাদের কার্য সিদ্ধ হয় না। পরে তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলেন "হায়! কথাটা কণ্ঠাগত

হইয়া ছিল, কেবল মুখে প্রকাশ পাইল না। যদি সে সময় অমুক কথাটি সাহস করিয়া বলিতে পারিতাম তাহা হইলে একমুহূর্তে আমার কার্য সিদ্ধ হইত ইত্যাদি।" এই "অমুক কথাটি বা অমুক অনুষ্ঠানটি ঠিক সেই সুযোগে বা সেই সময়ে যদি বলিতে বা করিতে পারিতাম" ইত্যাদি আক্ষেপ প্রায়ই শুনা যায়। এই অনুশোচনার কারণ একমাত্র সুযোগ হস্তচ্যুত হইতে দেওয়া। ব্যবসায়বাণিজ্যক্ষেত্রে সুযোগের সদ্ব্যবহার উন্নতির একমাত্র সোপান। ক্রয় বিক্রয় স্থলে যে মহাজন সুলভে উৎকৃষ্ট মাল খরিদ এবং মহার্ঘদরে বিক্রয় করিবার সুযোগ ছাড়িয়া বসেন, তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না। অনেক মহাজন সুযোগ বুঝিয়া মালপত্র আটক করিয়া রাখেন এবং যখন উহার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে, অথচ বাজারে অল্প পাওয়া যায় বা মজুত থাকে না, তখন সুযোগ বুঝিয়া বিলক্ষণ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করেন। এতদ্দ্বারা কত দরিদ্র লক্ষপতি হইয়া যান। সিংহল দ্বীপের দীনহীন ডিকোষ্টা দিবাকর শৈশার পুত্র দরিদ্র শৈশা সুযোগের সদ্ব্যবহার বিলক্ষণ জানিতেন। সুযোগ আসিয়া যে তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহা অসম্ভব ছিল। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা ভাবিতেন, যাহা শুনিতেন এবং যাহা করিতেন তাহারই মধ্য হইতে তিনি সুযোগ খুঁজিয়া লইতেন। একদা তিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলেন, শীঘ্রই যুরোপে এক মহাসংগ্রাম বাধিবে। এতদুপলক্ষে যে প্রচুর পরিমাণ অস্থির আবশ্যক হইবে তিনি বুঝিতে পারিলেন। সংগ্রাম সম্বন্ধে যখন তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না, তখন তিনি নানা স্থান হইতে বহুশ্রম ও কষ্ট করিয়া অস্থি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিছু কালের মধ্যে তিনি কলম্বো নগরে প্রায় ১২টি গুদাম অস্থিতে পূর্ণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মহাজনদিগের নিকট যুরোপ ও মার্কিন হইতে লক্ষ লক্ষ মণ হাড়ের জন্য তাগাদা আসিতে লাগিল। তাগিদের উপর তাগিদ আসিতে আরম্ভ হইল। কিন্তু মহাজনের ঘরে মাল নাই ; এ দিকে বর্ষাগমে হাড় সংগ্রহও সুকঠিন সুতরাং এই সুযোগে দরিদ্র অস্থিসংগ্রাহক শৈশা জাহাজ ভরিয়া ভরিয়া হাড় সরবরাহ করিতে লাগিলেন। এই এক সুযোগে তিনি ১,৮৭,০০০ টাকা লাভ করিলেন। এই টাকা মূলধন করিয়া তিনি বিস্তারিত বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং কোটি কোটি টাকা উপার্জন ও সঞ্চয়

করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ টাকা জনহিতার্থ ব্যয় করিয়া 'মহাতা' শৈশা এবং 'লঙ্কেশ্বর' নামে জনসাধারণের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইলেন। সুযোগ ছাড়িতে নাই। সংবাদপত্রের সংবাদস্তম্ভ মহাতা শৈশাকে যে সুযোগের আভাস দিয়াছিল তিনি তাহা হস্তচ্যুত হইতে দিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন কি না কে বলিতে পারে? বীরভূমের অন্তঃপাতী কীর্ণাহার গ্রামের দরিদ্র তাম্বুলব্যবসায়ী সাধুচরণ ২১ বৎসরের পুত্র মহেশ্বরের উপর সমস্ত সংসারের ভার দিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইতি পূর্বেই মহেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল; এক্ষণে নিঃস্ব অবস্থায় বৃহৎ সংসারের গুরুভার যুবকের মহা সমস্যার বিষয় হইল। কিন্তু তিনি উচ্চাভিলাষী এবং সুযোগগ্রাহী ছিলেন। ত্রিশবৎসর বয়সে তিনি তাম্বুলব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অধিকতর লাভজনক তূলার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কীর্ণাহারে রামানন্দ রায়ের গুদাম হইতে তূলা ধার করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এবং মিতব্যয়িতার গুণে সংসার প্রতিপালন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে সুযোগগ্রাহীর নিকট একদিন সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। রামানন্দ রায় একবার তাঁহাকে তূলা খরিদ করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ পাঠান। তথায় মহেশ্বর ৮ টাকা দরে তূলা খরিদ করিয়া পথে আসিতে আসিতে শুনিলেন তূলার দর হঠাৎ ১৬ টাকা হইয়াছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সমস্ত তূলা এক সাহেবকে ১৬ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া গৃহীত মূলধনের দ্বিগুণ অর্থ প্রাপ্ত হন। এবং সাধু রামদুলালের ন্যায় সমস্তই মহাজনকে প্রদান করেন। মহাজন তাঁহার সাধুতায় সন্তুষ্ট হইয়া ২০০০ টাকা তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন। এই মূলধন লইয়া মহেশ্বর তখন স্বয়ং তূলার কারবার স্থাপন করেন। ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ করিয়া তিনি কয়েক খানি জমিদারি ক্রয় করেন এবং ভূম্যধিকারী শ্রেণীভুক্ত হন। এই মহাজন একবার তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া বৃন্দাবন যাইবার পথে দেখিলেন, এদিকে তূলার কারবারে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। তাঁহার সহিত চারিসহস্র টাকা ছিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ঐ টাকায় তূলা খরিদ করিয়া সুযোগ বুঝিয়া বিক্রয় করিলেন এবং প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া তীর্থস্থানে ধর্মার্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে সমর্থ হইলেন।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পরিলে, চাকরি করিতে করিতেই কিরূপ আত্মোন্নতি সাধন ও সমাজের এবং দেশের কিরূপ হিতসাধন করিতে পারা যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুর কৃষিশালার প্রতিষ্ঠাতা স্বত্বাধিকারী এবং প্রেসিডেন্ট হেমবাবু রেলীব্রাদার্সের পাট খরিদের কর্তা। বহুপরিশ্রমে চাকরি বজায় রাখিয়া অবকাশকালে তিনি এই কৃষিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অবসরকালেই তাহার বন্দোবস্ত ও পর্যবেক্ষণ করেন। সারাদিন চাকরিস্থানে কার্য করিবার পর গৃহে আসিয়া কয়জন ব্যক্তি পরিশ্রম স্বীকার করিতে চাহেন? কিন্তু যাঁহারা সুযোগগ্রাহী তাঁহারা কখনই সুযোগ নষ্ট হইতে দেন না। দেশের ভদ্রসন্তানগণ বিনা ব্যয়ে যাহাতে উদ্ভিদবিদ্যা, ক্ষেত্রকৃষি ও উদ্যানকৃষি শিক্ষা করেন, সাধারণে যাহাতে আনাড়ী চিকিৎসক ও নিরক্ষর বেদিয়া বা বেনিয়ার দ্বারা প্রতারিত না হইয়া আয়ুর্বেদোক্ত প্রকৃত ওষধি প্রাপ্ত হন, তিনি তাহার উপায়স্বরূপ কৃষিশালা, কৃষিবিদ্যালয়, কৃষিপুস্তকাগার, কৃষিপরীক্ষাগার ও আদর্শ পরীক্ষাক্ষেত্র, নার্শারী, গোশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, সারপ্রস্তুতকরণ, শস্যনাশী কীটাদি বিনাশের ব্যবস্থাকরণ, কৃষিগ্রন্থ প্রণয়ন, সাময়িক পত্র প্রকাশ পুষ্প ও কৃষি প্রদর্শন, নূতন নূতন প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়ার প্রবর্তন এবং সুযোগ্য ছাত্রগণকে পুরস্কার, বৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা উৎসাহদান ইত্যাদি কার্যে হেমবাবু দেশের কত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। সুযোগগ্রাহী না হইলে কি তিনি এতদূর করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেন?

জি এস পরাঁজপে নামক একটি দরিদ্র ছাত্র কুলকারণীর পরিচারক হইয়া জাপানে গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কেবল পরিচর্যা ও রন্ধনকার্যেই সময়াতিপাত করেন নাই। কুলকারণী যখন শিক্ষালাভে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন সুযোগগ্রাহী পরাঁজপে জাপানের শিল্প ও রসায়ন বিদ্যা এবং তৎসঙ্গে সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখিতেন। প্যারেল নামক স্থানে "ডায়মণ্ড সোপ ওয়ার্কস" নামক যে সাবানের কারখানা হইয়াছে, তাহা এই দরিদ্র যুবকের সুযোগগ্রাহিতার ফল।

যে নিকলসন সাহেব "জাপানে কৃষি" সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ ও জনহিতকর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট

জাপানী প্রথায় মৎস্য ধৃতকরণ ও তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্ম সম্পাদনকালে কৃষিসম্বন্ধে জাপানী প্রথা পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ভুলেন নাই। ঐ গ্রন্থ তাহারই ফল। যাঁহারা স্বাবলম্বনবলে শ্রীসম্পদ ও মনুষ্যত্বের উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুযোগগ্রাহী ছিলেন। জীবনে সিদ্ধি ও সফলতা লাভ করিবার ইহাই উপায়।

একজন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, দর্শন এবং বিজ্ঞানাদিতে বিশারদ হইলেই যে তিনি ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন হইবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। সংসারে দেখা যায়, অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি ব্যবসায়বুদ্ধিশূন্য হওয়ায় দীনভাবে এবং অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, ব্যবসায়বুদ্ধি এবং সুযোগগ্রাহীতা দ্বারা জগতে প্রতিপ্রত্তি লাভ করেন এবং সুখস্বচ্ছন্দে, মানসম্ভ্রমে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন।

যে সুযোগ একজন পণ্ডিত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করেন, একজন ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সে সুযোগ ত্যাগ করিতে পারে না। অনেকে আবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন; সুযোগ আসিলে তাঁহারা তাহার সদ্ব্যবহার করেন। এই শ্রেণীর লোককেও ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন বলা যায়। সুযোগগ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিদেরই মুখে 'দুঃসময়', 'শনির দৃষ্টি', 'রাহুর দশা' প্রভৃতি বাক্য, কি সংসারে, কি বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রায়ই শুনা যায়। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতই ব্যবসায়বুদ্ধিবিশিষ্ট ও সুযোগগ্রাহী তাঁহারা 'দুঃসময়', 'কুগ্রহ' প্রভৃতির "ধার ধারেন না"—তাঁহারা বিপদেও মস্তিষ্ক শীতল রাখেন এবং সর্বনাশের মধ্য হইতেও ভাবী-মঙ্গলের বীজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। লিমরিক সহরের তামাকব্যবসায়ী মিষ্টার লণ্ডীফুট ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র দোকান ছিল। সামান্য তামাক বিক্রেতা হইলেও তিনি অসামান্য ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালী ছিলেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে লণ্ডীফুটের দোকানে আগুন লাগিয়া সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। পরদিন প্রভাতে তিনি সন্তপ্ত-হৃদয়ে ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কৌতুহলদৃষ্টি এক বিষয়ে আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, কয়েকজন দরিদ্র প্রতিবেশী দগ্ধ তামাকের সৌগন্ধ ও স্বাদ গ্রহণ করিয়া এত প্রীত

হইয়াছে যে, সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যত পারিতেছে পোড়া তামাক লইয়া যাইতেছে। ঘটনাটি অতি সামান্য হইলেও তাহা লণ্ডীফুটের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। ইহার মধ্য হইতেই তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে আশার আলোক প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পোড়া তামাক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অধিক উত্তাপ লাগিয়া অনেকটা তামাক উগ্রতা ও সৌগন্ধে উৎকৃষ্ট নস্যে পরিণত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তিনি একটি নূতন ব্যবসায়ের সঙ্কেত পাইলেন এবং ব্লাকইয়ার্ড নামক স্থানে বাড়ি ভাড়া করিয়া তথায় প্রকাণ্ড তন্দূর নির্মাণ করিলেন। সেই তন্দূরে তামাক পোড়াইয়া নানা প্রকারে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে যে পরীক্ষায় নস্য সন্তোষজনক এবং উৎকৃষ্ট হইল, তিনি সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাহাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। লিপ্‌টনের 'চা'র মত তাঁহার "ব্লাকইয়ার্ড নস্য" সুপ্রসিদ্ধ হইল। দরিদ্র লণ্ডীফুট শ্রীমন্ত হইলেন। পরশ্রীকাতর লোকেরা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল-"কপাল"! যে যাহাই বলুক, 'কপালের গ্রহ' যথায় আর একজনের সর্বনাশের হেতু হইত, ব্যবসায়বুদ্ধি ও সুযোগগ্রাহিতা তথায় লণ্ডীফুটের ঋদ্ধিলাভের পথপ্রদর্শক হইল! যে ইঙ্গিত পূর্বসংগ্রহকারী প্রতিবেশিগণের দুর্বোধ্য ছিল, দরিদ্র লণ্ডীফুট সেই ইঙ্গিত পাইয়া বিনাশের মধ্য হইতে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি সুযোগ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করেন নাই। তাঁহার এই উপস্থিত-বুদ্ধি, এই সুযোগগ্রাহিতাই তাঁহার কপাল বা অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিল।

দূরদর্শী মিঃ রবার্ট হল বলেন—"যিনি নিতান্ত মুখচোরা, স্বীয় প্রাপ্যের জন্য যিনি আবেদন করিতে কুণ্ঠিত, সর্বদাই যিনি সকলের নিকট সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, যেন কি অপরাধ করিয়াছেন এবং যে তজ্জন্য সর্বদাই লজ্জিত, জড়সড়, উপযুক্ত সময় বুঝিয়াও যিনি সে সুযোগে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন না, যিনি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না তিনি কি চাহেন, তিনি জগতের এক অদ্ভুত জীব তাহাতে সন্দেহ নাই ; তিনি খুব অমায়িক, শান্ত, শিষ্ট, প্রশংসিত হইতে পারেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতি ও কোলাহলময় জীবন-সংগ্রামের পেষণে, তিনি যে শুদ্ধ

উপেক্ষিত ও অতিক্রান্ত হইবেন এমন নহে, নিগৃহীত এবং পদদলিতও হইবেন।"



"দৃষ্টান্ত সিদ্ধির সম্ভাবনা প্রমাণ করে।" বোল্টন্।

"মহৎ চরিত সবে করায় স্মরণ,
মোরাও করিতে পরি মহৎ জীবন;" লংফেলো।

"তব পূর্ব পিতৃগণ, সাধি কর্ম সাধুতম,
গড়েছিলা প্রাচীন ভারত।
তোমরাও তাঁহাদের যোগ্য বংশধর সম
কর্মযোগে হও সবে রত।

* * * *

কর্ম কর; হয়ে কর্মবীর,
সম্মুখে আদর্শ রাখ স্থির।" হিন্দুপত্রিকা, যশোহর।

জগতে যাঁহারা উন্নত ও মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এক একটি আদর্শ ছিল। কবিকুলতিলক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবাব আবদুল লতীফ ও মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সহপাঠী ছিলেন। একদা তিনজনে আপনাপন ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কথোপকথন করিবার কালে প্রত্যেকে স্ব স্ব জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। মধুসূদন বলেন, "আমি বায়রণের তুল্য কবি হইতে ইচ্ছা করি।" নবাবসাহেব বলেন,, "অত্যুচ্চ পদলাভ করা আমার ইচ্ছা।" ভূদেব বলেন,—"দেশের কল্যাণ সাধনে আমার জীবন

অতিবাহিত হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।" বলা বাহুল্য তিন জনেই স্ব স্ব আদর্শ মত জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

আত্মোন্নতি পরোন্নতির সহায় ; কারণ একের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত অপরের উন্নতিপথের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে। এইজন্য যাঁহারা স্বাবলম্বন বলে স্বকীয় শ্রম, অধ্যবসায়, সাধুতা, সুযোগগ্রাহিতা, মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়শীলতা দ্বারা সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতি করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং শ্রীমন্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই ঋদ্ধি-পথাবলম্বীদিগের লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকেন। এই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামদুলাল সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, কৃষ্ণপান্তি, তাতা, গারফিল্ড, লিনকন্, ফ্রাঙ্ক্লিন্, প্যালিসি, কার্ণেগী, রকফেলার এবং টমাস লিপ্টন আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। যে ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যায় "বিদ্যাসাগর," দয়াদাক্ষিণ্যে "দয়ার সাগর", ধনে অভাবশূন্য, যশে লোকবিশ্রুত, মানে শীর্ষস্থানীয়, পরোপকারে অদ্বিতীয় এবং প্রতিভার অবতার বলিয়া পূজ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম জীবনের কথা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন?—যিনি উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিয়া সকলের আদর্শস্থল হইয়া আছেন, অষ্টমবর্ষ বয়সে তাঁহার দরিদ্র পিতা তাঁহাকে বীরসিংহ গ্রাম হইতে পদব্রজে কলিকাতায় তাঁহার প্রতিপালকের গৃহে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বালক স্বয়ং বাজার করিতেন, স্বহস্তে পাক করিতেন এবং এক হস্তে উনানে ইন্ধন দিতেন ও এক হস্তে পুস্তক লইয়া পাঠ অভ্যাস, করিতেন, তৎপর সকলকে পরিবেশন ও কনিষ্ঠ সহোদরদিগকে আহার করাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। পরে বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিয়া আহারাদির পর প্রায় সমস্ত রাত্রি অনন্যমনে পাঠাভ্যাস করিতেন। তাঁহার এই অধ্যবসায় এই নিষ্ঠা এবং এই স্বাবলম্বন তাঁহাকে উভয়—বাণী এবং কমলার কৃপালাভে সমর্থ করিয়াছিল। তিনি কি কি করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে আমাদের লক্ষ্য নহে, কর্মবীরের কর্মের তালিকা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু কর্মবীর কিরূপে হয়, তিনি কর্ম করিবার পূর্বে কি প্রকারে কর্মবীর হইলেন তাহাই দ্রষ্টব্য। এক্ষণে এই মহাপুরুষের বাল্য জীবনের বন্ধুরতা এবং ক্লেশের কাহিনী শ্রবণ করিয়া কি কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন? ধনীর সন্তান হইলে তাঁহার গৌরব করিবার কিছুই নাই ; বরং তাহা না হইলে অগৌরব আছে। কিন্তু

দরিদ্র যখন স্বাবলম্বন ও চরিত্রবলে ধনী হন তখন তাঁহার প্রথম জীবন—সেই দারিদ্র্যক্লেশপূর্ণ জীবনই অধিকতর গৌরবময় হয়। আত্মজীবনীতে মহাত্মা কার্ণেগী স্বীয় হীনতম অবস্থার উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তাঁহার বাল্যকালের সহকর্মী কাককার্গো আলিঘানি ভ্যালি রেল রোডের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ রবার্ট পিকটের্ণ এবং প্রসিদ্ধ এটর্ণি মার্ল্যাণ্ড কার্ণেগীর সঙ্গেই রাজপথ সম্মার্জন করিতেন! সার রবার্ট পীল ল্যাঙ্কাসায়ারের একজন সামান্য তন্তুবায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; মহামতি গ্লাডষ্টোন লিভারপুলের একজন ব্যবসাদারের পুত্র ছিলেন ; ব্রাইট ছিলেন কার্পেট ব্যবসায়ী ; মন্ত্রী চেম্বার্লেন গজাল পেরেক তৈয়ার করিতেন! হগার্থ সেকরার কার্য করিতেন ; নিকলাস্ পৌসীন গ্রাম্য গুরুমহাশয় ছিলেন ; চ্যানট্রী মুদির দোকান করিতেন এবং উইলিয়ম ব্লেক ঘোড়ার সাজ তৈয়ার করিতেন!

দরিদ্রের সন্তান কৃষ্ণপান্তি কষ্টের সংসারে মানুষ হন। কিন্তু তাঁহার বীরহৃদয় দুঃখ-দৈন্যের সহিত সংগ্রামে কখন দমিত হয় নাই। সহস্র বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহার শ্রীমন্ত পুরুষ হইবার সাধ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সংসারসমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীলাভ করিতে হইলে যে সকল গুণ. যে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, তিনি লোক-লোচনের অন্তরালে সেই সমুদয় ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিতে ছিলেন। জ্ঞানপিপাসা তাঁহার এমনই ছিল যে দারিদ্র্যবশতঃ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সেবায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিতেন। তিনি স্বয়ং বলিতেন "এই গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বাটী গিয়া তাঁহাদের তামাক সাজিয়া দিই এবং সে রাজ্যের কথা শুনি।" গাংনাপুরের হাট তাঁহার জন্মস্থান রাণাঘাট হইতে ছয় মাইল দূরে। ১৬ বৎসরের বালক চাউল ছোলা প্রভৃতির মোট মাথায় করিয়া প্রত্যহ ঐ হাটে বিক্রয় করিয়া আসিত। ক্রমাগত তিন বৎসর এইরূপে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণপান্তি কয়েকটি বলদ ক্রয় করিলেন এবং ধান্য ও চাউল প্রভৃতি তাহাদের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া পূর্ব্ববৎ হাটে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। হাতে কলমে কাজ করায় এবং বিশেষ সতর্কতা ও সঞ্চয়শীলতার সহিত

শ্রম ও অধ্যবসায় মিলিত হওয়ায়, কৃষ্ণপান্তির ব্যবসায়-বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার পুরুষকারের পুরস্কার স্বরূপ ব্যবসায়ে একবার ৭৭৫০ টাকা লাভ হইল। এই অর্থে তিনি নীলামের দ্রব্যাদি খরিদ ও বিক্রয় আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে অধকতর অর্থ সঞ্চিত হইলে, তিনি লবণের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতেই তাঁহার লক্ষ্মীলাভের পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে হাটখোলার মহাজনদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। তিনি পরে রাণাঘাট ক্রয় করিয়া গ্রামের অনেককে অর্থ দিয়া সুন্দর সুন্দর বাসভবন নির্মাণে সাহায্য করিয়া, সুরম্য উদ্যানশ্রেণী এবং স্বীয় ভদ্রাসন, অশ্বশালা প্রভৃতি নির্মাণ এবং সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া অল্পদিনেই রাণাঘাটের শ্রী ফিরাইয়া দিলেন। তিনি মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর জন্য একবার তিনলক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা তাঁহার বদান্যতায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "চৌধুরী" উপাধি দান করেন এবং বড়লাট লর্ড ময়রা তাঁহাকে "পলনাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনিই রাণাঘাটের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রখ্যাত পাল চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার যৌবনের প্রারম্ভে জনৈক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারে ৫ টাকায় শিক্ষানবীশ এবং পরে ১০ টাকায় সরকার পদে নিযুক্ত হন। তিনি আজীবন সরকারী করিলে সহস্র টাকা সঞ্চয় করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু যিনি রামদুলালকে শ্রীমন্ত করিবেন, তিনি পূর্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সাধুতা সত্যপ্রিয়তা, সৎসাহস, অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা, অবিচলিত অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং উচ্চাভিলাষের বীজ নিহিত করিয়াছিলেন। রামদুলাল কি জীবিকার্জনের অধম স্তর চাকরির চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? বয়সের সহিত তাঁহাতে কৃতজ্ঞতা, সৌজন্য ও বিনয়াদি গুণ স্ফূর্তিলাভ করিল এবং তিনি "চরিত্র"রূপ মূলধন লইয়া বাণিজ্যের বিরাটক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; তখন বাণিজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। লক্ষ্মীর কৃপায় তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন এবং বঙ্গের ধনকুবের শ্রেণীতে উচ্চাসন লাভ করিলেন। তিনি এত ধন উপার্জন করিয়াছিলেন যে, একদা তিনি এক কিস্তিতে চল্লিশ লক্ষ টাকা মহাজনদিগকে দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাত্মা

রামদুলাল সরকার পরহিতব্রতে বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

অনেকের ধারণা ছিল এবং এখনও সে ধারণা এককালে বিলুপ্ত হয় নাই যে, শ্রম কেবল দরিদ্রের পক্ষে, নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এবং বালকের পক্ষেই প্রশস্ত। ফলেও দেখা যায়, এদেশের যে বালকেরা একটু চট্‌পটে এবং শ্রমশীল, তাহারাই কৈশোরে অধিকতর ধীর, যৌবনে গম্ভীর, প্রৌঢ়ের ন্যায় প্রশান্ত, শ্রমবিমুখ এবং সংসারভারাক্রান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট হয়। এই সকল যুবক প্রৌঢ়ে বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়া সকল বিষয়েই শিথিল হইয়া পড়ে। ভৃত্য রাখিবার সঙ্গতি নাই বলিয়াই ভিখারী ও দরিদ্রকে স্বহস্তে সকল কর্ম করিতে হয়। ধনী অসংখ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া জড়বৎ অবস্থান করেন। ভৃত্যগণের প্রভুভক্তির জন্য তাঁহাদের অঙ্গচালনাবও অবসর হয় না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া দুই আনার পণ্য ক্রয় করিয়া স্বহস্তে গৃহে আনিতে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু ভারতবাসী আর কতকাল এই ভ্রমে পতিত থাকিবেন? পূর্বে জাপান এবং পশ্চিমে আফগান-কুল-চূড়ামণি আমীর আবদর রহমানের দৃষ্টান্তই কি এই ভ্রান্তি অপনোদনে যথেষ্ট নহে? জাপানের উল্লেখ এস্থলে বাহুল্য মাত্র। আমীর সাহেব তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি গুণে পাশ্চাত্য জগতেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যেরূপ পরিশ্রম, কর্তব্যপরায়ণতা, সুশাসন ও প্রজাবৎসলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে চিরজাজ্বল্যমান থাকিবে। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫/৬ ঘণ্টা মাত্র আহার ও বিশ্রামে অতিবাহিত করিতেন; অবশিষ্টকাল বিবিধ সামাজিক, ধার্মিক এবং রাজনৈতিক কার্যে ও অধ্যয়নে ব্যয় করিতেন। তাঁহার অসাধারণ উদ্যম ও কর্মশক্তি-বলে ২১ বৎসরেব মধ্যে অরণ্যপর্বত-সঙ্কুল এবং অজ্ঞানতাচ্ছন্ন আফগানিস্থানের শ্রী ফিরিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত পর্যটক ডাক্তার লিভিংষ্টোন সঙ্গতি অভাবে উচ্চশিক্ষা লাভের সুবিধা না দেখিয়া প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম দ্বারা কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে থাকেন এবং তাহারই ফলে তিনি সিদ্ধকাম হন।

সার টাইটাস্ সল্ট্ দরিদ্র কৃষকের পুত্র ছিলেন কিন্তু তাঁহার তীব্র উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে কৃষকের কুটীর ও মুষ্টিমেয় কৃষিক্ষেত্রের চতুঃসীমার

মধ্যে বদ্ধ থাকিতে দেয় নাই। সল্ট্ যৌবনে পদার্পণ করিয়াও বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত সদ্গুণাবলী স্ফূর্তি লাভ করে এবং তাহার ফলে তিনি কোটী কোটী টাকা অর্জন করেন। এই যুবক পরে আলপাকাবাণিজ্যের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার বিরাট কলাভবন সহস্র সহস্র লোকের অন্নসংস্থান করিয়াছে। কর্মচারীদিগের বাসের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসভবন, বিদ্যালয়, পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, সুন্দর ভজনালয় এবং মনোহর উদ্যানাদি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই কলাভবনের নাম সল্টেয়ার। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অর্থপূজক ছিলেন না। পরহিতার্থে তিনি রাশি রাশি অর্থ বিতরণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি স্বয়ং ধনকুবের হইলেও ধনীদিগের স্বভাবসিদ্ধ আরামপ্রিয়তা, অধ্যয়নবিমুখতা, অহঙ্কার প্রভৃতি কলঙ্ক তাঁহাতে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার অমিয় ব্যবহারে উচ্চ নীচ সকলকেই আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ধনবত্তা, বদান্যতা এবং দেশহিতৈষণার পুরস্কারস্বরূপ পার্লামেন্ট মহাসভার সভ্য, নগরপাল এবং ব্যারনেট্ উপাধিতে ভূষিত হন।

যে হোরেস গ্রীলি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি নিউহাম্পসায়ারের পার্বত্যপ্রদেশের এক দীন দুঃখী কৃষকের নির্জন কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৌরবের দিনে তাঁহাকে আমরা এক্ষণে দেখিতে চাহি না। কিন্তু বড় হইবার পূর্বে তিনি যাহা ছিলেন তাহাই দেখিতে হইবে। শৈশবে তিনি জননীর নিকট অধ্যয়ন করিতেন এবং সারাদিন ক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা পিতার সাহায্য করিতেন। ক্রমে পাঠে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে যে, ক্ষুদ্র বালক গ্রীলি সাত মাইলের মধ্যে যে সমস্ত পুস্তক পাইতেন তাহা চাহিয়া আনিয়া পাঠ করিতেন। প্রদীপ জ্বালাইবার তৈলাভাবে তিনি কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং প্রতি রাত্রে তাহা জ্বালাইয়া একান্ত মনে অধ্যয়ন করিতেন। হোরেস যখন দশ বৎসরের বালক , তখন তাঁহার পিতা দেউলিয়া হওয়ায় বাড়ি ঘর আসবাবপত্র সমস্ত বিক্রীত হয় এবং তিনি ধৃত হইবার ভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করেন। সর্বস্বান্ত হইয়া এখানে যখন তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতে থাকেন, তখন হোরেস কাষ্ঠাদি বিক্রয়

করিয়া কিছু সঞ্চয় করেন ও তাহাতে সেক্সপীয়র, হেমেন্স প্রভৃতির কবিতাগ্রন্থ ক্রয় করিয়া পাঠ করেন। মুদ্রাকর হইবার বাসনায় তিনি এগার বৎসর বয়সে নয় মাইল পথ হাঁটিয়া জনৈক সংবাদপত্র-প্রকাশকের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখিয়া বলেন-"তুমি অতি শিশু, কোন কাজের যোগ্য নহ।" হোরেস তখন ক্ষুণ্ণ মনে তিন শিলিং মাত্র পুঁজি ও অল্প আহারীয় লইয়া ১২০ মাইল দূরে জন্মস্থানে গিয়া আত্মীয়দের সহিত দেখা করেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরে কয়েক পেনি অধিক প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যগত হন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি একখানি সংবাদপত্র দেখেন যে ১১ মাইল দূরে একটি ছাপাখানায় উমেদারের আবশ্যক। তথায় গিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার অল্প বয়স এবং দীন বেশ দেখিয়া ছাপাখানার কর্তারা তাঁহাকে পরীক্ষাধীন রাখেন। প্রথম দিবস তিনি নির্বাক হইয়া অক্ষর যোজনার কার্য করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে অন্যান্য বালকগণ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে। হোরেসের সে দিকে দৃকপাত ছিল না, কার্যেই তিনি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিনে অন্য একজন উমেদার 'হোরেসের চুলগুলি খুব কটা' বলিয়া একটি তুলিকা লইয়া তাঁহার মাথায় চারিধারে কালি মাখাইয়া দিল। তখন মুদ্রাকর এবং সম্পাদক উভয়েই একটা কলহ দেখিবার আশায় কাজ বন্ধ করিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন এবার হোরেস ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিবে না। হোরেস কিন্তু ফিরিয়াও চাহিলেন না। বরং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া এক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কালি ধুইয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

দীন বেশের জন্য হোরেসকে অনেকে উপহাস করিত, কিন্তু হোরেস বলিতেন "নূতন পরিচ্ছদের জন্য ঋণগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা পুরাতন পোষাক পরিধান করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ!" তিনি দারুণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও দুর্দশাগ্রস্ত পিতাকে অর্থসাহায্য করিতেন এবং তথা হইতে ৬০০ মাইল পথ হাঁটিয়া পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। কিছু দিন পরে সংবাদপত্র উঠিয়া যাওয়ায় তিনি এখান হইতে বিদায় পাইলেন কিন্তু নানা স্থান ঘুরিয়া ৭ মাসের জন্য অন্য একস্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই ৭ মাসের মধ্যে তিনি এক দিনও বৃথা নষ্ট করেন নাই এবং এখানে যে

১৭ পাউণ্ড* বেতন পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে ৭ মাসে ২৪ সিলিং মাত্র ব্যয় করিয়া এবং ৩ পাউণ্ড হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট ১২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং পিতাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হোরেস স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ভাই ভগিনীদের সুখের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতেন এবং সর্বপ্রকার বিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে উন্নতিলাভ করিবেন তাহারই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার জীবনী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে দুর্নিবার বাসনা ও অসাধারণ উদ্যম থাকিলে বালকেও ঋদ্ধিশালী হইতে পারে।**

যে লিপ্টনের চা আজ পৃথিবার সর্বত্রই প্রবেশ লাভ করিয়াছে, দেশ বিদেশে যাঁহার চা এবং ফল মূলাদির সুবৃহৎ উদ্যান সকল বিরাজ করিতেছে, পৃথিবীর নানা স্থানে যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কাগজ, টিন প্রভৃতির কারখানায় বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, যাঁহার ভারবাহী শকট, রেলগাড়ি এবং অর্ণবযান লিপ্টনের কারখানাজাত পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র যাতায়াত করিতেছে, যাঁহার এক একটি কারখানা এক একটি ক্ষুদ্র সহরের মত দেখায়, যিনি স্বীয় অসংখ্য কারখানার জন্য বহুবিধ শিল্পশালা স্থাপন করিয়া অসংখ্য শিল্পী এবং দীন দুঃখীর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, যিনি জনহিতার্থ অকাতরে অর্থ দান করিয়া এবং অনন্যসাধারণ সদ্‌গুণাবলীর জন্য রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের বন্ধুত্ব ও উচ্চ উপাধি লাভ করেন, সেই সার টমাস লিপ্টন গ্লাসগো নগরের এক দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তিনি জন্মস্থানে এক দোকানদারের সামান্য বেতনে সংবাদবাহী বালক ভৃত্যের কার্য করিতেন এবং তদ্দ্বারা দরিদ্র পিতামাতার ভরণ-পোষণ করিতেন। পিতামাতার দৈন্য ঘুচাইবার জন্য বালক লিপ্টন জীবনপাত করিতেও উদ্যত ছিলেন এবং এই উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে মার্কিনে গমন করিয়া তথাকার একটি কারখানায় কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাতে-কলমে কার্য করিতে করিতে, অল্প স্বল্প ক্রয় বিক্রয় এবং সামান্য দোকানদারি করিতে করিতে ব্যবসায়বাণিজ্যে ক্ষতি, লাভ, কলাকৌশল, সিদ্ধি এবং

** পাউণ্ডের মূল্য এক্ষণে ১৫ টাকা; শিলিংএর মূল্য বারো আনা।*

*** যুবক (শান্তিপুর), ১৩০৮, কার্তিক সংখ্যা হইতে সংগৃহীত।*

অসিদ্ধির কারণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অনন্যসাধারণ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন দূরদর্শী এবং বাণিজ্যবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়া বাণিজ্যবীরের সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। –লিপ্টনের উপদেশ এই,–

"(১) পরিশ্রমে কাতর হইও না।

(২) ব্যবসায়ে সাধুপথ অবলম্বন কর।

(৩) ক্ষুদ্র বৃহৎ–সকল কর্মই বিশেষ বিবেচনা বুদ্ধির সহিত সম্পাদন কর।

(৪) বিশেষ বিবেচনা ও বুদ্ধির সহিত অকাতরে বিজ্ঞাপন দিতে থাক।

(৫) অধীন কর্মচারীগণকে এরূপ কৌশলে খাটাও যে, তাহারা তোমার কার্য আপনার ভাবিয়া করে, তোমার অমিয় ব্যবহারে অনুরক্ত হয়, তোমার নিষ্ঠা দেখিয়া তাহারা কর্তব্যনিষ্ঠ হয়।

(৬) লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ কর এবং তাহার বলে সুযোগ্য কর্মচারী নির্বাচন করিয়া নিযুক্ত কর।

(৭) উদ্দেশ্যহীন কর্মে প্রবৃত্ত হইও না–তাহাতে ফললাভ হইবে না। উদ্দেশ্য স্থির করিয়া যদি কেহ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে লাগিয়া থাকিয়া অকাতরে পরিশ্রম করে, এবং রাতারাতি বড় মানুষ হইব মনে না করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ সুসাধ্য হয়।"

ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় জাতীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াও দেশের অধিকাংশ লোক আপনাদিগকে উন্নত করে এবং তদ্বারা সমগ্র জাতি শ্রীসম্পদ্‌শালী ও শক্তিমান্ হয়। জাপানের অচিন্তনীয় উন্নতির কারণ কি? এখানে ত হীরকের বা সুবর্ণের খনি নাই? মণি মাণিক্যের প্রাচুর্য ত এখানে নাই? রত্নপ্রসূ ভারতের শতাংশের একাংশ ধনও ত জাপানে নাই? এমন কি ইহার ভূমিও ত উর্বরা নহে? তবে জাপান এত উন্নত হইল কি প্রকারে? জাপানে যে অবসাদের পরিবর্তে উদ্যম আছে, দৈবের পরিবর্তে পুরুষকার আছে; জাপানে অলস বা অকর্মণ্য লোকের স্থান নাই, এমন কি তথায় অকর্মণ্য বিলাসী ধনী প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! জাপানীরা কর্মশীল,

মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়শীল। জাতীয় সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, দেশের গৌরববৃদ্ধির জন্য, জাপানীমাত্রেই প্রস্তুত এবং চেষ্টান্বিত। আদর্শ সর্বদা উচ্চ হওয়া চাই। জাপান এশিয়ার আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। জাপান সুদূর আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে গমন করিয়া আপনার উপযোগী উচ্চ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। জাপান এই আদর্শের অনুকরণ করিতে করিতে আদর্শানুযায়ী জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে প্রধান শক্তিপুঞ্জের মধ্যে জাপান অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দশ বৎসরের মধ্যে যে জাপানের শুদ্ধ কাপড়ের রপ্তানি দুই লক্ষ হইতে দেড় শত লক্ষে পরিণত হয়, তাহার বাণিজ্য যে কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। উদ্যম অধ্যবসায় ও পুরুষকারে যেমন জাপান; শ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং মিতব্যয়িতায় তদ্রূপ মাড়বারী বণিক। মরুময় প্রদেশ ইঁহাদের জন্মস্থান। অন্নকষ্টে জলকষ্টে এবং দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপে এস্থান প্রকৃতপক্ষে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। তথাপি "জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এইজন্যই এস্থান আজিও জনশূন্য হয় নাই। মাড়বারীগণ এই উৎকট স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্থানের জল বায়ুতে বর্ধিত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশসহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী হইয়া থাকেন। অধুনা তাঁহারা জীবিকার্জনের প্রশস্ততর ক্ষেত্র এবং ঋদ্ধির পথ উন্মুক্ত পাইয়া দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যে সকল মাড়বারী বণিক আজি রাজধানী কলিকাতার ক্রোরপতি মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অনেকেই প্রথমে জন্মস্থান হইতে এক বস্ত্রে একটি "লোটা" মাত্র সম্বল লইয়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন। অনেকে সামান্য বস্ত্র ও বাসন প্রভৃতির মোট মাথায় করিয়া বিক্রয় করিতেন। কপর্দক শূন্য ফেরিওয়ালা ক্রমে শ্রম, অধ্যবসায়, সঞ্চয়শীলতা প্রভৃতি গুণে বড়দরের মহাজন হইয়া বসেন। তাঁহাদের এই সকল গুণের সহিত জ্ঞান ও শিক্ষা, সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণ মিলিত হইলে, তাঁহারা ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদিগের আদর্শস্থল হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতে আর এক ঋদ্ধিমন্তজাতি আছেন যাঁহারা আমাদের অনুকরণীয়। ইঁহারা ভারতের পার্শীজাতি। ইঁহারা অধ্যবসায়, মিতব্যয় এবং সঞ্চয়ে মাড়বারী, উদ্যোগ ও পুরুষকারে জাপানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শিক্ষায় বাঙ্গালী, একাগ্রতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় য়ুরোপীয় এবং বাণিজ্যে

মার্কিন। ইঁহারা কেরানীগিরি প্রভৃতি সামান্য চাকরি করিয়া জাতীয় শক্তি বড় ক্ষয় করেন না। বাণিজ্যই ইঁহাদের জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র। ভারতীয় বাণিজ্যের ইঁহারাই একপ্রকার কর্ণধার। এই পার্শীকুলেই সার্ জমষেদজী জিজীভাই, সার দিনশা মানকজী, সার্ মঙ্গলদাস নাথুভাই এবং বাণিজ্য ও দানবীর নসরওয়াঁজী তাতার জন্ম। ভারতের ৫২ লক্ষ ভিখারীর মধ্যে পার্শীভিক্ষুক কয়জন দেখা যায়? শিক্ষার সহিত ব্যবসায়বুদ্ধি এবং শ্রমশীলতার সহিত উচ্চাভিলাষ মিলিত হইয়া পার্শীজাতিকে শ্রীমন্ত করিয়াছে। যদি মার্কিন প্রশান্তসাগর পারে বলিয়া জাপান প্রশান্তসাগর বক্ষে বলিয়া এবং ইংলণ্ড, জর্মাণি প্রভৃতি অনুকরণীয় বলিয়া আদর্শে দুর্লভ হয়, তাহা হইলে ভারতেরই অন্নপুষ্ট ও এদেশেরই জলবায়ুতে বর্ধিত ঋদ্ধিশীল পারসীক জাতি ত ভারতবাসীর গৃহদ্বারে বিদ্যমান! চক্ষের উপর এমন সুন্দর আদর্শ থাকিতে নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকা আর শোভা পায় না। "তুমি ঈশ্বর ও ধনেশ্বর উভয়েরই সেবা এককালে করিতে পার না। হয় অর্থপূজা কর, না হয় ভগবানকে ভজ"—এই প্রবচনের দোহাই দিয়া অনেকে ঋদ্ধির পথ শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করেন না। ঋদ্ধিলাভের চেষ্টাকে তাঁহারা মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব লাভের পথে অন্তরায় বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু ঋদ্ধিলাভ যে অর্থপূজা নহে, তাহা বিশেষভাবে বুঝান হইয়াছে এবং মানবপ্রেম ঈশ্বরভক্তি ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি যে ঋদ্ধিরই অন্তর্ভূক্ত তাহাও বলা হইয়াছে। এক কথায় ঋদ্ধি চরম পন্থায় নাই। ভোগ ও ত্যাগ এককালে করিতে চাহিবে, তাহা হইবে না, কিন্তু—

"নাহি হবে তীব্রত্যাগী,
না হবে বিলাস ভোগী;
এ দু'য়ের মধ্যভাগে হ'তে হবে কর্মযোগী।"

—হিন্দু-পত্রিকা।

এই সামঞ্জস্যের ভাব সকলেরই গ্রহণ করা কর্তব্য। চরমপন্থীর দুই চক্ষুই একই বিষয়ের উপর ন্যস্ত, হৃদয়মন একই বিষয়ে লগ্ন এবং শক্তি তাহাতেই নিয়োজিত থাকে। সংসারে আর যে কিছু দেখিবার, শুনিবার ভাবিবার, কহিবার এবং করিবার আছে তাঁহারা তাহার সংবাদও রাখেন না।

তাঁহাদের এই নিষ্ঠা, এই একাগ্রতা, এই সাধনা, প্রেয় বস্তু লাভে সমর্থ করে বটে, কিন্তু শ্রেয়োলাভের পথে কণ্টক প্রদান করিয়া থাকে। শয়নে স্বপনে জাগরণে তাঁহাদের একই চিন্তা ; আহার নাই, নিদ্রা নাই—আছে মাত্র বীণাপাণির সেবা। যিনি কবি তিনি কাব্যে ডুবিয়া আছেন, যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি পরীক্ষাগারের সত্যানুসন্ধানে আত্মহারা হইয়া আছেন, কৃপণ একান্ত মনে অর্থপূজায় রত, বিলাসী সুখবিলাসে মজ্জমান, বাহিরের বিষয় ব্যাপারের সংবাদ রাখিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? কিন্তু যাঁহারা মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন. তাঁহাদের দুই চক্ষুর দৃষ্টি উভয় দিকেই পতিত হয়, তাঁহারা প্রেয় ও শ্রেয় উভয়ই লাভ করেন, তাঁহারা প্রেয় বস্তুর জন্য শ্রেয়ঃকে বিসর্জন করেন না এবং শ্রেয়োলাভের জন্য প্রেয়কে বলি দেন না। তাঁহারা সংযমী। সংযম তাঁহাদিগকে উভয় আকর্ষণ হইতে টানিয়া মধ্যভাগে সামঞ্জস্যের আসনে স্থাপিত করে। তাই দেখা যায় তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও ব্যবসায়ী, বণিক হইয়াও বদান্য, ধনী হইয়াও কর্ম্মশীল, এবং কবি হইয়াও বিষয়ী।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহুশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া বাচস্পতি উপাধি লাভ করেন এবং পরে ঐ কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বহু সংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন এবং শব্দকল্পদ্রুমের আদর্শে তাঁহার বিরাট কীর্তি "বাচস্পত্য" অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার সঙ্কলনে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল এবং আশী হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই অসাধারণ পণ্ডিত তারানাথ যে ব্যবসায়বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন একথা কি সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হইবে? কিন্তু তিনি প্রকৃতই ব্যবসায় করিতেন এবং তদ্দারা সংসার প্রতিপালন ও স্বীয় টোলের ছাত্রগণের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেন। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতেন। চাউল, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যও তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রয় বিক্রয় বা ব্যবসায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির সাহিত্য সেবায় এবং পাণ্ডিত্যে বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল একথা কে বলিতে সাহস করিবেন?

উদ্যোগী পুরুষ

বোম্বায়ের অন্তর্গত নাওসারি নগরে ১৮৩৯ অব্দে নসরবান্‌জী তাতার জন্ম হয়। ইনি ১৩ বৎসর বয়সে বিদ্যালযে ভর্তি হন এবং ১৮৫৭ অব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন। ৪ বৎসর এখানে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে বাণিজ্যশিক্ষার্থ পিতাব কুঠীতে প্রবেশ করেন এবং এই বয়সে বাণিজ্য করিতে চীন যাত্রা করেন। ৪ বৎসর এখানে থাকিয়া ১৮৬৩ অব্দে তাতা বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুবকের উদ্যোগে জাপান, হংকং, সাংঘাই, প্যারিস এবং নিউইয়র্কে কুঠী স্থাপিত হয়। লণ্ডনে দেশীয় ব্যাঙ্ক না থাকায় ভারতীয় বাণিজ্যের নানা অসুবিধা হয় এবং তাহা দূর করিবার জন্য তথায় "ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক" স্থাপন করিবার মানসে ১৮৬৫ সালে তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন। কিন্তু ঐ বৎসর তূলার কারবারে তাঁহার পিতা সর্বস্বান্ত হওয়ায়, ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাই। এতবড় মহাজন হঠাৎ এমন কপর্দকশূন্য হইলে, তাঁহার পুনরুত্থান একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে, কিন্তু যাঁহারা চির উৎসাহশীল, সত্যনিষ্ঠ, স্বাবলম্বী, স্বাধীনচিত্ত এবং ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা বিপদে অভিভূত হন না, তাঁহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া স্বাপরাধ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন না ; তাঁহারা এক সুযোগে অকৃতকার্য হইলে, অন্য সুযোগ অন্বেষণ করেন; তাঁহারা পুনঃপুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও অবসন্ন হন না বরং প্রত্যেকে নিষ্ফলতা হইতে শিক্ষালাভ করেন, এবং ভবিষ্যতে সেই ভ্রমে পতিত না হইতে হয়, তজন্য সতর্ক হইয়া থাকেন। সুযোগগ্রাহী পিতাপুত্র একবার আবিসিনিয় যুদ্ধে দ্রব্যাদি সংগ্রহ্ করিবার কন্ট্রাক্ট" লয়েন এবং ইহাতে তাঁহাদের দৈন্য ঘুচিয়া যায়।

বোম্বাই নগরের পার্শ্বে একটি নিম্নভূমি আছে; সমুদ্রের জল আসিয়া তাহাকে উপসাগরে পরিণত করিয়াছে। উহার নাম "ব্যাকবে"। বহুকাল হইতে বহুলোক ঐ "ব্যাকবে" দেখিয়া আসিতেছেন কিন্তু এই ব্যাকবে হইতে যে লক্ষ্মী লাভ হইতে পারে, ইহা অল্প লোকের মস্তিষ্কেই প্রবেশ করে। কিন্তু দূরদর্শী ব্যবসায়বুদ্ধি সম্পন্ন এবং উদ্যোগী তাতা দেখিলেন ঐ ব্যাকবে বুজাইয়া যদি তথায় বাড়ীঘর, কলকারখানাদি নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। কিন্তু একাকী ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না দেখিয়া তাহা একটি কোম্পানী গঠন করিয়া অল্পায়াসে কৃতকার্য হন তদ্দারা প্রভূত ধনোপার্জন করেন। ইতিপূর্বে যে কয়েকজন মাত্র এই কার্যে হাত দিয়াছিলেন তাঁহারা উপযুক্ত উদ্যোগ অভাবে সর্বস্বান্ত হন।

তাতা বিলাত গিয়া তথাকার শিল্প এবং বিজ্ঞানের কারখানা দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, কলের সহিত প্রতিযোগিতায় হাতের জয়লাভ হয় না; কিন্তু হাতের কাজ কলের দ্বারা করাইতে পারিলে-অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কাজ পাওয়া যায়, দেশের শত শত শ্রমজীবী অন্ন পায়, অল্প মূল্যে কলজাত দ্রব্য অধিক সরবরাহ্ করা সম্ভ ব হয় এবং আপনার ও প্রতিবেশীর অভাব মোচন করিয়া দেশের শত শত নরনারীর অভাব দূর হয়। তিনি ভারতের কোটী কোটী নরনারীর কি পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন বুঝিয়া ভারতে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ্ করেন; কিন্তু কল ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকিলেই চলিতে পারে না। কি প্রণালীতে কল পরিচালন করিতে হয়, তাহার শিক্ষা চাই। তাতা সেই শিক্ষা লাভের জন্য পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেই শিক্ষার ফলে ১৮৭৪ সালে নাগপুরে "এম্প্রেস"* নামে একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় কলকারখানার মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। দেশহিতৈষী তাতার এই কল দ্বারা দেশের হিতসাধন করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

একবার এক য়ুরোপীয় কোম্পানী জাহাজের ভাড়া অযথা বৃদ্ধি

** এম্প্রেস্ মিল এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ "শ্রমবিভাগ ও যৌথব্যবসায়" শীর্ষক পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।*

করিলে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন এবং তাহাতে কোন ফল না হওয়ায়, তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া অন্য কোম্পানীর সহিত মাল দিবার বন্দোবস্ত করেন। এবং আর কাহাকেও মাল দিবেন না প্রতিশ্রুত হন। ব্যাপার খুব গুরুতর হইয়া উঠে এবং তাহাতে কোম্পানীর ক্ষতি ও দুর্নাম এবং তাতার অনেক অর্থব্যয় হয়। প্রতিপক্ষ শত চেষ্টাতেও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে এবং উক্ত প্রতিশ্রুতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই বরং তুমুল আন্দোলনের পর জাহাজের ভাড়া কম করিতে এবং তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তাঁহার সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা এবং অবিচলিত উদ্যম তাঁহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহার উদ্যোগ কেবল ব্যবসায়বাণিজ্যে, কেবল অর্থ সংগ্রহে অথবা কেবল আত্মসুখলাভে পর্যবসিত হয় নাই। তিনি যেমন প্রভূত ধন উপার্জন করিয়াছিলেন, লোকহিতার্থ তদ্রূপ অকাতরে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য দেশহিতকর দানের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার উৎকর্ষ-সাধন মানসে গবর্ণমেন্টের হস্তে যে বিপুল অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ এবং তাঁহার মহাপ্রাণতারই পরিচায়ক। তিনি আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে আরও কত দেশহিতকর কার্য করিয়া যাইতে পারিতেন। ব্যবসায়ে বিবিধ বিপর্যয় হইতে বীরের ন্যায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যে হৃতলক্ষ্মী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে সিংহ-বিক্রমে আপন অধিকার দৃঢ় রাখিয়াছিলেন তাহার কারণ স্বীয় পুরুষকার। তিনি কখন দৈবের উপর নির্ভর করেন নাই। "তাতা এণ্ড কোম্পানী" ও তদীয় জাপান, হংকং, সাংঘাই, প্যারিস ও নিউইয়র্ক-শাখা, আলেকজান্দ্রা মিলস্, এম্প্রেস মিলস্, স্বদেশী মিলস্, ইণ্ডিয়ান ষ্টীমশিপ্ কোম্পানী, মহীশূরের রেশমক্ষেত্র, এশিয়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট হোটেল 'তাজমহল', এ্যাপলোবন্দরের প্রাসাদশ্রেণী, 'নওসারী সপ্তাহ' পর্ব, শিক্ষাভাণ্ডার 'বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার' প্রতিষ্ঠার্থ রাজোচিত দান এবং এইরূপ দেশহিতকর বহু শত স্মৃতি উদ্যোগী পুরুষ তাতার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বি. এ. পাশকরা দোকানদার*

২৪ পরগণার অন্তর্গত খাটুরা গ্রামে ১২৬২ সালে স্বর্গীয় ভূতনাথ পালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মঙ্গলচন্দ্র পাল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার সামান্য একখানি মুদিখানার দোকান ছিল। কিন্তু ভূতনাথের মাতুল সৃষ্টিধর কোঁচ অতুল ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি দোকান এবং বিস্তৃত কারবার ছিল। ১১/১২ বৎসরের বালক ভূতনাথের পিতৃবিয়োগ হইলে এই মাতুল তাঁহাকে তাঁহার মাতা এবং ভ্রাতৃগণসহ স্বপরিবারভুক্ত করিয়া লয়েন এবং তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেন। কোঁচ মহাশয় আপনার পুত্র ও ভাগিনেয় ভিন্ন অনেক দরিদ্র বালকের ভরণপোষণ ও সুশিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি যেমন প্রভূত ধন উপার্জন করিতেন তেমনি তাহার সদ্ব্যয় করিতে জানিতেন। ভূতনাথবাবু মাতুলের আশ্রয়ে থাকিয়া বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। বি. এ. পাশ করিবার পর মাতুলের গলগ্রহস্বরূপ না থাকাই শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করিয়া তিনি কটক রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতুল তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাতে অমত করিলেন এবং বলিলেন "এদেশের ব্যবসায় আর পূর্বের মত দেশীয় লোকের সঙ্গে হয় না, এখনকার কাজকর্ম প্রায় সবই ইংরেজের সহিত। আমি তোমাদের বি. এ. পর্যন্ত পড়াইয়াছি, ব্যবসায়ী করিব। লেখাপড়া করিয়া চাকরি করাকে

** "মহাজনবন্ধু" ও প্রবাসী হইতে সংগৃহীত। এ প্রবন্ধে বি. এ. পাশকরা—"শিক্ষিত" এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। —গ্রন্থকার*

আমি হেয় জ্ঞান করি। বরং ইংরেজী বিদ্যা শিখিয়া এদেশীয় লোক উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডাক্তার হইতেছেন, ইহা ভাল। আমার ইচ্ছা ঐরূপভাবে ইংরেজী বিদ্যা শিখিয়া সকলে ব্যবসায়ী হউন। আমি তোমাদিগকে বি. এ. পাশকরা দোকানদার করিব।" তখন তিনি কাজের জন্য মাতুলকে ধরিয়া বসিলে তিনি প্রথমে জনৈক পাকা পাট-ব্যবসায়ী আত্মীয়ের নিকট হাতে-কলমে কাজ শিখিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সৃষ্টিধরবাবু তখন "চেল এণ্ড পাল" নাম দিয়া পাটের কারবার খুলেন।

১২৮৯ সালে ভূতনাথবাবু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, সেই সঙ্গে আর একজনও প্রবেশ করিলেন। তিনি রাসবিহারী চেল। তিনিও মাতুলের ব্যয়ে বি. এ. পাশ করেন। উভয়ের এক বিদ্যা এক কর্মক্ষেত্র, উভয়ে এক অংশীদার। তবুও ইহার ভিতর হইতে ভূতনাথ বাবুর দীপ্তি ছুটিয়া চলিল। যিনি বিদ্যালয় হইতেই সকল বালকের উপরে নম্বর রাখিয়াছেন, যিনি প্রতিভায় প্রত্যেক পাশের পর বৃত্তি পাইয়াছেন, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে রাসবিহারীবাবুর স্বভাব মিলিবে কেন? ভূতনাথ বাবু সকলের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া সব একা করিবেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি রাসবিহারীবাবুকে অফিসের শীতল ছায়ায় টানাপাখার বাতাসে বসাইয়া রাখিয়া, নিজে রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া সব কাজ করিতেন। প্রাতে উঠিয়া হাটখোলায় পাট ক্রয় করা, দশটার সময় আহার করিয়া অফিসে গিয়া তাহা বিক্রয় করা এবং সন্ধ্যার পর বাড়ি আসিয়া উহার জমাখরচ করা ইত্যাদি কাজ ভূতনাথবাবুর একচেটিয়া হইল। রাসবিহারীবাবু যে পশ্চাতে পড়িলেন, ইঁহার দৌড়ের নিকট পরাস্ত হইলেন, তাহা তিনি বোধ হয় শেষে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশ্রম করিয়াও ভূতনাথবাবু যশস্বী হইলেন না; প্রতিবৎসর একাজে ক্ষতি হইতে লাগিল। মাতুল অতুল সম্পত্তিশালী, তাই ক্ষতি দিয়াও কাজ রাখিয়াছিলেন। আশা ছিল, এ বৎসর হইল না, আগামী বৎসর হইবে; আগামী বৎসরেও ক্ষতি হইল, আচ্ছা কর, এইবার হইবে—এই আশায় আশায় সাত বৎসর ক্ষতি হইল। ১২৯৫ সালে দেখা গেল এই সাত বৎসরে পাটের কাজে প্রায় লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ভূতনাথবাবু এইবার বলিলেন "আমি আর কাজ করিব না, আমরা গরীব লোক, লাভ হইলে খাইতে পারি,

কিন্তু ক্ষতি হইলে কোথা হইতে এত টাকা দিব।" সৃষ্টিধরবাবু বলিলেন "এই সাত বৎসরে তোমাদের পাটের কাজে শিক্ষার খরচ লক্ষ টাকা হইল। যে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, সে বিদ্যায় নিশ্চয়ই তদপেক্ষা আরও বেশী আয় হইবে। তোমাদের আর একটা কথা বলি ; যাঁহারা ইহা মনে করিয়া কাজ করে যে হয় একশত টাকা পাইব, না হয় একশত টাকা ক্ষতি দিব, তাহাদের জীবন ঠিক ঐ ১০০ টাকার মধ্যে থাকিয়া যায়, ইহারা মুদিখানার ব্যবসায়ী। আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বলেন, "হয় হাজার টাকা পাইব, না হয় হাজার টাকা দিব, ইঁহাদের জীবন হাজার টাকার মধ্যে থাকিয়া যায়। তোমরা এই শ্রেণীর মহাজন। ৭ বৎসর কাজ করিয়া ক্রমে ক্রমে তোমাদের লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে; এইবার তোমরা উহাপেক্ষা বড় কাজ কর। মনে সংকল্প কর, হয় লক্ষ টাকা পাইব, না হয় হয় লক্ষ টাকা দিব। কোমর বাঁধ! প্রবল ভাবনা মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করাও। বড়লোক সহজে হওয়া যায় না, লক্ষ ভাবনা ভাব! লক্ষ লইয়া খেলা কর, লক্ষ লাভ হইবে। হতাশ হইও না, এখনও আমি তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছি। আমার মান-সম্ভ্রম তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকাকে দুই চারি টাকা বোধে খাটাইতে থাক। তোমাদের স্বভাব অতি সুন্দর দেখিয়া আমি একথা বলিতেছি। কোনরূপ অনাচার তোমাদের ভিতর নাই, অতএব ভগবান কেন তোমাদের অর্থ দিবেন না? তাঁহার নিকট দিবারাত্রি কেবল কর্ম ও অর্থ চাও, নিশ্চয়ই তিনি তাহা দিবেন।"

পরে ভূতনাথবাবু অতি যত্নে, খুব সন্তর্পণে খরচা কমাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন, এবং ১২৯৬ সাল হইতে ব্যবসায়কার্যে পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার দুই বৎসর পরে ভূতনাথবাবু ১৮ হাজার টাকা মূলধন লইয়া নিজে পাটের কাজ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী আবার প্রতিকূল হইলেন। তাঁহার মূলধন নষ্ট হইয়া গেল এবং তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি জননী ও ভ্রাতার নিকট অর্থসাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া পুনরায় পাটের কাজে নামিলেন। ভূতনাথবাবু লাভ লোকসান সহ্য করিতে আদর্শ ছিলেন। তিনি কোন বৎসর ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি দিয়াও অধৈর্য হন নাই আবার পর বৎসর হয় ত ৮০ হাজার টাকা লাভ করিয়াও

বিশেষ উৎফুল্ল হন নাই। টাকা উপার্জন করিতে এবং ব্যয় করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

কর্মই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সময়নিষ্ঠা নিয়মনিষ্ঠা এবং বাঙ্‌নিষ্ঠা তাঁহার শ্রমশীলতার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অদ্বিতীয় কর্মী করিয়াছিল। তিনি দরিদ্রের পরম সহায় ছিলেন। স্ত্রী এবং দুটি পুত্র লইয়া তাঁহার সংসার। কিন্তু এই সংসারে প্রতি মাসে ১১ মণ চাউল খরচ হইত। দুই বেলা অন্যান্য শত শত লোক আসিয়া তাঁহার বাড়ি আহার করিতেন। নিয়ম ছিল, নিজেও যাহা খাইবেন, অভ্যাগত এবং অতিথিও তাহাই পাইবেন। ইনি যে পাড়ায় ছিলেন, সে পাড়ায় দরিদ্র কেহই ছিল না। পাড়ার লোকের কাজ না থাকিলে, নিজে চাকরি দিতেন। "কামাই" করিলে,ভয়ানক রাগ করিতেন। কাজে কামাই করিলে, তাহার উন্নতিপথ রুদ্ধ হয়, ইহা সর্বদা বলিতেন।

তিনি নিজে কখনও মোকদ্দমা করেন নাই বটে, কিন্তু দুর্বলের পক্ষে টাকার সাহায্য করিয়া বলিতেন "লড় ; অন্যায় ক'রে তোর বিষয় লইবে কেন?" এই সংসার দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অবারিতদ্বার ছিল। শয়ন এবং পাঠগৃহ, ভোজন এবং স্কুলের ব্যয় দিয়া তিনি ছাত্রদিগকে যত্ন করিয়া রাখিতেন এবং বি. এ. পর্যন্ত পাঠ-ব্যয় দিতেন। বিলাসিতা তাঁহার আদৌ ছিল না, ও তিনি কখনও নেশা করেন নাই, এমন কি ধূমপান পর্যন্ত করিতেন না; কখন নাচ তামাসা দেখিতে যাইতেন না। তিনি "তাম্বুলি সমাজ"এর প্রতিষ্ঠাতা। এই সভা হইতে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। অদ্যাপি সে পত্র জীবিত আছে। তিনি উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং সভারও সম্পাদক ছিলেন। ভূতনাথবাবু সভা হইতে দরিদ্রদিগকে ৫০ টাকা মাসিক দান করিতেন। তিনি ৮০ হাজার নিদ্রিত তাম্বুলি জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন ও ৮০ হাজার তাম্বুলি যে ১৬/১৮ "থাকে" বিভক্ত ছিল সেই "থাক"গুলি তিনি ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন সকল "থাকেই" বিবাহ ও ভোজ্য-ভোজন চলিতেছে। কাজের লোক যাহা বলে তাহাই করে। ভূতনাথবাবু এই যে এত কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ, শিক্ষা, চরিত্র ও ধন উপযুক্ত ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার জীবনী হইতে যে সকল শিক্ষা

ও সঙ্কেত প্রাপ্ত হই তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :

১। দেশে উচ্চশিক্ষিত ব্যবসাদারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষার সহিত যুক্ত হইলে মণিকাঞ্চনের যোগ হয়।

২। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কিছুকাল শিক্ষানবীশি করিয়া বা "হাতে কলমে" কাজ করিয়া প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী জ্ঞানলাভ করা কর্তব্য।

৩। আলস্য, উপেক্ষা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নিজের ব্যবসায় নিজে পরিশ্রম সহকারে স্বহস্তে চালাইতে হয়। পরের উপর নির্ভর করিলেই ব্যবসায়ে ক্ষতি দিতে হয়।

৪। ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলেই হতাশ হইতে নাই। ভাবা উচিত ঐ ক্ষতির মূল্য সতর্কতা ও অভিজ্ঞতা এবং কার্যশিক্ষার ব্যয় মাত্র। যে শিক্ষায় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, সে শিক্ষার ফলে লক্ষ টাকার অধিক আয় নিশ্চয় হইবে।

৫। শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র ব্যবসায়ীর পতনের সম্ভবনা নাই। কোন কারণে পতন হইলেও তিনি পুনরুত্থান করেন।

৬। ঋণগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় চালাইলে, অযথা ব্যবসায়ী মিতব্যয়ী না হইলে, সকল গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে অকৃতকার্য হইতে হয়।

৭। ব্যবসায়-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি প্রচুর মূলধন, উচ্চশিক্ষা এবং শ্রমশক্তি সত্ত্বেও ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারেন না। যিনি যে কার্যের উপযোগী তাঁহার সেই কার্যেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসায়-বুদ্ধি অপরিহার্য গুণ।

৮। কার্যক্ষেত্রে দুই এক বিষয়ে কৃতকার্য হইলে আর পাঁচটা বিষয়েও লোকের মাথা খুলিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে তখন কর্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি হয়।

৯। ব্যবসায়ীর "বুকের পাটা" থাকা চাই। যে ব্যক্তি ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্ষতিতে হতাশ হইয়া পড়ে এবং লাভে উল্লসিত হয়, ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভ তাহার কার্য নহে। সাহস, সহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়, আশা ও উচ্চাভিলাষ থাকা চাই। হতাশ হইলে কাজ চলে না।

১০। ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভ বিলাসীর কর্ম নয়, কর্তব্য ও দায়িত্বহীনের

কর্ম নয়, পরনির্ভরশীলের নয়, স্বার্থপরেরও কর্ম নয়।

১১। উচ্চশিক্ষা পাইলে যে ওকালতি, ডাক্তারী, শিক্ষকতা এবং বড় বড় চাকরি করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। উচ্চশিক্ষালাভ করিবার উদ্দেশ্য—মানুষের মত মানুষ হওয়া। শিক্ষার পর যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে নিরক্ষর আনাড়ীর অপেক্ষা ভাল কাজই করা যায় এবং তাহাতে সিদ্ধির সম্ভবনা অধিক থাকে। অনেক মহাজন ভূতনাথবাবুর অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়াছেন। কিন্তু সমাজ এই "বি. এ. পাশ করা দোকানদারে"র নিকট অধিক উপকৃত হইয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। কত নিরক্ষর মহাজন কোটী কোটী টাকার কারবার করিতেছেন এবং মুক্তহস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া দাতাকর্ণকেও যেন লজ্জা দিতেছেন, কিন্তু স্বদেশেই তাঁহাদের কয়জন পরিচিত? পক্ষান্তরে, কি স্বদেশে কি বিদেশে জামসেদ্‌জী নসরওয়াঁজী তাতার নাম কে না জানে? জগৎ জুড়িয়া এই "তাতার" নামই বা কেন হয়? শিক্ষার সহিত ব্যবসায়-বুদ্ধি মিলিত হইয়া তাতাকে বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রখ্যাত করিয়াছে, মনুষ্যত্বের উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করাইয়াছে, এবং জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছে। মহাত্মা কার্ণেগী, একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসাদার, আবার একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।

সিদ্ধি

"সাধনায় সিদ্ধি।"

"সঙ্কল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা

রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।” জীবন সঙ্গীত।

সিদ্ধির কোন নির্ধারিত আদর্শ নাই। ভক্ত স্বীয় আরাধ্যকে লাভ করিলে, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানান্বেষী জ্ঞানলাভ করিলে, মানভিখারী সম্মানলাভ করিলে, কৃপণ ধনলাভ করিলে, শত্রু বৈরী নিপাত করিলে, রণবীর সংগ্রামে জয়লাভ করিলে, ফলতঃ যে যাহা চায় যদি সে তাহা পায়, তাহা হইলেই লোকে বলে তাহার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, যে যাহা চায়, সকল ক্ষেত্রে সে কি তাহা পায়? দরিদ্র চায় ধন ঐশ্বর্য; কিন্তু দরিদ্র ত তাহা পায় না? আর দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি কেন পাইয়াছিলেন? তাঁহার বাসনার সঙ্গে সাধনা ছিল বলিয়া। এই সাধনা যাঁহার নাই তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। যোগমার্গী সিদ্ধিলাভ করেন শুদ্ধ সাধনার বলে। অনেক ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা এবং পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করে সাধনার বলে। অনেকে অকৃতকার্য হয় সাধনার অভাবে। এই কারণেই “সাধনায় সিদ্ধি” এই প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই কোন না কোন উদ্দেশ্যসাধন জন্য ব্যাপৃত থাকে। কারণ উদ্দেশ্যহীন জীবন রুগ্নমস্তিষ্ক আত্মঘাতী উন্মাদেই সম্ভবে। যাহার উদ্দেশ্য নাই তাহার সাধনাও নাই সে অধিক দিন জীবনের ভার বহন করিতে পারে না। ভাল হউক আর মন্দ হউক জীবনের একটা উদ্দেশ্য চাই; তাহা না হইলে মানুষ বাঁচিতেই পারে না। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানকাদির উদ্দেশ্য ছিল ; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মধুসূদনের এক একটা উদ্দেশ্য ছিল। আবার ডাকাত রঘুনাথ, বিশ্বনাথ প্রভৃতিরও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য বা আদর্শ গুপ্ত থাকে না ; তাহার সাধনা মাত্র লোকে প্রকাশ পায় এবং সিদ্ধি অনুসারে সাধনার মূল্য নিরূপিত হয়। প্রকাশ পায় বলিয়াই সাধনার জন্য সাধক ভাল, মন্দ, উচ্চ. নীচ, উদার, সংকীর্ণমনা এবং ‘অমানুষ’ বা ‘মানুষের মত মানুষ’ বলিয়া উক্ত হয়। মানুষের জীবনটাই সাধনাময়। এরূপও ত দেখা যায়—একজন জীবনে কত অভিলাষ করিয়াছে এবং একে একে তাহার অধিকাংশ বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে অধিকাংশ অভীষ্ট বস্তুই লাভ হইয়াছে; কিন্তু জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনা

যায়-"হায় জীবনটাই ব্যর্থ হইল, জন্মটা বৃথায় গেল!" কেন তাহাদের বলিতে সাহস হয় না-"জীবন সফল হইল" বা "জন্ম সার্থক হইল"? ইষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াও যখন অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তখন জীবনের সাফল্য বা অসিদ্ধি সম্বন্ধে অবশ্যই কোন রহস্য স্বীকার করিতে হইবে। সে রহস্য জীবনের উদ্দেশ্যেই নিহিত। ধনধান্যে ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সম্মান লাভ করিলে, বক্তৃতার বলে সহস্র সহস্র লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারিলে, উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য, সুন্দর দেহ অথবা উচ্চ কুলমর্যাদা লাভ করিলেই কি জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? না—জীবনের উদ্দেশ্য আরও উদার, আরও মহৎ। যাহা হইলে বা যাহা করিলে মানুষকে লোকে 'মানুষ'* বলে এবং কখন কখন মানুষকে 'দেবতা' বলে, তাহাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য মোটের উপর সিদ্ধ হইলেই লোক বলিতে সাহস করে "জীবনটা বৃথায় যায় নাই", "জন্ম সফল বা সার্থক হইয়াছে।"

কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য হইবার অপেক্ষা মোটের উপর সফলতা লাভ করা অধিক শ্রেয়ঃ। যদিই কেহ জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই সিদ্ধকাম না হন, তথাপি তিনি এবং সকলেই, ইচ্ছা করিলে, মোটের উপর সফল জীপন যাপন করিতে পারেন। শেষ জীবনের সকল দিক আলোচনা করিবার পর, আমরা যেন বলিতে পারি, জীবন বৃথায় যায় নাই। অপরেও যেন আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন "জীবন বৃথা হয় নাই।" কোন কোন বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া সারা জীবনটাকে নিষ্ফল বোধ করা অপেক্ষা, কোন কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া সমস্ত জীবনটা মোটের উপর সফল হইয়াছে বলিতে পারাই যথেষ্ট। একজন জীবনের অনেকক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হয় ত তাহার জীবন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিচার করিয়া দেখিলে এমনই নগণ্য ও জঘন্য প্রতীয়মান হইতে পারে যে, অন্য কেহ সেরূপ জীবন স্বয়ং লাভ করিতে চাহিবে না, তাহার অনুমোদনও

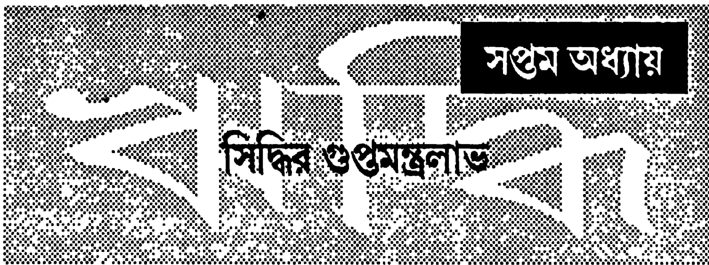
** মৎপ্রণীত "চরিত্রগঠন" নামক পুস্তকে "মনুষ্যত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।*

করিবে না।

যে ব্যক্তি স্বীয় অর্ন্নিহিত ধর্ম ও শক্তি অনুশীলন না করিয়া, সমাজের সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া আজীবন কেবল অর্থের পশ্চাতে, কেবল স্বার্থের পশ্চাতে, কেবল আত্মসুখের পশ্চাতে ঘুরিতে থাকে, সে ব্যক্তি জীবনের অবসানকালে, স্বীয় চিরজীবনার্জিত অর্থরাশির পার্শ্বে ও ভোগবিলাসের অতৃপ্ত ক্রোড়ে আপনাকে সর্বজন পরিত্যক্ত, সহানুভূতিবর্জিত ও নিতান্ত একাকী দেখিতে পায়! কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন উদ্যানের সকল বৃক্ষ লতাই সমান হয় না ; কেহ দীর্ঘ কেহ খর্ব, কেহ ফলদ, কেহ পুষ্পদ, কেহ শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবে স্থূল, কেহ বা শীর্ণ; অর্থাৎ সকল বৃক্ষ লতাই সৌন্দর্যে উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতে পারে না ; কিন্তু উদ্যানটি যদি মোটের উপর দর্শকের নয়ন পরিতৃপ্ত করে, তাহা হইলে সকলেই উহাকে সুন্দর বলিয়া থাকে। মানবজীবনও উদ্যানের মত। অল্পবয়স হইতে এই জীবন-উদ্যানকে যদি এরূপ ভাবে সাজান যায় যাহাতে ইহা সকলের আনন্দবর্ধন করে, ইহার ছায়া ও ফল পুষ্পে সকলকে পরিতৃপ্ত করে এবং সকলে তাহাকে আদর্শ করিয়া স্ব স্ব জীবন-উদ্যান সজ্জিত করিতে অভিলাষ করে তাহা হইলে জীবন সফল বা সার্থক হয়।

লোকের প্রচুর জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য। কেবল আমোদপ্রমোদে চলে না। শুদ্ধ হাস্য-পরিহাস করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। আমোদপ্রমোদ চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া বার্ধক্যে সুখদান করে না। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদি নিত্যসঙ্গী হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুখশান্তি আরাম এবং আনন্দ দান করিয়া থাকে। যে ধনীর ধনবৃদ্ধি করা ব্যতীত আর কোন আনন্দ নাই, বার্ধক্য তাহার জীবনকে অসুখী করিয়া তুলে। লোকে মানব জন্ম লাভ করিয়া কি কেবল লাভ লোকসান গণনা করিয়া জীবনপাত করিবে? কেবল সস্তায় খরিদ ও মহার্ঘ দরে বিক্রয় করিতে শিখিবে এবং শুদ্ধ রোজগারের পথ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে?—কেবল লাভের জন্য, কেবল ধনেশ হইবার জন্য, কেবল আত্মসুখের জন্য এবং শুদ্ধ উপার্জন সঞ্চয় ও ব্যয় করিবার জন্যই জীবনধারণ করিবে? জীবনের কি আর কোনই উদ্দেশ্য নাই? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে মানবজীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। মানবের যেমন শরীর

আছে তেমনি হৃদয়, মন ও আত্মাও আছে। সুতরাং সে কি কেবল শারীরিক সুখের, আয়ু বৃদ্ধির ও স্বাস্থ্যলাভের জন্যই যত্নশীল হইবে? তাহার দেহের প্রতি যেমন যত্ন, তাহার হৃদয়নিহিত ধর্মপ্রবৃত্তির চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সেইরূপ যত্ন ও চেষ্টার কি কোনই প্রয়োজন নাই? কেবল অর্থই কি তাঁহার আরাধ্য, উপসেব্য এবং নিত্যসঙ্গী? স্পেনের জনৈক প্রসিদ্ধ ধনী এবং বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ডন জো. সি. ডি. সালামাঙ্কা বলিয়া গিয়াছেন– "রথস্‌চাইল্ডের খ্যাতি তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই ফুরাইবে কারণ অমরত্ব লাভ করিতে হয়–ক্রয় করা যায় না। যাঁহারা উচ্চশিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম ও সমুন্নত কলানুশীলনে গৌরবান্বিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মানার্থে প্রতিমূর্তি ও স্মরণচিহ্ন জগতের নানা স্থানে সুরক্ষিত হইতে দেখা যায় কিন্তু কখন এমন দেখি নাই বা শুনিও নাই যে, যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ধনের পশ্চাতে সারাজীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সম্মানার্থে কোন ধাতুপ্রস্তরাদি নির্মিত প্রতিমূর্তি বা তৈলচিত্র কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" সমাজে সৎকার্য করা ও নৈতিক এবং ধর্মজীবন যাপন করাই সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য। ভাল হওয়াই সকলের কর্তব্য। তাহাতে প্রশংসার কথা কিছুই নাই। স্বীয় কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে লোকে যতটুকু প্রশংসা পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারে, মানুষ মানুষের মত কাজ করায় তাহার অধিক প্রত্যাশা করিতে পারে না। তবে যে সমাজ ভাল লোকের প্রশংসা করে এবং মানুষের মত মানুষ পাইলে মাথায় করিয়া রাখে, ইহা সমাজেরই উদারতা। মন্দের ত কথাই নাই, সমাজের ভাল না করাই সমূহ নিন্দার কথা। যে ভাল করে না, সে প্রকারান্তরে মন্দেরই সহায়তা করিয়া থাকে। যাহাকে মানব সমাজ "মানুষের মত মানুষ" বলে তাহারই জীবন সার্থক ও সফল হয়। সুতরাং অল্পবয়স হইতে সকলেরই মানুষের মত মানুষ হইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইহাই যেন প্রত্যেকের আদর্শ বা উদ্দেশ্য হয় এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সকলেই যেন আজীবন সাধনা করে। কারণ সময় থাকিতে যাহারা "হেলায় রতন" হারাইয়া বসে, তাহাদিগকেই শেষে অনুতাপের সুরে গাহিতে হয়-"এমন মানবজীবন রৈল প'ড়ে আবাদ করলে ফলতো সোনা!"



যেমন পাড়ার আর সকলে যাইত আসিত, যুবক শচীন্দ্রও রামধনবাবুর বৈঠকখানায় যাওয়া আসা করিত। সেদিন রামধনবাবুর বৈঠকখানায় ভারি মজলিস্। একজন পাকা ব্যবসাদার সেদিন রামধনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। দুজনেই বেশ বড়দরের মহাজন। উভয়েরই কর্মক্ষেত্র এক, সুতরাং কাজকর্মের কথাই সেদিন বেশী চলিতে লাগিল। আগন্তুক মহাজন আগে একজন ফেরিওয়ালা ছিলেন ; ক্রমে নিজের চেষ্টা ও উদ্যমে কোটীপতি মহাজন হইয়াছেন। রামধনবাবু ফেরি না করিলেও সামান্য মসলার দোকানকে নিজের চেষ্টায় প্রকাণ্ড কুঠীতে পরিণত করিয়াছেন। উভয়েই কুঠীয়াল, প্রজাবৎসল জমিদার এবং রাজভক্ত প্রজা। সেদিন তাঁহাদের কথোপকথনে বাহিরের লোকের বড় আমোদ হইল না। কারণ বিষয়বুদ্ধির কথা, ব্যবসায়বাণিজ্যের কথা অব্যবসায়ীদের ভাল লাগিল না। কথায় বলে "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে প্রয়োজন কি?" নিরীহ কেরানীকুল আজীবন ইহা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন ; সুতরাং দপ্তর হেডবাবু ও বড় সাহেব ছাড়া তাঁহারা বড় একটা খবর রাখেন না। তথাপি রামবাবুর খাতিরে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী অসীম ধৈর্যসহকারে নির্বাক বসিয়া রহিলেন। গৃহের একপ্রান্তে বসিয়া একটি দীন যুবা উভয়ের কথোপকথন একান্তমনে শুনিতেছিল এবং প্রত্যেক কথাটি যেন গলাধঃকরণ করিতেছিল.। সে শচীন্দ্র। শচীন মাতাপিতৃহীন ও নিঃসম্বল। যুবক রামবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে এবং তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হয়। সচ্চরিত্র বলিয়া রামধনবাবু তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। শচীন দরিদ্র হইলেও উচ্চাভিলাষী এবং সুযোগগ্রাহী। দারিদ্র্যের তীব্রতা অল্পবয়সেই

তাহাকে স্বীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছে এবং বুদ্ধিমার্জিত ও তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছে। মহাজন চলিয়া গেলেন। সেদিন আর বাজে কথা হইল না। পান তামাক বন্ধ হইয়া গেল। হাস্যকৌতুক কিছুই হইল না ; তাস পাশাও চলিল না। সকলেই ক্ষুণ্নমনে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে, তাঁহাদের মাথায় বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল, বাক্যে স্ফূর্তি আসিল, এবং সমালোচনার প্রবৃত্তি সহসা বিকসিত হইল। নবীনেরা বলিলেন, মহাজন নূতন আর কি বলিল? সবই ত সেই পুরাতন কথা। প্রবীণেরা তাঁহাকে "ফাজিল" বলিয়াই উড়াইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা চাকরিস্থলের চতুঃসীমার বাহিরে বড় একটা সংবাদ রাখিতেন না।

বৈঠকখানা যখন শূন্য হইল, তখন শচীন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিল। মহাজনের কথাগুলি তাহার মাথায় ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই শচীনের দৃষ্টি একখানি স্মারক বহির উপর পড়িল। বহিখানির মলাটের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল "নিত্যসঙ্গী"। তাহার নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল—"ইহা যখন যাহার হস্তে পড়ে তখন তাহারই"। শচীন্দ্র বসিল এবং এক একখানি করিয়া বইখানির পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ শচীনের দৃষ্টি একটি পৃষ্ঠার শীর্ষ ছত্রের উপর পড়িল। শচীন্দ্র দেখিল লাল ও কাল কালীতে বড় বড় অক্ষরে অতি যত্নের সহিত লিখিত হইয়াছে, —"সিদ্ধির গুপ্ত মন্ত্র"। কুতূহলী শচীন্দ্র দেখিল মহাজনের মুখের অনেক কথাই এইস্থলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তখন আর পুস্তকের অধিকারী সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। শচীন্দ্র তখন স্থির করিল যে, বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সঙ্কেত সত্ত্বেও পুনরায় মহাজনের দেখা পাইলে বইখানি তাঁহাকে ফেরত দিবে ; কিন্তু মন্ত্রগুলি তাহার এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে শচীন্দ্র তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিম্ন উদ্ধারগুলি আপনার স্মারক বহিতে তুলিয়া লইল ঃ

(১) "সাধুতাই সিদ্ধির মূলমন্ত্র।"

(২) "মিতব্যয় সঞ্চয়ের মূল, সঞ্চয় স্বাধীনতার মূল।"

(৩) " কড়াক্রান্তিগুলির সাবধান লও, টাকাগুলি আপনার সাবধান আপনি লইবে।"

(৪) "মূলধন, ব্যবসায়বুদ্ধি এবং শ্রম তেপায়ার তিনটি পায়ার স্বরূপ, একটি গেলেই সমস্ত হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাইবে।" —এ, কার্ণেগী।

(৫) "অমানুষিক শ্রম ও সহিষ্ণুতার সহিত মনোনিবেশ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল দক্ষতায় কিছু হয় না।"

(৬) "এক সময়ে একই কাজে নিবিষ্ট হইবে, সে সময়ে যেন অন্য কর্মের চিন্তাও তোমার মনে স্থান না পায়; সিদ্ধি অনেকটা ইহার উপর নির্ভর করে।" —মিঃ জে. এস্. ফ্রাই। "সব কাজ একই সময় করিতে গেলে কোন কাজই হয় না" —রেঃ রবার্ট সিসিল্।

(৭) "ব্যবসায়ের প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।" — অলডারম্যান টিলোর। "নিজে দেখিতে হয় না এমন কিছুইব্যবসায়ের মধ্যে থাকে না। যত সামান্যই হউক না কেন নিজের কাজ নিজে দেখাই ভাল।" —সার রিচার্ড টাঙ্গিও। "কাজের লোক হইতে চাও, সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, নিজের হাতে হাল ধরিয়া নিজের নৌকা নিজে চালাও। —মিঃ গ্রীগ্।

(৮) "যে কাজ করিবে তাহা নিখুঁত করিয়াই করিবে; লোকে যেন তাহাতে বিশেযত্ব দেখিতে পায়। যদি রাস্তায় ঝাড়ু দিতেই হয় তাহা হইলে এমন ভাবে ঝাড়ু দিবে যে, ঠিক তেমনভাবে পরিষ্কার করা রাস্তা আর দেখা না যায়।" —মিঃ মোবারলি।

(৯) "যে কাজের উপযুক্ত বলিয়া আপনাকে জানিবে তাহাই অবলম্বন করিবে, তাহাতেই মগ্ন থাকিবে এবং যতদিন তাহাতে সিদ্ধিলাভ না হয়, বুঝিবে ততদিন তোমার অবকাশ লইবার সময় নাই।" —মিঃ পিয়ার্সন।

(১০) "ব্যর্থ আমোদপ্রমোদ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা, সামান্য হইলেও তাহাদের প্রশ্রয় দিতে নাই। এই সকলের পশ্চাতে অমূল্য সময় ও অর্থের অপব্যয় করিয়া তরুণবয়সে অনেকে নিজের এমন সর্বনাশ করে যে, জীবনে আর তাহারা মাথা তুলিতে পারে না। " - মিঃ গ্রীগ্।

(১১) "যাঁহার লক্ষ্য সর্বোচ্চ, সকলের শীর্ষে তাঁহার স্থান চিরদিনই উন্মুক্ত থাকে।"

(১২) "যাঁহারা সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল পথ অবলম্বন করে, সম্ভব

ছাড়িয়া অসম্ভবের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাই বলিয়া থাকে প্রতিযোগিতায় জীবিকার্জনের সকল পথই রুদ্ধপ্রায়। তাহাদের কথায় ভুলিতে নাই। যে কেবল স্বীয় কর্তব্যকর্ম ছাড়া আর কিছুই চাহে না, এরূপ প্রত্যেক সৎসাহসী ব্যক্তির জন্য এই সুবিশাল জগতে স্থানের অভাব নাই।"

(১৩) "টাকা রোজগার করা এত সহজ যে মোটামুটি রকমের বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই কেবল গোটাকতক নিয়মপালন করিয়া চলিলেই তাহা পারে। প্রথম সততা ; দ্বিতীয় মিত্রাচার ; তৃতীয় সহিষ্ণুতা ; চতুর্থ যথাকালে কর্তব্য সম্পাদন ; পঞ্চম গৃহ ও কারবারস্থলের ব্যবস্থাগুলির সুপালন। অন্যান্য নিয়মও পালন করিতে হয় কিন্তু এগুলি অপরিহার্য। এই পাঁচটি ভিত্তিস্বরূপ না করিয়া যে অর্থ উপার্জিত হয় তাহা স্থায়ী হয় না। কারবার সম্বন্ধে তিনটি প্রধান বিষয়ে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিতে হয়। প্রথম-যে কারবারে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে আন্তরিক অনুরাগ থাকা চাই। কারবার করিতেছি অথচ তাহাতে অনুরাগ নাই, তাহা হইলে চলিবে না। দ্বিতীয়—কাজকর্মগুলি স্থিরবুদ্ধি হইয়া করিতে হইবে। তৃতীয়—কর্মে বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহা কাটাইয়া উঠিব, মনে মনে এরূপ বল থাকা চাই।"

"অর্থোপার্জন প্রয়াসীর পক্ষে কলেজের শিক্ষায় যে·কোন অপকার হয়, আমি এমন মনে করি না ; তবে, ব্যবসায়ে যাহারা প্রবৃত্ত হইবে তাহাদের কলেজে সময় নষ্ট না করিয়া স্কুলে মোটামুটি শিক্ষা হয় সেই ভাল। অবসর পাইলেই সংবাদপত্র ও যে সকল পুস্তকে অনেক রকম সংবাদ পাওয়া যায় তাহা পড়িতে হয়।" —মিঃ রসেল সেজ, (মহাজনবন্ধু ১৩১১)

(১৪) "অর্থই সর্বত্র এবং সকল সময় মূলধনের কাজ করে না। বঙ্গের এক আধুলির বড় মানুষ একটি আধুলিকেই লক্ষ লক্ষ টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন ; আবার অনেকে লক্ষাধিক টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন কিন্তু ঐ অর্থই কি তাঁহাদের প্রকৃত মূলধন ছিল ? না ; চরিত্রই তাঁহাদের প্রকৃত মূলধন। কথিত আছে মার্কিনের দুই কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ কোটী টাকা সঞ্চয়কারী স্বয়ংসিদ্ধ মহাজন শ্রীযুক্ত রসেল সেজের মূলধনের মধ্যে ছিল তাঁহার 'দুটি হাত ও মাথাটি'।"

(১৫) "দুই সহস্র ডলার (প্রায় ৬০০০ টাকা) যে সঞ্চয় করিয়াছে সে

লক্ষ্মীলাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে * * * * দুই সহস্র ডলার যে বড় বেশী তাহা নহে কিন্তু ঐ টাকাগুলি উপার্জন ও সঞ্চয় করিতে যে পরিমাণ অধ্যবসায়, সাবধানতা ও মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতে হইয়াছে, সেই অভ্যাসই তাহার অধিকারীকে ধনার্জনের পথে চির অগ্রগামী করিবে।" —জন জেকব এ্যাসটর।

(১৬) "ব্যবসায়-বুদ্ধি ও মহাজনি-সংস্কার এক দিনে লাভ হয় না, কতকগুলি ফাঁকা মন্তব্য দ্বারা গঠিত হয় না, খামখেয়ালের দ্বারা হয় না, ক্ষণিক উত্তেজনায় হয় না—কিন্তু, ক্রমাগত প্রবল চেষ্টা করিতে করিতে তবে এই অভ্যাস জন্মে। এ অভ্যাস না জন্মিলে উন্নতির পথ মুক্ত হয় না।" — মহাজনবন্ধু ১৩১১।

(১৭) "ধীশক্তি বলিয়া দেয় কি করিতে হইবে, দক্ষতা বা কৌশল বলিয়া দেয় কি প্রকারে করিতে হইবে। ধীশক্তি ধন, কৌশল নগদ টাকা। ক্ষিপ্রকারিতা, দৃঢ়তা প্রফুল্লতা এবং সাধনের সুগমতার সম্মিলনে কৌশল বা দক্ষতার উৎপত্তি। ইহা বহুলাংশে অনুশীলন সাধ্য।"

(১৮) "সকলেই ধনী হয় না কিন্তু অভাব মোচন করিবার মত সঞ্চয় করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। তাহাতে যদি কিছু বিঘ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান হয় তাহা একমাত্র প্রবৃত্তি ও প্রতিজ্ঞার অভাব—সুযোগের অভাব নহে।"

(১৯) "মধ্যে মধ্যে আমাদের অকৃতকার্যতারও প্রয়োজন আছে ; তাহাতে আমাদের দৃষ্টি চকিত হয়, অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় এবং বিবেচনাশক্তি দৃঢ় হয় ; আঘাত পাইতে পাইতে যে শক্তিলাভ হয়, ইহাই জীবনের মহারহস্য।"

(২০) "জগতে সম্মান ভিক্ষা করিতে নাই। সম্মান আকর্ষণ করিতে হয়। সম্মানের জন্য লালায়িত হইলে, সম্মান পাওয়া যায় না। এমন কাজ করিতে হয়, যাহা দেখিয়া লোক তোমায় সম্মান না করিয়া পারে না।"— মিঃ লরিমার।

একটি গোছাল সংসার

"যে সংসারে অপচয় হয় না, তথায় অভাবও হয় না।" প্রেসিডেণ্ট জেফারসন।

"সংসারে বাজে খরচ রহিত করা গৃহিণীর প্রধান কর্তব্য।" ফ্রাঙ্কলিন্।

"অনাগত ও অনিশ্চিত আয়ের ভরসা নাই ; সুতরাং তাহার প্রতীক্ষা করা ও সেই ভরসায় ব্যয় করা মূঢ়ের কার্য গৃহস্থের পক্ষে তাহা মহা অধর্ম।"

"ব্যবহারে জীর্ণ হওয়া ভাল তবু মরিচা ধরিয়া ক্ষয় পাওয়া কিছু নহে।"

"শূন্য স্থালী যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র তেমনি সর্বদা সততার সহিত কার্য করিতে না পারিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। ফ্রাঙ্কলিন্।

শচীন্দ্রের হস্তে স্মারক বহি পড়িবার পর তিন চারিজন মহাজন রামধন বাবুর বাড়ি আসিয়াছিলেন। যুবক শচীন্দ্রের স্বভাব চরিত্রে মহাজন বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন এবং তিনিও শচীন্দ্রের নিকট হইতে ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামধনবাবু যতই বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ হইতে লাগিলেন ততই শচীন্দ্রের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সেকালের সংস্কারমত তিনি ভাবিলেন শচীনকে আর অবিবাহিত রাখা

হইবে না ; তাহার বিবাহ দিতে পারিলেই তাঁহার কর্তব্য শেষ হয়। যাহা হউক তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে শচীন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করিতে বাধ্য হন।

* * * *

রামধনবাবু উপার্জন যথেষ্ট করিয়াছিলেন, সঞ্চয়ও বিলক্ষণ করিয়াছেন, সৎকর্মে মুক্তহস্তে দান করিয়া মহাজনের কার্পণ্যকলঙ্ক ঘুচাইয়াছেন, অমিয় ব্যবহারে ও সাধুতায় সর্বজনপ্রিয় ও সম্মানিত হইয়াছেন এবং সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের যে সকল গুণ থাকা স্বাভাবিক তাহাও তাঁহার আছে, কিন্তু, শশাঙ্কে কলঙ্কের মত তাঁহার একটি মহৎ দোষ রহিয়া গিয়াছে। সেই দোষ যে অলক্ষ্যে তাঁহার সর্বনাশের পথ সরল করিয়া আনিতেছিল তাহা দেশের অন্যান্য ব্যবসায়ী মহাজনের মত তিনিও বড় দেখিয়াও দেখেন নাই। সে দোষ সন্তানগণের শিক্ষার প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ও তাহাদের চরিত্র গঠনে উপেক্ষা। অতুল ধনসম্পত্তি রাখিয়া গেলে কি হইবে? অগঠিত-চরিত্র স্বল্পশিক্ষিত বিষয়বুদ্ধিহীন পুত্রেরা যে দুদিনেই সব উড়াইয়া দিবে তাহা একবার ভাবা উচিত। অন্যান্য দেশের সওদাগর মহাজন প্রভৃতি তাহা করেন না। তাঁহারা যেমন ব্যবসায়ে উপস্থিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে থাকেন, তেমনি ভবিষ্যতের মূলধনস্বরূপ সন্তানগণের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন। তাই তাঁহাদের কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে। আর এদেশে একপুরুষেই অধিকাংশ অনুষ্ঠান লোপ পায়!

যাহা ভাবা গিয়াছিল শেষ তাহাই দাঁড়াইল! রামধনবাবু আর নাই। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব পুত্রগণ কুচরিত্র সঙ্গী পাইয়া নানা কুকার্যে জলের মত অর্থব্যয় করিয়া অবশেষে বিষয়ের অধিকার লইয়া এবং নানা মামলা মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়ে। তাহার কয়েক বৎসর পরে মহাজন একদিন শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া শুনিলেন শচীন্দ্র সপরিবার পশ্চিম গিয়াছে। কিন্তু রামধনবাবুর পুত্রগণ কোথায়? শুনিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জেল খাটিতেছে, মধ্যম আত্মহত্যা করিয়াছে এবং কনিষ্ঠ আতুরাশ্রমে স্থান

পাইয়াছে। রামধনবাবুর ভদ্রাসনটি নিলাম হইয়া গিয়াছে।

*   *   *   *

সংসার প্রতিপালনোপযোগী আয়ের সংস্থান না করিয়া সংসারে জড়িত হইতে শচীন্দ্রের কখনই ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পিতৃস্থানীয় প্রতিপালকের মনে কষ্ট দিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। যখন বিবাহ করাই স্থির হইল, তখন শচীন রামধনবাবুকে এক বিষম অনুরোধ করিয়া বসেন। জনৈক ধনীর কন্যার সহিত শচীনের বিবাহ হয় । রামধনবাবুর তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শচীন্দ্র শুনিয়া ছিলেন, অনতিদূরবর্তী গ্রামে জনৈকা অনাথা তাঁহার একমাত্র বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া মহাবিপদে পড়িয়াছেন। কন্যার পিতা বেশ উচ্চ বেতনের চাকরি করিতেন কিন্তু অমিতব্যয় এবং অদূরদর্শিতার জন্য এক কপর্দকও রাখিয়া যান নাই। তাঁহার বিধবা পত্নী ও কুমারী কন্যা গহনাপত্র যাহা ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছেন। দরিদ্রের কন্যা কে বিবাহ করিবে? সুতরাং ক্রমেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছে। উদারহৃদয় শচীন্দ্র সকলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামধনবাবুকে সম্মত করিয়া এই বিপন্ন পরিবারকে উদ্ধার করিয়াছেন। যে শচীন্দ্র আয়ের সংস্থান না করিয়া সংসারে জড়িত হওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন, আজি নিরপরাধিনী অনাথিনীর চোখের জল সেই পরদুঃখকাতর যুবকের সকল বিরুদ্ধমত ভাসাইয়া দিয়াছিল। অবশ্য ইহাও এখানে বলিতে হইবে তাঁহার চরিত্রবল এবং আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে তিনি কখনই এই ভার মাথায় তুলিয়া লইতে সাহসী হইতেন না। এ সাহস যাঁহাদের নাই তাঁহাদের এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাহা হউক, বিবাহের পর শচীন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। রামধনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে শচীনের বনিবনাও হইল না। শচীন যদি তাহাদের দলে মিলিয়া মোসাহেবী করিতে পরিতেন তাহা হইলে বুঝি বনিত! কিন্তু শচীন্দ্র ভিন্ন রুচির লোক ছিলেন। সুতরাং রামধন বাবুর বাড়িতে আর তাঁহার স্থান হইল না। কৃতজ্ঞ হৃদয় যুবক পাছে উপকারকের পুত্রগণের সহিত কোন সূত্রে বিবাদ বাধে এই

ভয়ে সুযোগ পাইবা মাত্র সামান্য বেতনের কর্ম লইয়া সপরিবারে পশ্চিম চলিয়া যান।

প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকাতেই সংসার চালাইতে হয়। আজিকার দিনে ইহা যে কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অধ্যবসায়ী ও মিতব্যয়ী যুবক শচীন্দ্র বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং স্বীয় অবস্থার মত ব্যবস্থা করিয়া চলিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে যে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই এমন নহে কিন্তু ধৈর্যশীল যুবক তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। অবশ্য সংসারে যদি তিনি এবং তাঁহার পত্নী ব্যতীত আর কেহ না থাকিতেন তাহা হইলেও এই সামান্য আয়েই এক রকম চলিয়া যাইত কিন্তু তাঁহাদের দুটি শিশু সন্তান ব্যতীত শচীন্দ্রের শাশুড়ী এই সংসারে ছিলেন। যাহা হউক, কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পাঁচ টাকা মাত্র বেতন বৃদ্ধি পাইল! যে দিন শচীন্দ্র ৩৫ টাকা পাইলেন সে দিন তিনি তাঁহার দিনলিপিতে লিখিলেন, -"আজ বৎসরের প্রারম্ভে ৩০ টাকার স্থলে ৩৫ টাকা হাতে আসিল। ৫ টাকা আয় বৃদ্ধি হইল বলিয়া যে ব্যয়ও বৃদ্ধি করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে ৩০ টাকা মাসিক আয়ে, আমার ন্যায় গৃহস্থের সংসার চলে না কিন্তু হয়ত অধিকাংশ ভদ্রসন্তানের চরম আয় ইহাতেই পর্যবসিত হইবে! ৩০ টাকায় যেমন এপর্যন্ত চলিল, দরিদ্র পরিবারের আজিও সেইভাবে চলিবে ও চালাইতে হইবে। ৫ টাকায় বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিব না অথচ উহা সুদে না খাটাইয়া যদি এক স্থানে ফেলিয়াও রাখি তাহা হইলে ৫ বৎসরে ৩০০ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব। সুতরাং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত এ বৎসরও ৩০ টাকাতেই চলিবে।"

* * * *

শচীন্দ্রের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসার সচ্ছল হইল। কিন্তু অনেকের কৌতূহল হইতে পারে তিনি দীর্ঘকাল কিরূপে ৩০ টাকায় সংসারের সকল ব্যয় নির্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? আমরা যতদূর

জানি, তিনি অর্থ দ্বারা সংসারের সকল অভাব দূর করিতেন না। অপরে যে সকল প্রয়োজনীয় কার্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে লজ্জাবোধ করেন, শচীন্দ্র সে সকল নিজেই করিতেন। তিনি নিজে বাজার করিতেন এবং চারি পয়সার সামগ্রী বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মজুরকে দুই পয়সা দিতেন না। তৈজসপত্রাদি ও গৃহমার্জনা এবং বস্ত্র ধৌতকরণাদি কার্য গৃহিণী স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন বলিয়া ভৃত্যের প্রতি মাসিক ৪/৫ টাকা ব্যয় হইত না। অধিকাংশ সীবনকার্য গৃহেই হইত। শচীন্দ্রের সিদ্ধির গুপ্তমন্ত্র এই ছিল যে, তিনি ঋণ করিয়া ধনীর অনুকরণ করিতেন না এবং আপনার প্রকৃত অবস্থা সর্বদাই অনুভব করিতে পারিতেন। তিনি যেমন দরিদ্র ছিলেন, অর্থশালীদিগের সখও তেমনি তাঁহার ছিল না। তিনি মোটা চাউলের অন্নে তৃপ্তিলাভ করিতেন। মোটা কাপড় পরিধান করিতে ভাল বাসিতেন এবং গৃহের সকল দ্রব্যই খুব হিসাব করিয়া অল্পদরে বেশ "টেকসই" দেখিয়া খরিদ করিতেন। অবশ্য তাহাতে জিনিষগুলি 'সৌখিনতার' ধার দিয়াও যাইত না। কিন্তু যাহা তিনি একবার ক্রয় করিতেন তাহা বহুকাল থাকিত, অথচ দরেও সস্তা পাইতেন। তাঁহাতে বিলাসিতার চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কেবল পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং ভদ্র সমাজের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেন। শচীন্দ্রের গৃহে কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ছিল না।

* * * *

সহরের মধ্যে সদর রাস্তার উপর এবং ধনীদিগের পল্লীতে বেশ বড় ও ভাল বাড়িতে বাস করা দরিদ্রের ঘটিয়া উঠে না অথচ দরিদ্র শচীন্দ্র গলির ভিতর অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় পল্লীতে বাস করিয়া, বাড়ি ভাড়ার ব্যয় হ্রাস করিতে, ও চিকিৎসায় ব্যয় বৃদ্ধি করিতে চাহিতেন না ; সুতরাং বহু অনুসন্ধানের পর সহর হইতে একটু দূরে নিজের অবস্থানুযায়ী অথচ একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বাড়িতে সপরিবারে উঠিয়া গেলেন। এই পল্লীতে দরিদ্রের বাসই অধিক ছিল। শচীন্দ্রপরিবার প্রথম প্রথম এখানে যেন নির্বাস-যন্ত্রণা

ভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন পল্লীবাসিগণের সংস্রবে আসিতে লাগিলেন এবং অমিয় ব্যবহারে সকলকে আপনার করিয়া লইলেন তখন সকলে যেন তাঁহারই পরিবারভূক্ত হইয়া গেল। ক্রমে শচীন্দ্র দরিদ্রপ্রতিবেশিগণের সহায়, পরামর্শদাতা এবং গুরুস্থানীয় হইয়া পড়িলেন। একান্তে থাকিয়া শচীন্দ্র-পরিবার সংসারের হিতকর নানা প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলেন।

*   *   *   *

ইঁহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার শাক শবজী ও পেঁপে, কলা, শশা প্রভৃতি ফলের গাছ হইয়াছিল। গৃহিণী সেগুলিকে খুব যত্ন করিতেন। এ গুলি দ্বারাও গৃহস্থের অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। সংসারে তরিতরকারিতেই কত ব্যয় হইয়া থাকে এবং সাধারণতঃ প্রায় সকলের গৃহেই দেখা যায় পঞ্চপ্রকার ব্যঞ্জন না হইলে অন্নই উদরস্থ হয় না। কিন্তু শচীন্দ্র বুঝিতেন বিবিধ সুস্বাদ ব্যঞ্জন অপেক্ষা রসনা ও উদরের তৃপ্তি সাধন করিবার পক্ষে একমাত্র ক্ষুধাই যথেষ্ট। যাহাতে এই ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন এবং পরিবারের প্রত্যেকেই যাহাতে পরিশ্রম করিতে পারে, তিনি কাজকর্ম নির্বাহের এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিশ্রমের ফলে তাঁদের ক্ষুধা, অন্ন পরিপাক ও সুনিদ্রা হইত এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকিত।

ধীরে ধীরে তাঁহাদের পাঠগৃহ একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে পরিণত হইয়া গেল। তাহাতে বাজে নভেল নাটক ও কুৎসিৎ পুস্তকাদি ছিল না। এককালে যে উপন্যাস নাটক ছিল না তাহা নহে কিন্তু সুলেখকগণের বাছা বাছা গ্রন্থই তাহাতে সংগৃহীত হইতেছিল। শচীন্দ্রগৃহিণী বইগুলি পুস্তকাগারে সুন্দরভাবে সাজাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। তিনি প্রত্যেক পুস্তকের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া স্বহস্তে একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

*   *   *   *

একজন পাকা ব্যবসাদার যেমন নিজ ব্যবসায়ের প্রত্যেক বিষয়টি জ্ঞাত থাকেন এবং সমস্ত নিজেই পরিদর্শন করেন, শচীন্দ্র সেইরূপ পাকা গৃহস্থের মত এবং তাঁহার স্ত্রী পাকা গৃহিণীর মত সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি সংবাদ রাখিতেন। কাজকর্ম উভয়ে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, একজনের কাজ অন্যের ভরসায় ফেলিয়া রাখিতেন না ; এমন কি ছোট ছেলেটি ও মেয়েটির নিকটও তাহাদের সাধ্যমত কাজ লওয়া হইত। বাহিরের যাবতীয় কর্ম এবং অধ্যাপনা ও পরিবারের নীতিধর্ম শিক্ষার ভার প্রধানতঃ শচীন্দ্রের উপর ছিল এবং গৃহমার্জনা রন্ধন সন্তানপালন এবং যাবতীয় গৃহকর্ম গৃহিণীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ছোট ছেলে মেয়ে দুটি তাঁহার সাহায্যকারী স্বরূপ ছিল। তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। অমুক জিনিষটা আন বা অমুক কাজ কর বলিলে এই স্বর্গশিশুরা বড়ই আনন্দিত হইত। তাহারা কোন দোষ করিলে সেদিন তাহাদের কোন কোন কাজ লওয়া হইত না। ইহাই তাহাদের সাজার চূড়ান্ত ছিল। ইহাতে তাহারা যে কি পর্যন্ত ক্লেশানুভব করিত, তাহা তাহাদের শুষ্ক মুখ, ছল ছল চক্ষু দুটি ও জড় সড় ভাব দেখিলে বুঝা যাইত। তাহারা এইরূপে অলক্ষ্যে শ্রমশীল, আদেশ পালনে অভ্যস্ত, চটপটে এবং সুস্থকায় হইতে লাগিল। তাহারা মুক্ত বায়ুতে খালি পায়ে এবং অনেক সময়ে খালি গায়ে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইত কিন্তু, তাহাতে তাহারা রোগাক্রান্ত না হইয়া বরং অধিকতর সবল ও সুস্থকায় থাকিত। এ গৃহে সদাসর্বদা ছেলেদের সর্দি কাশি জ্বর পেটের অসুখ প্রভৃতির জন্য গৃহস্থকে দুর্ভাবনাগ্রস্ত ও বিব্রত হইতে হইত না।

গৃহিণীর সুবন্দোবস্তে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। প্রত্যেক দ্রব্যটি যথাস্থানে রাখা হইত; আসবাবপত্র অল্প হইলেও সমস্ত অতি পরিপাটি ভাবে সাজান থাকিত এবং কোথাও মলিনতা দৃষ্টিগোচর হইত না। বস্ত্র ছিন্ন হইলেও মলিন হইতে পাইত না। তাঁহার আগ্রহে ও যত্নে গৃহে কাহারও মলিন বাস পরিধান করিবার যো ছিল না। স্নানাহার, শয্যারচনা, শয়নের নিয়ম এবং সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয়ে -"শরীর পালন" "স্বাস্থ্যরক্ষা" "শিশুপালন" ও "গৃহিণীর কর্তব্য" এবং "গার্হস্থ্য ধর্ম" প্রভৃতি গ্রন্থের

উপদেশগুলি এই পরিবারে যথাসম্ভব প্রতিপালিত হইত। নিয়মগুলি এত সহজ হইলেও যে অধিকাংশ পরিবারে পালিত হয় না তাহার একমাত্র কারণ "আলস্য"। শুদ্ধ আলস্য ছিল না বলিয়াই এই ক্ষুদ্র পরিবার সকল বিষয়েই নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

* * * *

এত টানাটানির সংসারে এমন শান্তি আর কেউ কখনও দেখে নাই। গৃহে কলহ বিবাদের নামগন্ধও ছিল না। শচীন্দ্র, সংসারে যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেন গৃহিণী তাহাতে অমত করিতেন না ; বরং তাহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব বা অহিতকর বুঝিলে, উভয়ে পরামর্শ করিয়া একটা কিছু স্থির করিতেন। এদিকে গৃহিণীও কখন অবুঝের মত কোন বিষয়ে অন্যায় অনুরোধ করিয়া বসিতেন না। সেইজন্য এই সন্তুষ্ট পরিবারের মধ্যে সদা আনন্দ, স্ফূর্তি ও শান্তি বিরাজ করিত। সংসারে অকিঞ্চিৎকর আয়ের জন্য অভাব বড় একটা বোধ হইত না এবং অভাব হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হইত না। শচীন্দ্র নিজ গৃহশীর্ষে নিম্নলিখিত মহাজন-বাক্যটি বড় বড় অক্ষরে খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন;-

"আমি চাই, ছোট ঘরে বড় মন লয়ে,
নিজের সুখের অন্ন খাই সুখী হয়ে।"

অষ্টম অধ্যায়

মহাজনের সহিত শচীন্দ্রের পত্রব্যবহার

চাকরিতেই শচীন্দ্র বেশ উন্নতি করিতেছিলেন, কিন্তু উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে চাকরির সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দিল না। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া অবকাশ সময়ে জনৈক মহাজনের কুঠীতে শিক্ষানবীশী করিবার সুযোগ করিয়া লইলেন এবং মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলি ঘুরিয়া বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ও কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন; ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থপত্রাদি সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করিতেও বাকি রাখিলেন না। যে বিষয় শিখিবার জন্য কেহ একান্তই ঝুঁকিয়া পড়ে, সে তাহা না শিখিয়া পারে না। শচীন্দ্রও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের প্রত্যেক কথাবার্তা, ধরণধারণ, ভাব, ভাষা, কার্যপ্রণালী, সঙ্কেত এবং কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। অহর্নিশি তাঁহার একই চিন্তা ছিল। শচীন্দ্র সিদ্ধকাম হইলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও ক্রমে রোগশয্যায় শায়িত হইলেন। পরে তিনি স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিলেন বটে, কিন্তু উভয় চাকরি ও ব্যবসায়-শিক্ষা আর তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইল না। তিনি চাকরি ছাড়িতেই মনস্থ করিলেন এবং এসম্বন্ধে তাহার পূর্বপরিচিত হিতৈষী মহাজনের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শচীন্দ্র এবং মহাজনের কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পত্র এখানে উদ্ধৃত হইল।

কল্যাণীয় শ্রী–,

তোমার—তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার আদর্শ উচ্চ, উদ্যম প্রশংসাজনক। তুমি যতদূর এরাজ্যের সংবাদ রাখ এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহাতে বুঝিতেছি তুমি সময়ে কৃতী হইবে। কিন্তু একটা

কথা আছে; শুনিয়া বা পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, যে শিক্ষা হয়, সে শিক্ষা অনেক সময় ভ্রান্ত পথে লইয়া যায় এবং কার্যকরী হয় না। দেখিয়া ও ঠেকিয়া শেখাই শেখা।

প্রথমে কোন পাকা ব্যবসাদারের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবীশী করিবে, এবং কিছুদিন এইরূপ "হাতে কলমে" শিক্ষা করিয়া অল্প পুঁজিতে সামান্য কারবার করিবে। সর্বদা মনে রাখিবে যে নিজে যে কাজ জান না কখন তাহাতে হাত দিবে না। কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন ; এমন কি ব্যবসায় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইতেও পারেন ; কিন্তু তিনিই যদি "হাতে কলমে" শিক্ষা না পাইয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে যে কৃতকার্য হইতেই হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। অনেক প্রতিভাশালী কিন্তু অসহিষ্ণু যুবক রীতিমত শিক্ষালাভের পূর্বেই "লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে" এই ধুয়া ধরিয়া দোকান খুলিয়া বসে। ব্যবসায় সর্বস্বান্ত-প্রায় তাহারাই হইয়া থাকে, এবং পরে আপনাদিগের ভ্রম স্বীকার করে। কিন্তু হায়! তাহারা এত ক্ষতি স্বীকার করিবার পর এবং এত শক্তি ও সময় নষ্ট করিবার পর আত্মভ্রম বুঝিতে পারে যে তখন আর অনেকের পক্ষে সংশোধনের পথ থাকে না।

ব্যবসায় করিবার তোমার প্রবল ঝোঁক হইয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু স্মরণ রাখিও, কেবল সখের উপর ব্যবসায় চলে না। স্বাভাবিক প্রবণতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল সখের বশীভূত হইয়া পরাধীন বৃত্তি চাহ না বলিয়া, কিম্বা বাণিজ্যের দ্বারা অপরকে লক্ষ্মীমন্ত হইতে দেখিয়া তোমারও কোটীপতি হইতে সাধ যায় বলিয়া যদি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোমাকে এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনতিবিলম্বে অনুতাপ করিতে হইবে।

তোমাকে নিরুৎসাহ করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই, কিন্তু কাজটা করিবার পূর্বে একবার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি? এখন তোমার আত্মানুসন্ধান ও আত্মপরীক্ষার সময় উপস্থিত। আত্ম শক্তি বুঝিয়া পরে আমায় লিখিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

কল্যাণীয় শ্রী–

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। তুমি যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা কতকটা লাভ করিয়াছ তাহা শুনিয়া আশান্বিত হইলাম। আমি জানি তোমার অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তি বিলক্ষণ আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমায় বলে, যাহারা এক বিষয়ে অসাধারণ শ্রম করিতে ও একাগ্রতা প্রদর্শন করিতে পারে, তাহারা যে আর সকল বিষয়েও তাহা করিতে সমর্থ হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই; ঠিক যেমন একজন দশটাকার খুচরা মুখে মুখে মিলাইয়া দিতে পারেন কিন্তু, কাল কি কি শুনিয়াছেন আজ সে সমুদয় মনে করিতে পারেন না। হয় ত তিনি অফিসের অতিশয় পুরাতন কাগজপত্রের সন্ধান দিতে পারেন কিন্তু নিজের একখানা চিঠি তিনদিন পূর্বে কোথায় রাখিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে পারেন না। এইরূপ দেখা যায় যে, কেহ অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা. দিন রাত ক্ষেপণ করিতে এবং অমানুষিক সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু, চিত্রবিদ্যা বা অন্য কোন সূক্ষ্ম শিল্পে তাঁহারই আর ধৈর্য থাকে না। তোমার অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা এখন যে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইতেছে তাহা ব্যবসায় ক্ষেত্রেও কি সেই ভাবে থাকিবে বলিয়া তোমার আত্মপ্রত্যয় আছে? নিশ্চয় জানিও সামান্য দোকানদার হইতে বড় বড় মহজন পর্যন্ত সকলকেই এত অধিক শ্রম করিতে হয়; আরাম, বিলাস, এত ত্যাগ করিতে হয়, এবং মাথা এত ঘামাইতে হয় যে সকলে তাহা সম্ভবে না। এ শক্তি যাহার নাই, এরূপ ত্যাগস্বীকারে যে অপারগ, একার্যে তাহার প্রবৃত্ত হইতে নাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী–

শ্রীচরণে নিবেদন–

আপনার—তারিখের পত্রে যাহা যাহা আদেশ করিয়াছেন তদনুসারে কার্য হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল চাকরি করিয়া দেখিলাম জীবনের প্রায় অর্ধেক কাটিল অথচ দৈন্য আর ঘুচিল না। ইহার চতুর্থাংশ সময় যদি ব্যবসায়ে ব্যয় করিতাম, তাহা হইলে আজি ধনী হইতে না পারিলেও অন্ততঃ দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারিতাম। এমন কি যদি ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হইতাম তাহা হইলে যে শিক্ষালাভ হইত, সেই শিক্ষাই আমার ভবিষ্যৎ কারবারে

মূলধন স্বরূপ হইত। সে যাহা হউক আকাশকুসুমে আমার বিশ্বাস নাই। পুনরায় আপনার আদেশ পাইলে কর্তব্য স্থির করিব।

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী

শ্রী—

কল্যাণীয়—

তোমার ——তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই ঝোঁক বড়ই আশাপ্রদ ; বিশেষতঃ এতদিন চাকরি করিয়াও যে তোমার এতটা সাহস এত অধিক উৎসাহ রহিয়া গিয়াছে, এ দীর্ঘকাল ধরিয়া দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও যে তুমি এরূপ উচ্চাভিলাষ পোষণ কর-ইহাতে আমি পরম আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। তথাপি হঠাৎ চাকরি ছাড়িতে বলিতে পারি না।

*　　*　　*　　*

এক্ষণে পরামর্শদান ব্যতীত তোমাকে আমি আর কোন সাহায্যই দিতে পারিব না। উপযুক্ত সময় বুঝিলে আমি তোমার সহিত মিলিত হইব। ইতি-

শুভাকাঙ্ক্ষী—

কল্যাণীয়—

তোমার—তারিখের পত্রে জানিলাম তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে দোকান খুলিয়াছ।

ব্যবসায় তোমরা যত সহজ মনে কর তাহা নহে। এই দেখনা কার্যে হাত দিতে না দিতেই একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছ। তুমি যে সকল জিনিসপত্রের দোকান করিয়াছ তাহার স্থানীয় অভাব বড় নাই এবং যাহার প্রয়োজন আছে তাহা সরবরাহ করিবার সহজতর উপায় পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। তোমার দেখা উচিত ছিল ;

(১) যেখানে দোকান খোলা হইবে তথায় লোকের সংখ্যা, অবস্থা ও

সঙ্গতি কিরূপ?

(২) স্থানীয় লোকদিগের কোন্ কোন্ দ্রব্যের সখ বেশী? তাহাদের স্বভাব ও অভাব কি?

(৩) যে জিনিসের দোকান খুলিতেছ, স্থানীয় অধিবাসীগণ তাহা কি পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন তাহার কি পরিমাণ প্রয়োজন আছে?

তোমার দোকান ভাড়া নামমাত্র দিতে হইতেছে বটে কিন্তু একটা কথা আছে; বহুজনাকীর্ণ বড় বড় সহরে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে অধিক ভাড়া দিয়া দোকান করায় লাভ আছে কিন্তু, যেথায় স্থানীয় লোকজনের ক্রয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, তথায় বিনা ভাড়াতে দোকান করিলেও নিষ্ফল হইতে হয়। অধিকন্তু ছোট দোকানের জীবন তাহার অল্প পরিমাণ মালপত্রের বিক্রয় ও নূতন আমদানির "বারাধিক্যের উপরই একমাত্র নির্ভর করে। যদি প্রতিযোগিতার অভাব ও ব্যয় লাঘব দেখিয়া এরূপ স্থলে দোকান খুলিতেই হয়, তাহা হইলে, এমন পণ্য রাখিতে হয় যাহা না হইলে লোকের চলে না। মুদিখানা মসলার দোকান এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু একথাও যেন স্মরণ থাকে যে তোমার উচ্চাভিলাষ সামান্য মুদিখানার মধ্যে বদ্ধ থাকিবার নহে।

* * * *

শুভাকাঙ্ক্ষী—

কল্যাণীয়—

বহুদিন তোমার পত্র না পাইয়া চিন্তিত হইয়াছিলাম। আজিকার পত্রে জানিলাম শ্রীযুক্ত— তোমার দোকান ক্রয় করিয়া লইবেন। কিছু বেশী লোকসান হইল বলিয়া হতাশ হইও না। হাত পা হারাইলে কাজ চলে না। মনে করিবে এই লোকসানের পরিমাণ অর্থে একটি অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা লাভ করিলে, যাহা তোমার পূর্বপ্রদর্শিত ভুলটি না হইলে হইত না। এক্ষণে নূতন দোকান খুলিবার পূর্বে এই কয়টি কথা স্মরণ রাখিবে; —

(১) পণ্যগুলি এমন হওয়া চাই যাহা সাধারণে চায়।

(২) যাহা নষ্ট হইবার নয়।

(৩) যাহা খুচরা বিক্রয় হইতে পারে বা অল্পে অল্পে বিক্রয় হয়।

(৪) দোকান-ঘর ও পণ্যদ্রব্য এমনভাবে সাজাইবে ও পরিষ্কার রাখিবে যে, লোকের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহার এমন কিছু বিশেষত্ব থাকে যে হঠাৎ একবার কাহারও নজর পড়িলে সে যেন আবার একবার ফিরিয়া দেখে।

(৫) যে পণ্য সঞ্চিত রাখিলে নষ্ট হয় না এবং সুযোগ বুঝিয়া লাভে বিক্রয় হইতে পারে, এমন পণ্যই সস্তায় ক্রয় করিয়া অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হয়।

* * * *

শুভাকাঙ্ক্ষী—

কল্যাণীয়—

তোমার পত্র পাইলাম। অতি উত্তম স্থানে দোকান খুলিয়াছ। জিনিসপত্রও বেশ রাখিয়াছ। এবার বেশ বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিয়াছ ; ইহাতে তোমার উপদেশগ্রাহিতা ও সঙ্কেতানুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক, এখন হইতে একটি কথা মনে রাখিবে ; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একজন স্বল্প মূলধনী ও সামান্য দোকানদার যে বড় বড় ব্যবসায়ীকে পরাস্ত করেন তাহা কেবলমাত্র সৌজন্যের বলে। ধনী মহাজন ও বড় বড় দোকানদারদিগকে প্রায় দেখা যায় তাঁহারা সাধারণ গ্রাহকদিগের প্রশ্নের ভাল করিয়া জবাবও দেন না। অনেকে সময়ে সময়ে এমনই উপেক্ষিত হন যে, তাঁহারা কখন আসিয়াছিলেন ও কখন্ ফিরিয়া গেলেন, দোকানদার তাহার সংবাদও রাখেন না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দোকানদার যদি সেই উপেক্ষিত গ্রাহকদিগকে বসাইয়া পাঁচ রকম দ্রব্য দেখাইয়া ও প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া আপ্যায়িত করেন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহারই দোকানে দ্রব্যাদি

খরিদ করেন এবং ভ্রমে সেই অহঙ্কৃতের দোকানে পদার্পণ করেন না।

প্রবঞ্চনাদ্বারা দোকানের প্রসার নষ্ট করিতে নাই। প্রবঞ্চিত গ্রাহক দোকানের একমাত্র শত্রু হয় না, কিন্তু শত শত শত্রুর সৃষ্টি করে। কারণ গ্রাহকগণই দোকানের সর্বপ্রধান বিজ্ঞাপন। স্বয়ংসিদ্ধ মহাজন শ্রীযুক্ত রসেল সেজ বলেন "সদুপায়ে যত সত্বর অর্থ উপার্জন হয়, অসদুপায়ে তদপেক্ষা বেশী অর্থ উপার্জন হইতে পারে সত্য, কিন্তু অসদ্‌ব্যবহার চাপা থাকে না—শীঘ্রই জনসমাজে প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করিয়া দোকান খুলিতে নাই। আলাপী মাত্রেই আশা করে— তাহারা জিনিস ধারে পাইবে, বিলম্বে ঋণ পরিশোধ করিবে এবং অন্য গ্রাহক অপেক্ষা অধিক খাতির পাইবে। তাগাদা তাহাদের অসহ্য, সামান্য অমনোযোগ তাহাদের অপমানজনক। তাহারা কোন না কোন সূত্রে শীঘ্রই দোকানের সংস্রব ত্যাগ করে কিন্তু অধিকাংশস্থলে ঋণ পরিশোধ করিয়া যাইতে ভুলিয়া যায়।

নিজের ব্যবসায় নিজে দেখিবে। অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কোন কাজ ছাড়িয়া দিতে নাই। আপনার কার্য আপনি যেরূপ দেহ মনের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া দেখিবে অন্যে ততদূর পারিবে না। যিনি তাহা পারেন, শত সহস্রের মধ্যে তিনি একজন চরিত্রবান উৎকৃষ্ট কর্মচারী। নিজের শ্রমশক্তি ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা বুঝিয়া কারবারের প্রসার বৃদ্ধি করিবে। এত মালপত্র কখনই রাখিতে নাই, যাহার তত্ত্বাবধান করিয়া উঠিতে পারিবে না। দোকানের অন্যান্য কাজ যেমন নিজে দেখিতে হয়, হিসাবপত্র তেমনি স্বহস্তে রাখিতে হয়। তবে যদি সময়াভাব হয় তাহা হইলে অন্যের রক্ষিত হিসাব প্রত্যহ স্বয়ং পরিদর্শন করা কর্তব্য।

প্রত্যেক দোকানদারের সময়নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা ও বাঙ্‌নিষ্ঠা থাকা চাই। ঠিক নিয়মিত সময়ে ও সকাল সকাল দোকান খোলা উচিত। দোকান বন্ধ করিবারও একটা নির্ধারিত সময় থাকা ভাল। সকল গ্রাহকের সহিত সমান ব্যবহার করা কর্তব্য।

পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক গ্রাহকের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিবে। এই কথা পুনরায় বলিতেছি কারণ ইহা দোকানদারের কৃতকার্যতার মূলমন্ত্র।

মধুর প্রকৃতিতে লোক যত আকৃষ্ট হয় এমন আর কিছুতেই নহে। মহর্ষি এমার্সন বলিয়াছেন, -"সুন্দর আকৃতি অপেক্ষা সুন্দর প্রকৃতি ভাল কারণ ইহা নয়নাভিরাম চিত্র ও প্রস্তরাদি মূর্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক। ইহা পুষ্পের সৌরভের মত দৃষ্টির অগোচর থাকিয়াও অনুভূত হয়।"

* * * *

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রিয় শচীন্দ্র,

বহুকাল পরে তোমার এক দীর্ঘ পত্র পাইলাম। আমার অনুমানই সত্য হইয়াছে। আমি তোমায় কর্মত্যাগ করিতে ক্রমাগত নিষেধ করিয়াছিলাম কিন্তু আমার নিষেধসত্ত্বেও কার্যগতিকে কর্মত্যাগ করিয়াছ এবং পাছে অকৃতকার্য হইয়া লজ্জায় পড় সেই ভয়ে তুমি অনন্যমনে, সকল সময় ও শক্তি তোমার ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়াছ এবং যতদিন না কৃতকার্য হও ততদিন অজ্ঞাতসারেই থাকিবে এই ধারণা স্বতঃই জন্মিয়াছিল। কোন দিন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া আমার বিস্ময় উৎপাদন এবং আনন্দবর্ধন করিবে আমি তাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। প্রথম কয়েক মাস তোমার পত্র না পাইয়া তোমার পূর্ব বাসস্থানে সংবাদ লই, কিন্তু তুমি পশ্চিমের বাসা উঠাইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছ, কোথায় কেহ জানে না—এই সংবাদ পাইয়া আমি উদ্বিগ্ন মনে, কাজ কর্ম ফেলিয়া, কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াই। অবশেষে তোমার সন্ধান পাইয়া কোন বন্ধুর উপর তোমার নিয়মিত সংবাদ দিবার ভার দিয়া গোপনে চলিয়া আসি। সে আজ তিন চার বৎসর হইল। যাহা হউক আমার আশা বহুলাংশে পূর্ণ হইয়াছে। তুমি যে এই কয় বৎসরে এত অধিক মূলধন করিয়া লইবে তাহা আমি আশাও করি নাই।

ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে তোমাতে যে ধনীজনসুলভ আলস্য, বিলাস ও গর্ব আশ্রয় করে নাই তাহারও সংবাদ পাইয়াছি। তোমার এই সংযম-শক্তির পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছি। উন্নতির মুখেই যাহারা অসংযত হয়

এবং হঠাৎ বড়মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠে. তাহারা 'বড়মানুষ' আর হইতেই পায় না।

পূর্বে যে তোমায় বলিয়া রাখিয়াছিলাম-"উপযুক্ত সময় বুঝিলে আমি তোমার সহিত মিলিত হইব"-সেই সময় এখন আসিয়াছে। পর পত্রে বিস্তারিত ভাবে লিখিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীচরণে নিবেদন—

আপনার উপর্য্যুপরি দুইখানি পত্র পাইয়া বিলক্ষণ অনুগৃহীত হইলাম। আপনি বহুদর্শী–আমার অজ্ঞাতবাসের কারণ যথার্থই অনুমান করিয়াছেন। আপনি কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপভাবে আমার সহিত মিলিত হইবেন এখনও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, আপনার শত শত কর্ম্মচারী, কোটী কোটী টাকা খাটিতেছে; আমি একজন সামান্য গোলদার মাত্র। সে যাহা হউক, আমার এক্ষণে সে বিচারের আবশ্যক নাই; আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। হুণ্ডী পাইয়াছি, শীঘ্রই এখানকার দোকানপাট তুলিয়া সপরিবার আপনার শ্রীচরণদর্শনে যাত্রা করিব। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন ; আমি এ পর্যন্ত দোকান এবং আড়তের কাজই শিখিয়াছি। কোটী কোটী টাকা লইয়া শত শত লোক খাটাইবার শিক্ষা এখনও পাই নাই। আপনার নিকট থাকিয়া যদি কাজ শিখিতে পাই তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? শত দোকানের বিনিময়েও আমি এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারি না।

আপনি আমায় যে বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা আমার বর্তমান মাসিক আয়েরই সমতুল্য আপনার আদেশ পালনে আমার কোন প্রকারে বাধাই নাই।

পর পত্রে রওনা হইবার তারিখ প্রভৃতি জানাইব।

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী

শচীন্দ্র

মহাজন-গৃহে শচীন্দ্র

আজ সাত আট দিন হইল শচীন্দ্র সপরিবারে আসিয়াছেন এবং মহাজনের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। শচীন্দ্র শুনিয়াছেন মহাজন বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। দাস-দাসীদের যত্নে শচীন্দ্র-পরিবার তথায় বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বোধহয় বৃদ্ধ মহাজনের আজ্ঞানুসারেই শচীন্দ্র-পরিবারের সহিত আপন প্রভুর পরিবারের মতই আচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাজনের সহিত আজ দুই দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই! শচীন্দ্র আজ মহাজনের সেই ইন্দ্রালয়তুল্য ভবনের একটি সুসজ্জিত কক্ষে একাকী বসিয়া নানা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া মহাজন তথায় দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন। শচীন্দ্রকে চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন-"আজ দুই দিন আমি তোমার কোন সংবাদ লইতে পারি নাই, এই কাগজগুলি পড়িলেই তাহার কারণ জানিতে পারিবে। তুমি বেশ ভাল করিয়া এগুলি ততক্ষণ পড়িয়া দেখ, শীঘ্র কুঠী হইয়া আসিতেছি"—এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

*   *   *   *

কখন যে মহাজন ফিরিয়া আসিয়াছেন, কখন যে তিনি শচীন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছেন, শচীন্দ্র তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে নাই। তিনি সেই অতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র-পাঠে নিমগ্ন ও আত্মবিস্মৃত! মহাজন একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে শচীন্দ্র মাথা তুলিলেন। মহাজন বলিলেন—কেমন শচীন্দ্র ব্যাপারটা বুঝিলে ত?

শচীন্দ্র। বুঝিলাম। ব্যাপার বড় সাধারণ নহে। কাগজগুলি পুনরায় এক সময়ে দেখিব।

মহাজন। এই কারবারের ভার কাল হইতে তোমার হাতে পড়িবে, তুমি যে আমার উপদেশ লইয়াই চলিবে মনে করিয়াছ, তাহা হইবে না। যে সর্বদা অন্যের উপদেশে চলে, তাহাদ্বারা শত শত লোক খাটান, লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চালান হয় না। অবশ্য দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়াই করিব, কিন্তু কারবারটি তোমার নিজের ভাবিয়া লাভ লোকসান উভয়ই তোমার মনে করিয়া অনন্যসহায়ে, আত্মবুদ্ধি বিচার ও শক্তিদ্বারা পরিচালন করিতে হইবে। ঐ যে কারখানা, কুঠী, প্রভৃতির নক্সাটি দেখিলে, উহা সর্বদা তোমার মনশ্চক্ষুর অগ্রে অগ্রে থাকিবে। কোন্ স্থানে কোন্ কর্মচারী বসে, কোন্ গুদামে কোন্ দ্রব্য রক্ষিত আছে, কোন্ নিভৃতকোণে বসিয়া কোন্ কুলি কার্য করে, কোন্ কোন্ স্থান শূন্য পড়িয়া আছে তাহা এই হস্তস্থিত নক্সার মত সর্বদা তোমার চক্ষুর উপর থাকা চাই। যাহাদের সংস্রবে তোমায় থাকিতে হইবে তাহারা কে কোথায় থাকে, তাহাদের সাংসারিক এবং নৈতিক অবস্থা কিরূপ, কে ক্ষুণ্ণ, কে ঈর্ষাপরায়ণ, কে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট, কারবারের উন্নতি জন্য কে সচেষ্ট, কে শ্রমশীল, কে অলস, কে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কে স্থূলবুদ্ধি, কে কোন্ কাজের উপযুক্ত ও সকল বিষয় ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে তোমার সন্ধান রাখিতে হইবে। এই সহস্র কর্মচারী ও দুই সহস্র কুলি মজুরের নিকট কাজ লইতে হইলে তোমার চতুর্দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। তোমার চক্ষু দুটির সতর্ক দৃষ্টি এই সহস্র কর্মচারীর কার্যের উপর রাখিতে হইবে। মুহূর্তের জন্য তোমার চক্ষু বন্ধ হইলে তাহারা তোমার ঐটুকু অসাবধানতার সুযোগ লইতে ছাড়িবে না ; কারণ তাহাদের দুই সহস্র চক্ষু তোমার গতিবিধি সর্বদা লক্ষ্য করিবে। তোমার দুই চক্ষুর সতর্ক দৃষ্টির নিকট যেমন তাহাদের ত্রুটি উপেক্ষিত হইবেনা, তোমার উপর পতিত দুই সহস্র চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও তদ্রূপ তোমারও কোন ত্রুটি উপেক্ষা করিবে না জানিবে। কিন্তু তাই বলিয়া অধীনস্থগণকে ব্যস্ত করিতে নাই; তাহাদের প্রতি কঠোর হইতে নাই। সকল কর্মচারীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করা কর্তব্য। কারণ, কর্তা স্বয়ং যেমন ভদ্রসন্তান, কর্মচারীরা তাঁহার অধীন

হইলেও ভদ্রসন্তান। তাঁহারা বেতনের বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন, আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে বা বিক্রীত হইতে আইসেন নাই। এদিকে তোমায় নম্র প্রকৃতি ও ঢিলা দেখিলে তাহারাও কার্যে শিথিল হইবে এবং কঠোর দেখিলে ভয়ে ভয়ে এবং বিরক্তি-সহকারে কাজ করিতে থাকিবে। তাহা কেবল চাকরি বজায় রাখিবার জন্য, কার্যে তাহাদের মন বা অনুরাগ থাকিবে না এবং সুযোগ পাইলেই ছাড়িয়া যাইবে। উভয় প্রকারেই সুতরাং কার্যের ক্ষতি হইতে পারে। এস্থলে মধ্যপথে থাকিয়া শাসন করা চাই। পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায়পরায়ণ কর্তার অধীন সকলেই থাকিতে চায়। এখানে একটা কথা মনে পড়িল। জনৈক বহুদর্শী ব্যবসাদার বলিয়াছেন— "যখনই তুমি হাতের চাবুক তুলিয়া ধর অথচ তাহার ব্যবহার কর না, তখনই বেশ কাজ হয়।" আমি এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি।

শচীন্দ্র। এতগুলি লোকের উপর এককালে নজর রাখা কি কার্যতঃ হইয়া উঠে?

মহাজন। নিশ্চয়! তাহার সহজ উপায় আছে। কর্মালয় এমনভাবে নির্মাণ করিতে হয় যে, তাহার মধ্যে কর্মচারীদিগের বসিবার জন্য যেন এক একটি আয়তক্ষেত্রাকার (Oblong) সুদীর্ঘ প্রকোষ্ঠ থাকে। যে প্রকোষ্ঠ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ তাহাতে গুরুভার প্রাপ্ত কর্মচারীদের অধিকাংশের স্থান করিতে হয়। যাহাতে প্রকোষ্ঠের একপ্রান্তে থাকিলে সকলের প্রতিদৃষ্টি পতিত হয়, তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধান কর্মচারীকে স্বীয় বসিবার স্থান এরূপ কৌশলে নির্বাচন করিয়া লইতে হয়। তাঁহার পশ্চাতে কোন কর্মচারীর বসিবার স্থান না থাকে। লঘুকার্য সম্পাদকগণ স্বতন্ত্র গৃহে স্থান লইতে পারেন, কিন্তু প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক মধ্যে মধ্যে উঠিয়া সকল গৃহের মধ্য দিয়া কর্তার এক একবার ঘুরিয়া আসা চাই। চক্ষুর সামনে যত কাজ পাওয়া যায়, আড়ালে তাহার অর্ধেক হয় কিনা সন্দেহ। তিনিই উৎকৃষ্ট তত্ত্বাবধায়ক যিনি অধীনস্থ সকল কর্মচারীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে আশানুরূপ কাজ লইতে পারেন।

কাজ ভাল হইলে ব্যবসায়ে শীঘ্রই তাহা জানা যায়, কিন্তু কাজ মন্দ হইলে কিছু বিলম্বে ধরা পড়ে। সুতরাং কাজ কোথায় খারাপ হইতেছে

সন্ধান করিয়া ধরিতে হয়। এবং দোষ ধরা পড়িলে নিজে কর্মচারীদের সঙ্গে পরিশ্রম করিয়া সংশোধন করিতে হয়। বিশেষ ভাল কাজ দেখিলে বুঝিবে তাহার পশ্চাতে কোন বিশিষ্ট লোকের হাত আছে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উপর্যুপরি ভাল কাজের লোক যেন উপেক্ষিত না হয়। এরূপ কর্মচারীর পদবৃদ্ধির জন্য স্মারক-বহিতে নাম লিখিয়া লইবে। এইরূপে কোন বিশেষ খারাপ কাজ দেখিলে বুঝিবে, যে ব্যক্তি তাহা করিয়াছে, সে হয় কর্মান্তরের উপযুক্ত, না হয় সে কর্ম ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। কর্মচারীদিগের সহিত কখন লঘু ভাবে কথোপকথন বা হাস্যপরিহাস করিবে না; কিন্তু সকলেরই প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিবে। সকলে যেন তোমার অমিয় অথচ অপক্ষপাত আচরণে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়।

ঋদ্ধি লাভ

স্নানাহারের পর শচীন্দ্র পুনরায় মহাজন সমীপে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ দুই জনে নিস্তব্ধ থাকিবার পর মহাজন বলিলেন—"বাণিজ্যের বাজার নদীর স্রোতের মত। স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া দিলে আর সাঁতারের শ্রম সহিতে হয় না। লক্ষ্মী হস্তচ্যুত সহজেই হয়, কিন্তু নষ্ট ধন উদ্ধার করা বা একবার লক্ষ্মীকে হেলায় হারাইয়া পুনর্লাভ করা বড় কঠিন কার্য। সাধারণের কথা দূরে থাক, একজন পাকা মহাজনকেও এ অবস্থায় বেগবতী নদীর স্রোতের বিপরীতে সাঁতার দিবার মত চেষ্টা করিতে হয়।

এস্থলে অসাধারণ শক্তি, অবিরাম শ্রম, অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা ও বুদ্ধি-স্থিরতার প্রয়োজন। সামান্য শৈথিল্য, মুহূর্তের অমনোযোগ, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নীচগামী জলের টানে সহস্র হস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া দেয় এবং প্রতি পলক পাতে নিম্ন হইতে নিম্নতর পথে টানিয়া লইয়া যায়। একথা বেশ স্মরণ রাখিবে, এবং ইহাও স্মরণ রাখিবে যে তোমার উপর যে ভার ন্যস্ত হইল, তাহার অপেক্ষা অধিক গুরুভার, অধিক দায়িত্বভার, অধিক ধর্মভার, আর নাই। ইহা মানব-সেবার শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র। ইহাই সুতরাং দেবপূজার উৎকৃষ্ট মন্দির। একজন গণিতশাস্ত্র-বিশারদ বা বৈজ্ঞানিক যেমন জটিলতম প্রশ্নের মীমাংসায় একান্ত মনোনিবেশ ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন,শত শত কর্মচারীর নিয়োগকর্তা শত শত পরিবারের ভাগ্যবিধাতা অন্নদাতা মহাজনকে তদপেক্ষা অল্প মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয় না। দুদিনে তাঁহার ব্যবসায়ের গতিরোধ হইলে এমন কি একটা বিভাগ বন্ধ হইলে কত শত পরিবারের সর্বনাশ হয়, কত ব্যক্তি নিঃস্ব, নিরুপায় এবং একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরিণামে কত চৌর্য, হত্যা. লুণ্ঠন প্রভৃতি ভীষণ অপরাধের বৃদ্ধি হয়, তাহার সংখ্যা হয় না। মহাজনের দায়িত্ব সুতরাং সামান্য মনে করিও না। এ দায়িত্ব গ্রহণের শক্তি যাঁহাতে নাই তিনি যেন এ ক্ষেত্রে পদার্পণ না করেন। শচীন্দ্র, আমার কথাগুলির মর্মগ্রহণ করিতেছ ত?

শচীন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ ; কিন্তু আপনি কি আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন? কারবারের কিছুই কি স্বহস্তে রাখিবেন না?

মহাজন। না শচীন! আমি আপাতত কিছুই দেখিব না ; দেখিব কেবল তোমার ভবিষ্যতের আশা তোমার সন্তানদিগকে ; তাহাদের শিক্ষার ভার আমি স্বহস্তে লইব। এই লও কারবারের সমস্ত কাগজ-পত্র, কুঠীর চাবি, আমার কর্মজীবনের দিনলিপি এবং তোমার পথপ্রদর্শকস্বরূপ আমার মন্তব্য পুস্তক ; ইহাতে ব্যবসায় ও তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক সঙ্কেত দেখিতে পাইবে।

মহাজন সেই সমস্ত কাগজপত্র, চাবির গুচ্ছ, পুস্তক প্রভৃতি শচীন্দ্রের হস্তে দিলেন। তাহার হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইল এবং সেই অশীতিপর বৃদ্ধের নয়নযুগল হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু কুঞ্চিত কপোল বাহিয়া নাভিতলস্পর্শী

শ্বেতশ্মশ্রুর উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িল। মহাজন আবেগস্ফীতবক্ষে শচীন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"শুন শচীন্দ্র! বহু পরীক্ষায় অগ্নিতে তোমায় বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছি; আজি তোমাকে এই অতুল বিভবের সহিত কর্ম্মের ও দায়িত্বের উচ্চাসনে বসাইলাম। যদি তোমার অযোগ্যতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আমাকে আমার বহুদর্শন ও অভিজ্ঞতার উপর আস্থা হারাইতে হইবে এবং তোমার পিতার যশোমানে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।" শচীন্দ্র এই সময়ে বাষ্পাকুললোচনে কিছু বলিতে যাইতেছিল, তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—শচীন! তুমি মাতৃহীন হইয়াছ বটে, কিন্তু পিতৃহীন হও নাই। তোমায় এতদিন অনাথের মত রাখিয়াছিলাম, অন্তরালে থাকিয়া তোমার সহস্র ক্লেশ দেখিতে দেখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু সমস্ত সহ্য করিয়াছিলাম। তুমি আমার বাল্যবন্ধু রামধনের তত্ত্বাবধানে ছিলে বটে, কিন্তু আমার চক্ষু সর্বদাই তোমার উপর ছিল। তোমার বিবাহও আমার অজ্ঞাতসারে ও অমতে হয় নাই। তুমি যদি জানিতে তুমি ধনীর সন্তান; তুমি যদি বুঝিতে সংসারে তোমার ভাবনা নাই, তোমায় খাটিয়া খাইতে হইবে না; তুমি যদি এই অতুল ঐশ্বর্য হাতে পাইতে; তাহা হইলে কি তুমি যাহা হইয়াছ তাহা হইতে পারিতে? জগদীশ্বর ধন্য! তিনি আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন। এখন যাও বৎস! বৃদ্ধের আশীর্বাদ ও পিতার স্নেহ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। সেই সর্বমঙ্গলময় সকল সিদ্ধি সকল ঋদ্ধির দেবতার চরণে প্রণাম কর!"

ঋদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

* * * * ঋদ্ধি * * * পুস্তকখানি * * * অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত, এবং ঋদ্ধি লাভোপযোগী সদুপদেশে পরিপূর্ণ।

—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনার "ঋদ্ধি" পুস্তখানি * * * আমরা খুব আনন্দের সহিত পড়িয়াছি। সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের উপকার হইবে। এইরূপ পুস্তক যত বেশী প্রচার ও লিখিত হয় ততই ভাল * * ।

—মেজর বি. ডি. বসু., আই. এম. এস.

'ঋদ্ধি' পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বিষয়-গৌরবে এবং লিপি-কৌশলে পুস্তকখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে এ প্রকার অর্থনীতি-পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এতদ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে এরূপ আশা করি। বস্তুতঃ পুস্তকখানি বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় দিকে সুন্দর এবং সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে। সকলকেই একবার পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। * * * * * দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ একাধারে থাকিলে যে শুভ ফলের আশা করা যায়, এ ক্ষেত্রে সেরূপ আশা করিতে পারি। ঋদ্ধির সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, ইহাই প্রার্থনা। * * *

—শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য, এম. এ
সেন্ট্রাল হিন্দুকলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক

* * * * পুস্তকখানির বহিঃসৌন্দর্য যেমন নয়ন-মনোহর, লিখিত বিষয়ও সেইরূপ চিত্তপ্রসাদক। গার্হস্থ্য মিতব্যয়িতা বিষয়ে পুস্তক লিখিতে গিয়াও উপন্যাসের ন্যায় উপসংহার করিতে যে গ্রন্থকার সক্ষম তাঁহার

পুস্তকও যদি সাধারণের চিত্তাকর্ষক না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাঙ্গালী পাঠকের দুর্দিন এখনও ঘুচে নাই। * * * *

—**শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়**
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎশাখা, বারাণসী

Let me thank you for the present of your excellent book RIDDHI. I went through it immediately on receiving the gift and it seemed to rouse me a good deal. * * * *

--**B. M. Mukerjee,** Esq. B. A., F. C. S.
Thomason College, ROORKEE.

ঋদ্ধি—'চরিত্রগঠন' প্রণেতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। কলিকাতা, ২২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস হইতে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ২৬০ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য ১।০ * * * * গ্রন্থকার প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়ের দ্বারা কিরূপে অর্থোপার্জন হইতে পারে এবং মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের দ্বারা কিরূপে ঐ অর্থের রক্ষণ সম্ভব, মোটামুটি তাহারই বিচার করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস তাহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে অনেকে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিবেন। * * * * * * * * * * * গ্রন্থের একটি উপদেশ লোকের বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে। এখন অনেকেরই ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক দেখা যায় কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকেই যে কেবল সর্বস্বান্ত হয়েন, তাহা নহে, কিন্তু দশ জনের সে দিকে যাইবার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠেন। * * * * * * এই বিষয়টি গ্রন্থকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। * * * * * * আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষা করি।

—**প্রবাসী**

ঋদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রী——, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১।০ মাত্র। * * * এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

বালকগণের পাঠ্য হিসাবে রচিত হইলেও গ্রন্থখানি সংসারী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য। গ্রন্থের ভাষা বেশ সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। ঋদ্ধির কয়েকটি মোটামুটি কথা কার্ডবোর্ডে লিখিয়া বসিবার ঘরে প্রত্যেকের ঝুলাইয়া রাখা উচিত। * * * অন্ধ অজ্ঞানের মত এই বাজে খরচের বন্যায় কত সংসার আজ উৎসন্ন যাইতেছে। * * ঋদ্ধিতে চিন্তাশীল গ্রন্থকার সমাজের এই দারুণ ক্ষত জাজ্বল্যভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন, এবং তাহার আশু প্রতিকারের ঔষধও নির্দেশ করিয়াছে। গ্রন্থখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইটিও পরিপাটি হইয়াছে।

—ভারতী

ঋদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি * * * বেশ বহি, বেশ লেখা, আর বিষয়গুলি সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয়। ইহার উপর পুস্তকখানির বাঁধাই ভাল, ছাপাও বেশ। এমন সমাজ ও অর্থতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যান পুস্তকের যত প্রচার বাড়িবে, ততই সমাজের মঙ্গল ঘটিবে।

—হিতবাদী